মেদিনীপুরের ইতিহাস

প্রথম ভাগ।

'বঙ্গ-সাহিত্যে মেদিনীপুর' প্রণেতা, ভূতপূর্ব্ব 'সুরভী' সম্পাদক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩২৮

 [মূল্য আড়াই টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা
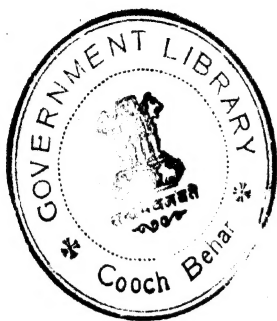
পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বসু

ও

মাতৃদেবী

শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী বসুর

শ্রীচরণে

নিবেদন।

রাজকার্য্য উপলক্ষে এক সময় আমাকে মেদিনীপুর জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইয়াছিল ; সেই সময় বহু প্রাচীন কীর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় এবং নানাপ্রকার কিম্বদন্তী শ্রুতিগোচর হওয়ায়, মেদিনীপুর জেলার একখানি ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে উদিত হয়। তাহারই ফলে, বিগত দশ বৎসর যাবৎ সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রথিত করিয়া মেদিনীপুরের ইতিহাসের এই কঙ্কালখানি জন সমাজে প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহার অবয়ব সম্পূর্ণ হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

মেদিনীপুরের ইতিহাস বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এক প্রকার বলা যাইতে পারে, এই দুই প্রদেশের ইতিহাসের দুইটী অধ্যায় লইয়াই মেদিনীপুরের ইতিহাস। সেইজন্য এই দুই প্রদেশের ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মেদিনীপুরের এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি, প্রাচীন শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সরকারী দপ্তরখানায় ও স্থানীয় প্রাচীন জমিদারদিগের বাটীতে রক্ষিত পুরাতন কাগজ পত্র ও প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মেদিনীপুরের কথা লইয়া ইতঃপূর্ব্বে যে সকল সরকারী রিপোর্ট, পুস্তক বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও আমি

অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তন্মধ্যে সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্‌এর পার্শন্যাল য়্যাসিষ্টেণ্ট পূজ্যপাদ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "Midnapore—A Study." বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুরের ইতিহাসের প্রথম ভাগে জেলার ভৌমিক বিবরণ, ঐতিহাসিক বিবরণ এবং প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির পরিচয় প্রদান করা হইল। দ্বিতীয়ভাগে সেকালের তমলুক, চন্দ্রকোণা, বগড়ী প্রভৃতি স্থানের অৰ্দ্ধ স্বাধীন রাজবংশগুলির ও আধুনিক জমিদারবংশগুলির ইতিহাস, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, লোক সংখ্যা ও লোকতত্ব, জাতিতত্ব, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্যের কথা, জমি, জমা ও রাজস্বের বিবরণ, রাস্তা ঘাটের পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। কিন্তু এই স্থলে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আমার ত্রুটীতেই হউক আর দুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, এই গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি প্রেসে দিবার পরেই এই কয়েক মাসের মধ্যে চাকরী উপলক্ষে আমাকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের ছয়টী জেলার মফস্বলে নানাস্থানে কোথাও দশ দিন, কোথাও বার দিন মাত্র থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। এই কারণে প্রুফগুলি আমি নিজে দেখিতে পারি নাই বা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দেখাইবার সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতেও পারি নাই। ফলে বর্ণাশুদ্ধি ত আছেই, অন্য রকমের কয়েকটী ভুলও থাকিয়া গিয়াছে। যথা,—২৮ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে 'ষাট ক্রোশ', 'ষাট মাইল' হইবে; ৯৬ পৃষ্ঠার কিয়দংশ পুনরায় ৯৭ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে; ১৬৩ পৃষ্ঠায় 'ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার' না হইয়া 'ঐতিহাসিক যদুনাথ মজুমদার' হইয়া গিয়াছে; ৩৮৪ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তির 'পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুদের মত অঙ্গহীন হইয়াছে'

কথাটা, এক অদ্ভুত রকমে ছাপা হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের এই ক্রটী মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব।

এই গ্রন্থ রচনায় মেদিনীপুর নাড়াজোলাধিপতির সুযোগ্য ম্যানেজার আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতে আমি নানাপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কালিকা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি আমার সোদর প্রতিম সুহৃদ্ সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস কাননগো আমার জন্য বিশেষ ক্ষতি ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদীয় পুত্র শ্রীমান্ মানববন্ধু ও ছাত্র শ্রীমান্ সুধাংশুভূষণ ঘোষ ও শ্রীমান্ শম্ভুচরণ সাহার সাহায্যে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা মাতৃস্বরূপিণী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে দুইখানি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের রচনা তাহার অনুজ শ্রীমান্ যতীশচন্দ্র, শ্রীমান্ জগদীশ চন্দ্র, শ্রীমান্ জগৎচন্দ্র, শ্রীমান্ জ্যোৎস্নাকুমার ও শ্রীমান্ যামিনীকুমারের সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অনুপম প্রিয়স্মৃতি যে ইহার অঙ্গে এরূপভাবে জড়িত হইয়া থাকিল তাহা আমার অন্তরে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

পরিশেষে, মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখিবার কোন আবশ্যকতা আছে কি—না এবং ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কেন যে আমি এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে দু'টী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"সাহেবেরা যদি পাখী

মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরী জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেথানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। * * * বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কথন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এই বংশ হইতে কথন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কথন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীর মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরব-শূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

মেদিনীপুর বঙ্গের একটী প্রধান জেলা বলিয়া পরিগণিত হইলেও অসাড় ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া এই জেলার একটী অখ্যাতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেন যে মেদিনীপুরের এইরূপ দুর্নাম হইল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। মেদিনীপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বরং তাহার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন-কালের তাম্রলিপ্ত নগর এই মেদিনীপুর জেলাতেই ছিল। এই জেলার দাঁতন নগর বৌদ্ধযুগের সেই মহাসমৃদ্ধিশালী দন্তপুর নগরেরই হীন পরিণতি। মধ্যযুগে এই প্রদেশেরই এক রাজপুত্র উৎকল জয় করিয়া তথায় বাঙ্গালীর বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই জেলারই এক রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার মনোহর

চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শিবায়ন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গরিষ্ঠ মহাপুরুষ ভারত-গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমিও এই মেদিনীপুর। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসেও মেদিনীপুরের স্থান কাহারও পশ্চাতে নয়। পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে কংশাবতী তীরে প্রাদেশিক সম্মিলনে মেদিনীপুরের অধিবেশনেই চরম স্বরাজবাদের মহামন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের ইতিহাসে সেই সকল প্রাচীন ও আধুনিক কথার আলোচনা করা হইয়াছে। মেদিনীপুরের অতীত বা বর্ত্তমান যে অসার বা গৌরবশূন্য নহে তাহা দেখানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্পে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" এই মহাজন বাক্যই আমাকে এই কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহাই আমার নিবেদন।

কাঁথি, মেদিনীপুর,
১লা আশ্বিন, ১৩২৮। — শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়—ভৌগোলিক অবস্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূবৃত্তান্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রাচীন কাল।

চতুর্থ অধ্যায়—হিন্দুরাজত্ব, তাম্রলিপ্ত রাজ্য।

পঞ্চম অধ্যায়—হিন্দুরাজত্ব, উৎকল রাজ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মুসলমান অধিকার, পাঠানরাজত্ব।

সপ্তম অধ্যায়—মুসলমান অধিকার, মোগলরাজত্ব।

অষ্টম অধ্যায়—মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব বা বর্গীর হাঙ্গামা।

নবম অধ্যায়—ইংরাজ শাসন কাল।

দশম অধ্যায়—প্রাচীন কীর্ত্তি ও কাহিনী।

চিত্র সূচী।

মেদিনীপুরের ইতিহাস।

ভৌমিক বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান।

সুদূর অতীতকালে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, তখন বঙ্গোপসাগরের উত্তর-সীমা ছিল রাজমহল-পর্ব্বতমালা। ক্রমশঃ মহাসমুদ্রের লীলাভূমি দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায় ইদানীন্তন বঙ্গদেশের 'ব'দ্বীপ সহস্র সহস্র নদনদীসহ সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিতে পুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। *

সুদূর অতীতকাল।

নবোত্থিতা বঙ্গভূমি প্রথমে ভিন্ন জাতির বাসভূমি থাকিলেও, আর্য্যগণ পরবর্ত্তিকালে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে রাজত্ব বিস্তার করিয়া আর্য্যসভ্যতা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্য-ভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামে তিনটি রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই তিনটি প্রাচ্য-জনপদ প্রাচ্য-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। ভূতপূর্ব্ব ভারতের এই তিনটি প্রাচ্য জনপদের ন্যায়, ধর্ম্ম, শিক্ষা ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ রাজ্য।

---

* Lyall's Principles of Geology vol. I.

কেবল ভারতবর্ষে নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত জগতের সভ্যপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। * সে দিন চলিয়া গিয়াছে; ইতিহাসে কেবল তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু রাখিয়া গিয়াছে।

অতীত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যভারতের সেই তিনটি প্রাচীন জনপদের নামও এক্ষণে বিলুপ্ত বলিলেই চলে; তাহাদের সীমা-নির্দ্দেশও প্রত্নতত্ত্বের তিমিরাবরণের অন্তরালে পড়িয়া নানা জটিল সমস্যার বিষয়ীভূত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই তিনটি জনপদের মোটামুটি যে সীমানির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, "বর্ত্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশটিই প্রাচীন অঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; উত্তরে ভাগীরথী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গের সীমা বিস্তৃত ছিল এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্ব্ব-প্রদেশটিই বঙ্গ নামে অভিহিত হইত।" এই সীমানির্দ্দেশানুসারে প্রাচীন-কালে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ভূভাগ প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব লিখিয়াছেন, "এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" †

উত্তরকালে আর্য্যভারতের এই প্রাচ্য বিভাগে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ ব্যতীত পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে আরও দুইটি নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হয়। সুপ্রাচীন সাহিত্যে এই পাঁচটি রাজ্যেরই নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে একটি আখ্যায়িকা আছে, দৈত্যরাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে

পুণ্ড্র ও সুহ্ম রাজ্য।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের পঠিত অভিভাষণ।

† জন্মভূমি পত্রিকা—১ম খণ্ড—৪৪৮ পৃষ্ঠা।

দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই পঞ্চ-রাজ্যের সংস্থাপয়িতা। * স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে দীর্ঘতমা ঋষি খৃঃ পূর্ব্ব ১৬৯০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। †

বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণগুলিতেও এই পাঁচটি নাম একসঙ্গে দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাচীন পুণ্ড্র ও সুহ্ম রাজ্যের যে সীমানির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এই দুইটি রাজ্য পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এই তিনটি রাজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। উইলসন্, কানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমোত্তর-প্রদেশটিই অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণাংশই পরবর্ত্তিকালে পুণ্ড্র রাজ্য নামে অভিহিত হয় এবং কলিঙ্গ-রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বাংশ লইয়াই সুহ্ম-রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিস্তর প্রমাণাদির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রাচীন সুহ্ম-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরটি সেই রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বসীমা ধরিয়া যে রেখাটি পাওয়া যায়, তাহারই পূর্ব্বভাগে বঙ্গরাজ্য এবং পশ্চিমে সুহ্মরাজ্য ছিল, ইহাই তাঁহার মতে নির্দ্দিষ্ট। সুহ্মরাজ্যের সীমা ঐ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে কলিঙ্গ-রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ‡ ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের প্রায় সমস্ত ভূভাগ সুহ্ম-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত।

---

* হরিবংশ—৩১ অধ্যায়।

† গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—২ পৃষ্ঠা।

‡ নব্যভারত পত্রিকা—অগ্রহায়ণ ১৩১৭—"বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ।"

অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে সুহ্ম-রাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্ত-নগরী একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় রাজধানীর নামানুসারে ঐ রাজ্য 'তাম্রলিপ্ত'রাজ্য নামেও সময়ে সময়ে পরিচিত হইত।

সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত।

কোন কোন সাহিত্যে এই দুই নামে আবার দুইটি পৃথক্ রাজ্যের নামোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রদেশাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মনৌজা এই দুই বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হন। পরে তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করেন। * আধুনিক বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগই তখন বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমভাগই পুণ্ড্রদেশ নামে অভিহিত হইত। জানা যাইতেছে, ইহাদের দক্ষিণেই সমুদ্রোপকূলে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। কবি দণ্ডীর রচিত দশকুমারচরিতেও সুহ্ম-রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। দামোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত তৎকালেও সুহ্ম-রাজ্যের রাজধানী ছিল। তথায় দেশীয় ও বিদেশীয় জাহাজ সকল থাকিত। দশকুমারচরিতে লিখিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে চড়িয়া তিনি রাক্ষসদিগের দেশে উপস্থিত হন এবং তথায় রামেসু নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ করেন। দশকুমারচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের নায়ক মিত্র গুপ্তকে রাজপুত্র ভীমধন্বা এই স্থানে সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। † পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন,

---

* মহাভারত—সভাপর্ব্ব, ৩১ অধ্যায়, ২১-২৫ শ্লোক।

† অনেকে মনে করেন, দশকুমারচরিত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে উহা খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান তমলুক নগরটি প্রাচীন দামোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত নগরের হীন পরিণতি। *

সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তরাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে পুণ্ড্র রাজ্য, পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ-রাজ্য, এইরূপ নির্দ্দেশই জানা যাইতেছে। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "কলিঙ্গ-রাজ্য বর্ত্তমান তমলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" † তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তখন বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব ভূভাগের অধিকাংশই সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ—যাহা তমলুকের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত, উহাই কেবল কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উত্তর-কালে এই বিভাগেরও পরিবর্ত্তন হয়।

উৎকল-রাজ্য।

পরবর্ত্তিকালের সাহিত্যে আমরা উৎকল ও উড্র নামে আরও দুইটি রাজ্যের নিদর্শন পাই। রঘুবংশে কালিদাস কপিশা নদীর পরপার হইতেই উৎকলের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কপিশা নদী বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা কাঁসাই বা কংসাবতী নদীর নামান্তর। কালিদাসের বর্ণনা-মতে উৎকলদেশের দক্ষিণেই কলিঙ্গ-রাজ্য ছিল। রঘুবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, রঘু স্বীয় রাজধানী হইতে সুহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া পূর্ব্ব-মহাসাগরের তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠে সুহ্মরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে উৎকলবাসিগণ তাঁহার পথ প্রদর্শক

---

* Asiatic Researches vol VIII. p. 331.
Ancient India as described by P'tolemy by J. Crindle p. 169.

† জন্মভূমি পত্রিকা—১ম খণ্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

হইলে, তিনি তথা হইতে কলিঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। * মার্ক-ণ্ডেয়পুরাণেও দেখা যায়, উৎকলবাসীরা একদিকে কলিঙ্গের, অপরদিকে মেকলের (বর্ত্তমান রায়পুর জেলার আদিম অধিবাসী) সহিত সংসৃষ্ট। সুপণ্ডিত পার্জ্জিটার সাহেব (F. G. Pargiter Esq. I. C. S.) এই উক্তি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে উৎকলদেশ মেদিনী-পুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর জেলা লইয়া গঠিত হইয়াছিল। † সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎকল-রাজ্য প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের উত্তরাংশ লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই কারণে 'উৎকল' শব্দ 'উত্তর-কলিঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। ‡

উড্রদেশ।

কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষ লইয়া যেরূপে উৎকলদেশ গঠিত হইয়াছিল, আমাদের মনে হয়, পুণ্ড্র-রাজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই সেই-রূপ উড্রদেশের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ আধু-নিক ছোটনাগপুর প্রদেশ, ময়ূরভঞ্জ, কেঁউঝর প্রভৃতি গড়জাত মহাল, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া উড্রদেশ গঠিত ছিল। শ্রীযুক্ত পার্জ্জিটার সাহেবও এই মতাবলম্বী। ¶ পরবর্ত্তিকালে উৎকল ও উড্র একই রাজ্য বলিয়া

---

* রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৩৫ শ্লোক।

† Journal of the Asiatic Society vol. LXVI. Part 1. No 2.

‡ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সারদাচরণ মিত্র পৃঃ ১।

¶ "The eastern part of Midnapore belonged to Tamralipta and Sumbha, hence there remains only the western part of the district which no other nation appears to have occupied; and if to this be added the modern district of Manbhoom, the eastern part of Singhbhoom and perhaps the southern portion of Bankura a well defined tract is obtained which no other tribe appears

পরিগণিত হয় এবং সে সময় উহার সীমারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। উৎকলেরই অন্য নাম উড়িষ্যা।

উৎকল ও উড্রদেশের পূর্ব্বোক্ত সীমানির্দ্দেশ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ—যাহা কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে সেই অংশই উৎকলের অন্তর্ভূ‌ত এবং পশ্চিমদিকের কিয়দংশ উড্রদেশের অন্তর্ভূ‌ত হইয়াছিল। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দিরে মাদলাপাঞ্জী নামে কতকগুলি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত তালপত্র আছে। সেইগুলি হইতে উড়িষ্যার অনেক প্রাচীন কথা জানিতে পারা যায়। তৎকালে উড়িষ্যা একত্রিশটি দণ্ডপাঠে এবং ঐ দণ্ডপাঠগুলি আবার ১১০টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি দণ্ডপাঠ বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়ঃ—(১) টানিয়া, (২) জৌলিতি, (৩) নারায়ণপুর, (৪) নইগাঁ, (৫) মালঝিটা, (৬) ভঞ্জভূম-বারিপাদা। টানিয়া দণ্ডপাঠের মধ্যে কাকরাচোর, জলেশ্বরচোর, দাঁতুনিয়াচোর, নারাঙ্গাচোর, বিনিসারা বা বালিসরাচোর ও বোড়ইচোর নামে ছয়টি বিশি ছিল। এখনও এই নামে কয়েকটি পরগণা বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন বিশিগুলির পরিচয় দিতেছে। জলেশ্বর অদ্যাপি 'টুনিয়া জলেশ্বর' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান কাঁথি মহকুমার অধিকাংশই মালঝিটা দণ্ডপাঠের অন্তর্ভূ‌ত ছিল। মাদলাপাঞ্জীতে উল্লিখিত নারায়ণপুর ও বর্ত্তমাম নারায়ণগড় পরগণা একই স্থান বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীন উৎকলের রাজস্ব-বিভাগ।

---

to have owned and which bordered in Pundra. I would suggest that this must have been Udra in ancient times." J. R. A. S. Vol. LXVI. Part I. No 2.

পরবর্ত্তিকালের গ্রন্থ আইন-ই-আক্‌বরীতে “নারায়ণপুর ওরফে খান্দার” নামে একটি মহালের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানকালে খান্দার নামেও একটি পরগণা দৃষ্ট হয়। খান্দার ও নারায়ণগড় পরগণা পাশাপাশি অবস্থিত। ভঞ্জভূম নামে শালবনী ও কেশপুর থানায় একটি পরগণা আছে; বারিপাদা এক্ষণে ময়ূরভঞ্জের করদরাজ্যভুক্ত। ময়ূর-ভঞ্জের রাজার রাজধানী এই বারিপাদায় অবস্থিত। শালবনী হইতে বারিপাদা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি ভঞ্জভূমি-বারিপাদা দণ্ডপাঠের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎকালে এই দণ্ডপাঠটির অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলাবৃত ছিল; ভূমিজ নামে এক শ্রেণীর আদিম অধিবাসী এই স্থানে বাস করিত। সম্ভবতঃ তাহাদের নামানুসারেই এই স্থান ভূমিজ-ভূম বা ভঞ্জভূম নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও এই প্রদেশের স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান; তথায় ভূমিজগণও বাস করিতেছে।

নইগাঁ ও জৌলিতি দণ্ডপাঠ দুইটি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, সঠিক বলা যায় না। তবে উক্ত দণ্ডপাঠ দুইটি টানিয়া, মালঝিটা, নারায়ণপুর ও ভঞ্জভূম-বারিপাদা দণ্ডপাঠের সহিত উল্লিখিত হওয়াতে এই দুইটি দণ্ডপাঠও যে উহাদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন, এগরা থানার নেগুঁয়া নামক স্থানটির অপভ্রংশ নামে নইগাঁ বা নাইগাঁ দণ্ডপাঠের পরিচয় পাওয়া যায়। এগরার উল্লেখস্থলে এখনও লোকে ‘এগরা নেগুঁয়া’ বলিয়া থাকে। ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় নেগুঁ-য়াতে কাঁথি মহকুমার ফৌজদারী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; উহা তখন নেগুঁয়া মহকুমা নামে পরিচিত হইত। বর্ত্তমানকালের মেদিনীপুর জেলার যে অংশ উৎকলের অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়,

সেই অংশের থানাগুলির সহিত প্রাচীনকালের ছয়টি দণ্ডপাঠের স্থাননির্দ্দেশ করিতে গেলে মোটামুটী দেখা যায় যে, বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ ও দাঁতুন থানা লইয়া টানিয়া দণ্ডপাঠ এবং নারায়ণগড় থানা লইয়া নারায়ণপুর দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। রামনগর, কাঁথি, খাজুরি ও ভগবান্‌পুর থানা লইয়া মালঝিটা দণ্ডপাঠ থাকা সম্ভব এবং মেদিনী-পুর, কেশপুর, শালবনী, খড়্গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানা এবং ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যের অধিকাংশ লইয়াই বোধ হয় ভঞ্জভূম-বারিপাদা দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। তাহা হইলে ঐ প্রদেশের মধ্যে এগরা, পটাশপুর ও সবঙ্গ এই তিনটি থানার ভূভাগ বাকী থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদেরও মনে হয়, মনোমোহন বাবু যে অনুমান করিয়াছেন, বর্ত্তমান নেগুঁয়া গ্রাম প্রাচীন নাইগাঁ দণ্ডপাঠের পরিণতি, তাহা অমূলক না হইতেও পারে। এগরা ও পটাশপুর থানা দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত; দুইটি থানাতে প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শনও আছে; সম্ভবতঃ এই দুইটি থানা লইয়াই নাইগাঁ দণ্ডপাঠ এবং সবঙ্গ থানা লইয়া জৌলিতি দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র হইতে দেখা যায় যে, সবঙ্গ থানার পার্শ্বে নারায়ণগড়, নারায়ণগড়ের পার্শ্বে পটাশপুর এবং তৎপরে এগরা থানা অবস্থিত। মাদলাপাঞ্জীতেও যেরূপ ভাবে দণ্ডপাঠগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। উক্ত তালিকায় যথাক্রমে জৌলিতি, নারায়ণপুর ও নাইগাঁর নামোল্লেখ আছে।

মাদলাপাঞ্জীর এই দণ্ডপাঠ-বিভাগের মধ্যে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের নাম নাই। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, তৎকালে তাম্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল না। তাম্রলিপ্তের দক্ষিণ হইতেই উড়িষ্যার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। মাদলা-

পাঞ্জীর পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইতেও উহাই উপলব্ধি হয়। তমলুকের দক্ষিণেই সবঙ্গ থানা বা জৌলিতি দণ্ডপাঠ ছিল দেখা যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাম্রলিপ্ত-রাজ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ নামে আরও একটি রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ নগরীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরথীর দক্ষিণ-তটে যে একটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখা যায়, কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে উহারই প্রাচীন নাম কর্ণসুবর্ণ; অধুনা রাঙ্গামাটী নামে অভিহিত। * আমাদের কিন্তু অন্যরূপ মনে হয়। উক্ত পরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে কামরূপ, তথা হইতে সমতট, সমতট হইতে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ ও কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যার পরস্পর দূরত্ব ৭০০ লি (প্রায় ১৪০ মাইল) ছিল। ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণকালে জাজপুর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এই জাজপুর ও তাম্রলিপ্ত উভয়ই সুপরিচিত স্থান। বাঙ্গালার মানচিত্রের উপর জাজপুর ও তাম্রলিপ্ত হইতে ৭০০ লি দীর্ঘ দুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে, উভয় রেখা বর্ত্তমান সিংহভূম জেলার মধ্যে কোন স্থানে সংযুক্ত হয়। আমাদের মনে হয়, এই সিংহভূম জেলার কোন স্থানে পরিব্রাজকবর্ণিত "কি-লো-ন-সু-ফ-ল-ন" বা কর্ণ-

কর্ণসুবর্ণ-রাজ্য।

---

* J. A. S. B. Vol. XXII. pp. 281-282.

সুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জেনারেল কানিংহাম সাহেবও এই মতাবলম্বী।

ইউয়ান চোয়াঙের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে কর্ণ-সুবর্ণের নাম নাই।† তবে বাঁকুড়া ও মানভূম জেলায় মাল-পাহাড়ীদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা আছে। জানা গিয়াছে, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবংশ মাল বা মল্লজাতীয় ছিলেন; মেদিনীপুর জেলার কিয়-দংশও অদ্যাপি মালভূম বা মল্লভূম নামে পরিচিত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন উড্রদেশের কিয়দংশও পরবর্ত্তিকালে কর্ণসুবর্ণ-রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত হইয়াছিল; পরে আবার ঐ ভূভাগের কিয়দংশই মল্লভূম নামে পরিচিত হয়।

মালভূম বা মল্লভূমি।

পরবর্ত্তিকালে সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গেলে, উহার কিয়দংশ উৎকলের সহিত মিলিত এবং অবশিষ্টাংশ রাঢ়দেশ নামে পরিচিত হয়। এই সময় রাঢ়দেশ বলিতে প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকেই বুঝাইত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "সুহ্মাঃ—রাঢ়াঃ", সুহ্মই রাঢ়দেশ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়-দেশের নাম পাওয়া যায়।

রাঢ়দেশ।

"গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধামপরমং তত্রোত্তমা ন পিতঃ।"

রাঢ়দেশ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

---

* Archaelogical Survey Report Vol. VIII. p. 9.

† সুপণ্ডিত উইলসন সাহেবের মতে মার্কণ্ডেয়পুরাণ খৃঃ নবম কি দশম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। দক্ষিণরাঢ়ের দক্ষিণসীমা হইতে উৎকলের সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। উৎকলের সীমা উত্তরে রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত ভূভাগই সে সময় উৎকলের অন্তর্ভূত হয়। চৈতন্যভাগবতে ভাগীরথীর পশ্চিমপার হইতেই উৎকলের সীমা আরম্ভ: চৈতন্যদেব ডায়মণ্ড-হারবারের নিকট নদীপার হইয়াই উৎকলে পদার্পণ করিয়াছিলেন *।

আকবরের সময়ের রাজস্ব-বিভাগ।

মুসলমান অধিকারসময়েও উড়িষ্যার সীমা উত্তরে রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট্ আক্‌বর শাহের বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব রাজা তোডরমল্ল বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব-নির্দ্ধারণকল্পে, সুবা বাঙ্গালাকে কতকগুলি সরকারে বিভক্ত করেন। ঐ সরকারগুলিকেও আবার মহাল নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ঐ নির্দ্দেশক্রমে বঙ্গদেশ ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে এবং উড়িষ্যাপ্রদেশ ৫টি সরকার ও ৯০টি মহালে বিভক্ত হয়। †

উড়িষ্যাপ্রদেশের ৫টি সরকারের মধ্যে জলেশ্বর সরকার অন্যতম। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই তৎকালে এই জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভূত হইয়াছিল; অবশিষ্ট অতি সামান্য অংশই বাঙ্গালার সরকার মান্দারণ বা মাদারুণের অন্তর্গত থাকে। সরকার মান্দারণ অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর হইতে আরম্ভ হইয়া বর্দ্ধ-

---

* উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃঃ ১২।

† Prof. Blochman's Ain-i-Akbari Vol. I.

মান জেলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ এবং হাবড়া জেলার পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া ও মহিষাদল পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬টি মহাল সরকার মান্দারণের অন্তর্ভূত ছিল; তন্মধ্যে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বোক্ত অংশ নিম্নলিখিত ৪টি মহালের অন্তর্ভূত হয়ঃ—

(১) চিতুয়া—দাসপুর থানায় এখনও এই নামে একটি পরগণা আছে। (২) সাহাপুর—ডেবরা থানায় এই নামেও একটি পরগণা বিদ্যমান। (৩) মহিষাদল—রূপনারায়ণ ও হলদীনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটি তৎকালে এই মহালের অন্তর্গত ছিল। মহিষাদল নামেও একটি পরগণা আছে। (৪) হাভেলি মান্দারুণ—এই জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও বরদা পরগণা এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ এই মহালের অন্তর্ভূত ছিল।

উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত সরকার জলেশ্বর নিম্নলিখিত ২৮টি মহালে বিভক্ত ছিল, দেখা যায়, তন্মধ্যে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় ২০টি মহাল পড়ে। †

(১) বগড়ী—এই জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও গড়বেতা থানায় এখনও এই নামে একটি পরগণা আছে।

---

* Blochman's Geographical and Historical notes on the Burdwan and Presidency Division in Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. 1. pp. 369.

† Blochman's Notes in Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. I. p. 359; J. Beam's notes on Akbari Subas No. II. Orissa in J. R. A. S. 1896 pp. 743-765; Rai Manomohan Chakrabarti Bahadur's "Notes on the Geography of Orissa" J. A. S. B. Vol. XII. 1916 No. I pp. 46-56.

(২) ব্রাহ্মণভূম—কেশপুর ও শালবনী থানায় এই নামেও একটি পরগণা বিদ্যমান।

(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর—এই মহালে তৎকালে একটি দুর্গ ছিল। ডেবরা ও পাঁশকুড়া থানায় কুতুবপুর নামেও একটি পরগণা আছে।

(৪) রাইন্—এই মহালটিতে তৎকালে তিনটি দুর্গ ছিল। সুপণ্ডিত বীম্‌স সাহেবের মতে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রাইবনিয়াগড় ও রাইবনিয়া গ্রামের নামের সহিত এই মহালের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ব্লকম্যান সাহেব অনুমান করেন যে, এই মহালটি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। আমরাও এই অনুমানের সমর্থন করি। মনো-মোহন বাবুও এই মতাবলম্বী। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান বরদা ও চিতুয়া পরগণার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই মহালটি বিদ্যমান ছিল।

(৫) মেদিনীপুর—এই মহালের অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরে তৎকালে দুইটি দুর্গ ছিল। মনোমোহন বাবু অনুমান করেন, এই দুইটি দুর্গের একটি কর্ণেলগোলা পল্লীতে অবস্থিত বর্ত্তমানে পুরাতন জেল নামে এবং অন্যটি সহরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত গোপগ্রামে এক্ষণে বিরাটরাজার গোগৃহ নামে পরিচিত হইতেছে।

(৬) খড়কপুর—খড়্গপুর নামে খড়্গপুর থানায় একটি পরগণা আছে। এখানেও একটি দুর্গ ছিল। এই মহাল হইতে পাঁচ শত তীরন্দাজ ও মসাল-বাহক রাজসরকারে সরবরাহ করা হইত।

(৭) কেদারকুণ্ড—এই মহালে তিনটি দুর্গ ছিল। সবঙ্গ ও ডেবরা থানায় এই নামে একটি পরগণা আছে।

(৮) গাগনাপুর—ব্লক্‌ম্যান ও বীম্‌স সাহেব এই মহালটিকে দাঁতন থানার বর্ত্তমান গগনেশ্বর পরগণা বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু গাগনাপুর নামে পাঁশকুড়া থানায় এখনও একটি পরগণা আছে। মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরাও বিবেচনা করি, এই পরগণাটিই সেই প্রাচীন মহালের নিদর্শন।

(৯) কাশীজোড়া—ডেবরা, পাঁশকুড়া প্রভৃতি থানায় এই নামে একটি বৃহৎ পরগণা আছে। এই মহালটি হইতে দুই শত অশ্বারোহী, আড়াই হাজার তীরন্দাজ ও মসালধারী সৈন্য রাজসরকারে সরবরাহ করা হইত।

(১০) সবঙ্গ—এই নামেও একটি পরগণা আছে। এই মহালেও একটি দুর্গ ছিল।

(১১) তমলুক—তমলুকেও একটি দুর্গ ছিল। তমলুক নামেও একটি পরগণা আছে।

(১২) বাজার—সম্ভবতঃ মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ঢেঁকিয়া-বাজার পরগণাটিই প্রাচীন মহালের পরিচয় দিতেছে। মনোমোহন বাবুও ঐরূপ অনুমান করেন।

(১৩) দ্বারশরভূম—বীম্‌স সাহেব অনুমান করেন, এই মহালটি সুবর্ণরেখা হইতে আরম্ভ হইয়া রসুলপুর নদী পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত ভূমিখণ্ডকে লইয়াই গঠিত; কিন্তু মনোমোহন বাবু সে অনুমানের খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই মহালটি এই জেলার পশ্চিমাংশে দক্ষিণে সুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংসাবতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্ত্তমান [illegible], ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর থানার অধিকাংশই এই মহালের অন্তর্ভূত ছিল।

(১৪) নারায়ণপুর ওরফে খান্দার—এই মহালেও একটি দুর্গ

ছিল। নারায়ণগড় ও খান্দার নামে এখনও দুইটি পরগণা আছে।

(১৫) করোই বা কেরৌলি—মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা এখনকার দাঁতুন ও এগরা থানার অন্তর্গত কুরুলচৌর পরগণা।

(১৬) তরকোল—এই মহালে তৎকালে একটি দুর্গ ছিল। সম্ভবতঃ ইহা এখনকার দাঁতুন থানার অন্তর্গত তুরকাচৌর পরগণা।

(১৭) মালছটা বা মালঝিটা—বর্ত্তমান কাঁথি মহকুমার অধিকাংশই এই মহালের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(১৮) বালিসাহি ঃ—রামনগর থানায় কালিন্দী-বালিসাহি ও উড়িষ্যা-বালিসাহি নামে দুইটি পরগণা আছে।

(১৯) ভোগরাই ঃ—এই নামে একটি পরগণার কিয়দংশ এক্ষণে এই জেলার রামনগর থানায় এবং কিয়দংশ বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বালিয়াপাল থানায় আছে। তৎকালে ভোগরাই মহালেও একটি দুর্গ ছিল। এই মহাল হইতে একশত অশ্বারোহী এবং আড়াই হাজার তীরন্দাজ ও মশাল-বাহক সৈন্য সরবরাহ করা হইত।

(২০) তলিয়া ও কশবা জলেশ্বর ঃ—এই মহালটির মধ্যে সরকার জলেশ্বরের প্রধান নগর জলেশ্বর সহরটি অবস্থিত ছিল। এই মহালের অধিকাংশই এই জেলার মধ্যে পড়িয়াছিল; অবশিষ্ট সামান্য অংশ বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল দেখা যায়। নিজ জলেশ্বর সহরটি এক্ষণে বালেশ্বর জেলার মধ্যে অবস্থিত।

(২১) রাইপুর ঃ—এই নামে বাঁকুড়া জেলায় এখনও একটি পরগণা আছে।

(২২) সিয়াড়ী ঃ—ব্লকম্যান সাহেব অনুমান করেন, ইহা এই জেলার অন্তর্গত এখনকার চিয়াড়া পরগণা; কিন্তু মনোমোহন বাবুর মতে ইহা বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সিয়ারী পরগণা।

(২৩) করাই ঃ—বীমস্ সাহেবের মতে ইহা এই জেলার অন্তর্গত কেশিয়াড়ী পরগণা, কিন্তু মনোমোহন বাবু ইহাকে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত কুড়াই পরগণা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

(২৪) বারপদা বা পারবদা ঃ—উড়িষ্যার গড়জাত মহালের অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ-রাজ্য।

(২৫) রেমনা ঃ—বালেশ্বর জেলায় এক্ষণে এই নামে একটি প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়।

(২৬) বালকুশী বা বালিকুটী ঃ—মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা বর্ত্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সোরো পরগণা।

(২৭) বাঁসদা বা বাসণ্ডা ঃ—বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত। জলেশ্বরের নিকট বাঁসডিহা বা বাঁসদা নামে একটি গ্রাম আছে।

(২৮) পিপ্পী বা বিব্লি ঃ—বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত পিপ্পী-সাহা বন্দর। ইহা এক সময়ে সুবর্ণরেখার একটি প্রধান বন্দর ছিল। ডিব্যারোর এবং রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে উহা পোপলাই (Popolai) ও পিপ্লিপত্তন (Piplipatan) নামে উল্লিখিত আছে।

তমলুক দেশ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মাদলাপাঞ্জীতে উৎকলের প্রাচীন রাজস্ব-বিভাগের মধ্যে তমলুকের নাম নাই; কিন্তু আইন-ই-আক্‌বরীর মহাল বিভাগে তমলুকের নাম আছে। সুতরাং তৎপূর্ব্বেই যে তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রায় ঐ সময়েই রচিত জগমোহন পণ্ডিতের "দেশাবলী-বিবৃতি" নামক সংস্কৃত পুঁথিতে দেখা যায় যে, তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমে সমস্ত দেশকে লোকে তমলুক দেশ বলিত। বেহালা, বঁড়িশা, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি এ সমস্তই তমলুক দেশের অন্তর্গত ছিল। মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক এই "দেশাবলী-বিবৃতি" নামক গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি অনুমান করেন যে, জগমোহন পণ্ডিত ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাটনা নগরের সুবাদার কি জায়গীরদার বিজ্জলদেব নামে এক চৌহান রাজার আজ্ঞায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত-সমন্বিত এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সময়ের রচিত আরও একখানি সংস্কৃত পুঁথিতেও তমলুকের কথা পাইয়াছেন। যথাঃ—

"মণ্ডলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্য চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তাখ্যদেশশ্চ বাণিজ্যং চ নিবাসভূঃ॥ ৪৪
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্ত রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ।
মৎস্যা গব্যানি যত্রৈব সম্পদ্যতে ভৃশং নৃপ॥ ৪৬
কৌচদামলকে দেশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ।
লবণনামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠতি ভূরিশঃ॥ ৪৮
প্রণালী দ্বিত্রিকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ।
মালংগণা মনুষ্যাণাং নিবাসং বসতি কিল॥ ৫০
প্রায়ঃ সমুদ্রবেগশ্চ তাম্রলিপ্তনদীষু চ।
দিবানিশং কদাচিন্ন বিশ্রাম্যতি মহীপতে॥ ৫২"

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানি হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ ভানদেশ নামেও পরিচিত ছিল। যথাঃ—

ভানদেশ।

"কংসাবত্যা হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ।
উভয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি॥
বকদ্বীপাৎ পূর্ব্বভাগে মণ্ডলঘট্টস্য পশ্চিমে।
ত্রয়োদশযোজনৈশ্চ মিতো হি ভানদেশকঃ॥

কেচিদ্‌বদন্তি ভূপাল ভানকং ক্ষৌমভূমিকম্‌।
কন্দলীপট্টসূত্রাণামাকরো হি স্থলে স্থলে॥
পট্টসূত্রস্য জননাৎ ক্ষৌমভূমিশ্চ বিশ্রুতা।
ধীবরাণাঞ্চ নিবাসো বর্ত্ততে যত্র ভূরিশঃ॥
মধ্যদেশিব্রাহ্মণানাং বসতির্বৈ পুরা কৃতা।
বল্লালসেনেন ভূপাল রাজাদিশূরসূনুনা॥
অকুলীন-কুলীনত্ব-ব্রাহ্মণানাং বিভাগশঃ।
স্থানং ত্রিষু হি দেশেষু কৃতং বৈ নৃপসূনুনা॥"

কংসাবতী,শিলাবতী, বকদ্বীপ (বগড়ী) ও মণ্ডলঘাট এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী প্রদেশটি তৎকালে ভানদেশ নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশী ব্রাহ্মণেরা ভানদেশের অধিবাসী ছিলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র এই প্রদেশে প্রস্তুত হইত। ভানদেশে তিনটি প্রধান নগর ছিল;—চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার। চন্দ্রকোণা নগর মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমায় এখনও বিদ্যমান আছে; ভূরিশ্রেষ্ঠ এখন মেদিনীপুর জেলায় নাই, হুগলি জেলায় গিয়াছে। এক সময় ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরসুট দক্ষিণরাঢ়ের রাজধানী ছিল। ৯১৩ শকে ভূরসুটে পাণ্ডুদাস নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার উৎসাহে শ্রীধর পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের এক টীকা লিখেন;—টীকার নাম "ন্যায়কন্দলী।" উহা এখনও বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গণনীয়। ১০৯২ খৃষ্টাব্দে যখন কৃষ্ণমিশ্র চণ্ডেল রাজার অভ্যর্থনার্থ নাটক রচনা করেন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠতে নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রভাকরমতের শালিকনথী পুঁথি তাঁহাদের পাঠ্য ছিল এবং তাঁহারা আপনাদিগকে অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এই ভূরিশ্রেষ্ঠেই

বাঙ্গালার মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠের এখন আর সে দিন নাই। তামাকের জন্যই এখন লোকে ভূরিশ্রেষ্ঠের নামোল্লেখ করে। বলিয়ার নগর কোথায় ছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। *

মাদলাপাঞ্জীতে উৎকলের রাজস্ব-বিভাগে বকদ্বীপ, ভানদেশ, তমলুক, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি স্থানের নাম নাই; এ সকল স্থান তখন তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। আমাদের বিবেচনায় তাম্রলিপ্ত-রাজ্যও সে সময় ঐ সকল রাজস্ব-বিভাগে বিভক্ত ছিল। মোগল-সম্রাটের রাজস্ব-সচিব সেই সকল প্রাচীন বিভাগের ভাঙ্গাগড়া করিয়াই পূর্ব্বোক্ত মহালগুলি গঠিত করিয়া থাকিবেন।

খৃষ্টীয় ১৬৪৬ অব্দে সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি রাজা তোডরমল্লের সময়ের উড়িষ্যার অন্তর্গত জলেশ্বর, কটক ও ভদ্রক সরকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ১২টি সরকার ও ২৭৬টি মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগানুসারে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার মুজকুরি, সরকার মালঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তর্ভূত হইয়াছিল। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান তমলুক মহকুমার প্রায় সম্পূর্ণটি এবং জঙ্গলমহালের কিয়দংশ ও দাঁতন থানা ব্যতীত সদর মহকুমার বাকী সমস্ত অংশই সরকার গোয়ালপাড়ার, এগরা ও রামনগর থানা দুইটি ব্যতীত কাঁথি মহকুমার অবশিষ্টাংশ সরকার মালঝিটার, রামনগর থানা

সাজাহানের সময়ের রাজস্ব-বিভাগ।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মেদিনীপুর শাখার ৪র্থ বার্ষিক উৎসবের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণ।

ও বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ সরকার মুজকুরির এবং দাঁতন ও এগরা থানা আর বালেশ্বর জেলার কতকাংশ সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভূত ছিল। এই চারিটি সরকারে তৎকালে (যথাক্রমে ২৮, ২০, ১১ ও ২২) ৮২টি মহাল ছিল। * রাজা তোডরমল্লের সময়ের এই জেলার অন্তর্ভূত পূর্ব্বোক্ত ২০টি মহালের সহিত সাসুজার সময়ের এই ৮২টি মহালের স্থাননির্দ্দেশ করিলে দেখা যায় যে, কেবল দ্বারশরভূম ব্যতীত অন্য ১৯টি মহালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরবর্ত্তিকালে এই ৮২টি মহালের সৃষ্টি হয়। দ্বারশরভূম মহাল এবং বাঁকুড়া, সিংহভূম ও মানভূম জেলার অধিকাংশই তৎকালে ঝাড়খণ্ড নামে জঙ্গলমহালভুক্ত ছিল।

সাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম-বঙ্গে পর্টুগীজ দস্যুগণ ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করায় সম্রাট্ সাজাহান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে উড়িষ্যার অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত চারিটি সরকার হইতে কয়েকটি মহালের কোনটির সম্পূর্ণ, কোনটির বা অংশবিশেষ লইয়া হিজলী ফৌজদারী এবং রেমনা, বস্তা ও মুজকুরি সরকার হইতে কয়েকটি মহাল লইয়া বন্দর বালেশ্বর ফৌজদারী গঠিত হইয়াছিল। † ঐ সময়ে হিজলী ফৌজদারীকে সুবা উড়িষ্যা হইতে বিযুক্ত করা হয়; তদবধি মেদিনীপুর জেলার উক্ত অংশ বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ‡ কিন্তু অবশিষ্টাংশ ইহার

---

* Grant's Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal in the Fifth Report on East India Affairs edited by Ven. W. K. Firminger Vol. II. 454-456.

† Grant's Analysis—Fifth Report—Firminger vol. II. pp. 45. 182-183, 189.

‡ Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. III. p. 199.

পর বহুদিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অন্তর্ভূত ছিল। এই সময় উড়িষ্যার পূর্ব্বোক্ত চারিটি সরকার হইতে মোট ৩১টি সরকার বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। তন্মধ্যে সরকার গোয়ালপাড়া হইতে ৩টি, সরকার মালঝিটা হইতে ১৭টি, সরকার মুজকুরি হইতে ৪টি ও সরকার জলেশ্বর হইতে ৭টি গৃহীত হয়। শেষোক্ত ৩টি সরকারের ২৮টি মহাল লইয়া হিজলী ফৌজদারী গঠিত হইয়াছিল।

হিজলী ও বালেশ্বর ফৌজদারী বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইলে পর সুলতান সুজার নির্দ্ধারিত উড়িষ্যার পূর্ব্বোক্ত ৬টি সরকারের প্রত্যেকটি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যে অংশগুলি বাঙ্গালাদেশের অন্তর্ভূত হইয়াছিল, সেগুলি কিস্‌মৎ সরকার (যথা—সরকার জলেশ্বর কিস্‌মৎ, সরকার মুজকুরি কিস্‌মৎ প্রভৃতি) নামে পরিচিত হয়। (এই একই কারণে কোন কোন মহালেরও কিস্‌মৎ সিপুর, কিস্‌মৎ পটাশপুর প্রভৃতি নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে)।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা সুবা বাঙ্গালারও রাজস্বের এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। উহাতে দেখা যায় যে, তিনি তোডরমল্লের সময়ের বাঙ্গালার পূর্ব্বোক্ত ১৯টি সরকারের সহিত হিজলী ও বন্দর বালেশ্বর ফৌজদারীর ছয়টি কিস্‌মৎ সরকার এবং নূতন গঠিত আরও নয়টি সরকার মিলিত করিয়া সুবা বাঙ্গালাকে ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত করিয়াছিলেন।* ঐ সময় পুরাতন সরকার-বিভাগের সীমারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

রাজা তোডরমল্লের সময়ের সরকার মান্দারুণের অন্তর্গত এবং এই জেলার মধ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত চারিটি মহালের মধ্যে চিতুয়া মহাল নূতন বন্দোবস্তেও সরকার মান্দারুণের অন্তর্ভূতই থাকে। কিন্তু সাহাপুর

* Grant's Analysis pp. 182-183 Vol. II.

ও মহিষাদল মহাল দুইটি যথাক্রমে সরকার কিস্‌মৎ গোয়ালপাড়ার ও সরকার কিস্‌মৎ মালঝিটার অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরাতন সরকার মান্দারুণের অন্যতম মহাল হাভেলি মান্দারুণের অন্তর্গত বরদা ও চন্দ্রকোণা ভূভাগ ঐ সময়ে সরকার পেস্কোসের অন্তর্ভূত হইয়াছিল; * সরকার পেস্কোস কোন সীমা-নির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইত না। বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজারা যখন মুসলমানরাজের নিকট পরাভূত হইতেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ উপঢৌকন, কখনও বা কিঞ্চিৎ নজর পেস্কোস অথবা সামান্য করদান স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। কেহ কেহ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবেন বলিয়া সামান্য নজর পেস্কোস দিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। সুবা বাঙ্গালায় তৎকালে বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে এইরূপ যে সকল জমিদার ছিলেন, সুলতান সুজা সেই সকল জমিদারের জমিদারিকে সরকার পেস্কোসের অন্তর্ভূত করিয়াছিলেন। † মোটামুটি বলা যায়, সরকার মান্দারুণ ও সরকার পেস্কোসের কিয়দংশ লইয়াই বর্ত্তমান ঘাটাল মহকুমা।

খৃষ্টীয় ১৭২২ অব্দে বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ সুবা বাঙ্গালার রাজস্বের তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন; তিনি ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সুজার নির্দ্ধারিত ৩৪টি সরকারের সমাহার করিয়া সুবা বাঙ্গালাকে ১৩টি চাকলায় ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। ‡ ঐ সময় হইতে মহালগুলি পরগণা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ¶ মুর্শিদকুলির বিভাগানুসারে হিজলী ফৌজদারীর অন্তর্ভূত সুজার

* Grant's Analysis. Vol. II. pp. 465, 410, 411, 459.

† Grant's Analysis Vol. II. p. 184.

‡ Grant's Analysis Vol. II. pp. 188-189.

¶ J. A. S. B. Vol. XII. 1916 No. I. p. 32.

নির্দ্ধারিত কিস্‌মৎ জলেশ্বর, কিস্‌মৎ মালঝিটা ও কিস্‌মৎ মুজকুরির অন্তর্গত ৩৫টি পরগণা চাক্‌লা হিজলীর অন্তর্ভূত হয়। * গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (আমলি ১১৩৫ সাল) চাক্‌লা হিজলীতে ৩৮টি পরগণা ছিল এবং তৎকালে হিজলীর পরিমাণফল ১০৯৮ বর্গমাইল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। † ঐ সময় সরকার পেস্কোসের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও বরদা পরগণা এবং সরকার মান্দারুণের অন্তর্গত চিতুয়া পরগণা চাক্‌লা বর্দ্ধমানের অন্তর্ভূত হয়। ‡

মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব-বিভাগ।

চাক্‌লা হিজলী ও চাক্‌লা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত পরগণাগুলি ব্যতীত জলেশ্বর, মুজকুরি ও গোয়ালপাড়া সরকারের অন্যান্য পরগণাগুলি বাঙ্গালার চাক্‌লাবিভাগের পর বহুদিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অন্তর্গতই ছিল। পরবর্ত্তিকালে সেগুলি নূতন গঠিত চাক্‌লা মেদিনীপুর বিভাগের অন্তর্ভূত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্তানুসারে নবাব মিরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চাক্‌লা বর্দ্ধমান, চাক্‌লা মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম (থানা ইসলামাবাদ) প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিলে, ঐ সকল স্থানে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ¶ কিন্তু চাক্‌লা হিজলীতে তখনও মুসলমানদিগের আধিপত্য থাকে। ১৭৬৫খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, চাক্‌লা হিজলীও ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। §

চাক্‌লা মেদিনীপুর।

---

* Grant's Analysis Vol. II. p. 189.

† Grant's Analysis Vol. II. pp. 364-365.

‡ Grant's Analysis Vol. II. pp. 366, 410, 411.

¶ H. Verelst's "A view of the English Government in Bengal (1772) App. No. 47. Aitchison Vol. I. pp. 216-217.

§ H. Verelst's view Vol. I. pp. 225-226.

গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ববিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে চাক্‌লা মেদিনীপুরে ৫৪টি পরগণা ছিল এবং উহার পরিমাণফল ৬১০২ বর্গ-মাইল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। *

মেদিনীপুর জেলা।

সমস্ত বঙ্গদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থ কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ের চাক্‌লা বিভাগগুলিকে জেলা-বিভাগের মূলভিত্তি বলা যাইতে পারে। দেখা যায়, চাক্‌লা মেদিনীপুর সে সময় জলেশ্বর ও মেদিনীপুর নামে দুই বিভাগের অন্তর্ভূত থাকে। আধুনিক মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ভূভাগ তৎকালে বর্দ্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও হিজলী, এই চারিটি জেলারই অন্তর্ভূত ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জলেশ্বর জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। † ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হইলে, এই জেলার উত্তরাংশের কয়েকটি পরগণা আবার হুগলী জেলার অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। উত্তরকালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বগড়ী পরগণা এবং হুগলীর অন্তর্ভূত পূর্ব্বোক্ত পরগণাগুলি ও সমগ্র হিজলী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর জেলা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকায় নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলার প্রান্তভাগ হইতে কোন কোন স্থান নিকটবর্ত্তী অন্য জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন স্থান অন্য জেলা হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে। পরে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

* Grant's Analysis pp. 457-460.

† Firminger's Fifth Report Vol. II. p. 734. "Extract from the Proceedings of the Board of Revenue dated 13-4-1787."

বাঙ্গালার শেষ নবাবদিগের আমলে সুবর্ণরেখা নদী উড়িষ্যার উত্তর-সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। সে সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডকে উড়িষ্যার অন্তর্গত বলিয়া অধিকার করিত; কিন্তু সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী মেদিনীপুর প্রদেশটি তখনও কাগজে-কলমে উড়িষ্যারাজ্য বলিয়াই পরিচিত হইত। * কোম্পানীর অধিকারের প্রারম্ভেও সুবর্ণরেখা ও রূপনারায়ণ নদীর মধ্যবর্ত্তী চাক্‌লা মেদিনীপুর বিভাগটি উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; পরবর্ত্তিকালে ঐ বিভাগ বঙ্গদেশের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

মোটামুটি দেখিতে গেলে রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটি লইয়াই বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা। উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, পূর্ব্বে হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ করদরাজ্য ও সিংহভূম জেলা এবং পশ্চিমোত্তরে মানভূম জেলা—এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশটি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা নামে পরিচিত এবং উহাই এই পুস্তকের আলোচ্য। মেদিনীপুর জেলা ২২° ৫৬´ ৪০´´ হইতে ২১° ৩৬´ ৪০´´ অক্ষাংশ উত্তর এবং ৮০° ১৩´ ৩´´ হইতে ৮৬° ৩৫´ ২২´´ দ্রাঘিমাংশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

---

* In the last century Orissa included the tract of country between the river Rupnarayan and Subarnarekha"—Bengal Adminstration Report 1872-73 p. 40.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূ-বৃত্তান্ত।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, একসময় রাজমহল-পর্ব্বতমালা বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীমা ছিল। পরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দমে পুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান নিম্ন-বঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। সে সুদূর অতীতকালের কথা। সে যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগের যে সময় হইতে এই প্রদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেই সময় হইতে ইহার ভূমি-প্রকৃতির আলোচনা করিলে পরিলক্ষিত হয় যে, যুগে যুগে এই প্রদেশের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে রূপনারায়ণ নদীর তীরে এক্ষণে তমলুক নামে যে নগরটি বর্ত্তমান, পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাই প্রাচীন কালের তাম্রলিপ্তনাম্নী মহানগরী। মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি পাঠে জানা যায়, তৎকালে এই নগরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল; এই জন্য ইহার একটি নাম "বেলাকূল"। শব্দকল্পদ্রুমে এই বেলাকূল শব্দের অর্থে লিখিত আছে—"বেলাকূলং (ক্লীং) তাম্রলিপ্তা-দেশঃ।" বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ ও গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেও জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মহাসমুদ্র তখন তাম্রলিপ্তের

পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। পরবর্ত্তিকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তেও তাম্রলিপ্ত উপসাগরের তীরবর্ত্তী একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সমুদ্র তখন তাম্রলিপ্তের প্রায় আট ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আট ক্রোশ অন্তরে গিয়াছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, যে সময় সমুদ্র তাম্রলিপ্তের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত,সে সময় বর্ত্তমান তমলুকের দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত সুতাহাটা, নন্দাগ্রাম, খাজুরী প্রভৃতি থানার কোনটির সম্পূর্ণ, কোনটির বা অধিকাংশ ভূমিরই অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমশঃ নদীর মোহানায় পলি পড়িয়া ঐ সকল স্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের ভূমিপ্রকৃতিও বর্ত্তমানে সেই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

কাল যুগে যুগে মেদিনীপুর জেলার সীমায় এইরূপে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার ভূমি-পরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমান—কিঞ্চিদূন প্রায় এক শত মাইল। এই জেলার দক্ষিণে সাগরতট হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, ভূমি ক্রমশঃ ততই প্রাচীন, উন্নত, অনুর্ব্বর এবং প্রস্তরময় পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর জেলার ভূমি-প্রকৃতি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এই জেলার উত্তরে হুগলী জেলার সীমা হইতে চন্দ্রকোণা ও কেশপুর থানার মধ্য দিয়া বর্দ্ধমান রাস্তা নামে পরিচিত যে পথটি মেদিনীপুর সহর পর্য্যন্ত আসিয়া জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া বালেশ্বর জেলার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এই জেলাকে উত্তর-দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গিয়াছে, সেই রাজপথটি এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। শ্রীযুক্ত ওম্যালী সাহেব (Mr. L. S. S. O'malley I. C. S.) মেদিনীপুরের গেজে-

ভূমি-প্রকৃতি।

টিয়ারে লিখিয়াছেন যে, রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়া যে রাস্তাটি মেদিনীপুর সহরে জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া,মেদিনীপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তাটির দ্বারাই এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্রকৃতি নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু জগন্নাথ রাস্তার দুই পার্শ্বের ভূমি-প্রকৃতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও রাণীগঞ্জ রাস্তা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ঠিক নহে। মেদিনীপুর সেটেল-মেণ্টের ফাইনেল রিপোর্টে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত জেম্‌শন সাহেব (Mr. A. K. Jameson M. A., I. C. S.) ওম্যালীসাহেবের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। আমরাও দেখিয়াছি, রাণীগঞ্জ রাস্তার পশ্চিমপার্শ্বের ভূমির ন্যায় পূর্ব্বপার্শ্বের ভূমিও বহুদুর পর্য্যন্ত (প্রায় বর্দ্ধমান রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত) একইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন। কিন্তু বর্দ্ধমান রাস্তার দুই পার্শ্বের ভূমি-প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই বর্দ্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পশ্চিমদিক্‌স্থ ভূমি প্রস্তরময় এবং পূর্ব্বদিক্‌স্থ ভূমি মৃত্তিকাময়। এই ভূমিখণ্ডদ্বয় আবার দুই দুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমপার্শ্বের প্রদেশটির উত্তরাংশ* নাতিক্ষুদ্র শৈলমালায় এবং নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ। উক্ত প্রদেশটির দক্ষিণাংশের ভূমি কঙ্করময়, স্তরমণ্ডিত, কঠিন ও রক্তবর্ণ। দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি অনুর্ব্বর।

পূর্ব্বোক্ত পশ্চিমপার্শ্বস্থ প্রদেশটির ন্যায় রাজপথটির পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশটির ভূমি-প্রকৃতিও দ্বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট। এই প্রদেশের উত্তরাংশ মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণাংশ নামাল বা নিম্নভূমি। পশ্চিমাংশের ভূমি অপেক্ষা এই অংশের ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। এই জেলার পূর্ব্বদক্ষিণভাগের কতক অংশ নদীর মোহানাগত লোণা মৃত্তিকায় ও সমুদ্রের বালুকায় পূর্ণ। এই অংশের ভূমি এই জেলার মধ্যে উর্ব্বরতম।

মেদিনীপুর জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় নয়নপ্রীতিকর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সকল নিদর্শন এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একদিকে যেমন নানাবিধ বৃক্ষলতাদি-শোভিত শৈলমালা ও বনজঙ্গলাদি বিরাজিত, তেমনি আবার অন্যদিকে সুনীলসিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে ইহার পাদমূল ধৌত করিয়া দিতেছে। কংসাবতী, শিলাবতী, সুবর্ণ-রেখা প্রভৃতি নদী সকল দুগ্ধস্রোতের ন্যায় এই জেলার বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

নদ-নদী।

মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি নদী প্রবাহিত, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান।

এই পাঁচটি নদীর বিবিধ শাখা এই জেলার মধ্য-ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাপন কূলসন্নিহিত প্রদেশকে শস্যশালী করিয়াছে।

(১) শিলাবতী বা শিলাইঃ—বুড়ি, গোপা, পুরন্দর ও কুবাই নদী মিলিত হইয়া শিলাবতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নদীটি রামগড় পাহাড় হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া ঘাটাল মহকুমার মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে এই উভয় নদী স্ব স্ব নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক রূপনারায়ণ নদ নাম গ্রহণ করিয়া তমলুক মহকুমার অন্তর্গত গেঁওখালী নামক স্থানে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(২) কংসাবতী বা কাঁসাইঃ—এই নদীটি ছোট-নাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া এই জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে রামগড় পরগণায় প্রবিষ্ট হয়, পরে মেদিনীপুর সহরের নিম্নভাগ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া আবার দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কেলেঘাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৩) কেলেঘাই বা কালীঘাই ঃ—ইহা এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তে জন্মিয়া উত্তরে নারায়ণগড়, সবঙ্গ ও ময়না এবং দক্ষিণে খট্‌নগর, পটাশপুর ও অমর্শি প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পরে টেঙ্গরাখালী নামক স্থানে দক্ষিণবাহিনী কংসাবতীর জলপ্রবাহ প্রাপ্ত হইয়া হল্‌দিনদী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরে মহিষাদল ও সুতাহাটা এবং দক্ষিণে নন্দীগ্রাম থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বৃহৎকলেবরে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৪) বাগদা রশুলপুর ঃ—এই নদীটি এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম ভূভাগে বাগদা নদী নামে জন্মিয়া কালিনগর নামক স্থানে বোরোজ নদীর (এক্ষণে সদরখাল নামে পরিচিত) সহিত মিলিত হইয়া রশুলপুর নদী নামগ্রহণ পূর্ব্বক হুগলী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

(৫) সুবর্ণরেখা ঃ—ইহা পশ্চিমে ধলভূম প্রদেশে জন্মিয়া এই জেলার অন্তর্গত নয়াবসান নামক পরগণার পশ্চিমপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

নদ-নদীর গতি-পরিবর্ত্তন।

এই প্রদেশ গঙ্গার মোহানায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত থাকায় এবং এই প্রদেশের নদী সকল উত্তর ও পশ্চিমদিক্ হইতে আসিয়া দক্ষিণে ও পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ায় এই জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশেই বেশী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। পর্টুগীজ ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়ান নাবিকদিগের খৃষ্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত বাঙ্গালার কয়েকখানি পুরাতন মানচিত্র আছে। সেগুলি দেখিলে জানা যায় যে, এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও এই জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তের পূর্ব্বোক্ত নদী কয়েকটির গতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রূপনারায়ণ নদীর দক্ষিণাংশে সর্ব্বাপেক্ষা

বেশী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে রূপনারায়ণ নদীর নাম আছে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই নদী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। গাশতল্ডির ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে ও ১৫৫৩ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত ডিব্যারোর মানচিত্রে এই নদী গঙ্গানামে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যানডেন ব্রুকের মানচিত্রে ভাগীরথীর পশ্চিম-দিকের কোন নদীর নাম লিখিত হয় নাই। ঐ সকল নদী পর্য্যায়ক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। সেই নির্দ্দেশমত রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ নদী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। † তৎপরে এই নদীটি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে পাথর-ঘাটা, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের বাউরীর মানচিত্রে তমালী এবং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের অঙ্কিত নাবিকদিগের মানচিত্রে তাম্বলী, তাম্বরলী, তাম্বরলীণ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল দেখা যায়। ‡ ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে দামোদরনদের দুইটি শাখার একটি তমলুকের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত ছিল এবং অন্যটি পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া কালনার নিকট ভাগীরথীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, এই সংযোগ থাকার দরুণই বৈদেশিক নাবিকগণের নিকট তৎকালে এই নদীটি ভাগীরথীর শাখা-নদী বলিয়া অনুমিত হওয়াতে তাঁহারা ইহাকেও গঙ্গানামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালের নাবিকগণ এই নদীর তীরবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত বা তমলুক নগরের নামানুসারে এই নদীকে তমালী, তাম্বলী প্রভৃতি নামে

---

* Midnapore District Gazetteer—O'Malley. p. 8.

† Hunters Statistical Account vol. 1. p. 375.

‡ District Gazetteer p. 8.

অভিহিত করিয়া থাকিবেন। রেনেল সাহেবই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মানচিত্রে ইহাকে রূপনারায়ণ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন নাবিকগণ এই নদীকে ভ্রমক্রমে "পুরাতন-গঙ্গা" নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন, একথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

ডিব্যারোর ও গাশতল্ডির মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে রূপনারায়ণ নদী দুইটি প্রশস্ত শাখায় বিভক্ত হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। ঐ দুইটি শাখার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড একটি দ্বীপের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তিকালে অঙ্কিত ভ্যালেন্টীন ও বাউরীর মানচিত্রে পশ্চিম-দক্ষিণের শাখাটির অস্তিত্ব নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্রে তমলুক হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইত দেখা যায়। ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি চিত্রিত হয় নাই। বর্ত্তমান হলদী নদী এই টেঙ্গরাখালী হইতে আরম্ভ হইয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎকালে ইহার যে অংশটি তমলুকের নিকট হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরবর্ত্তিকালে উহা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বোক্ত দ্বীপটি মেদিনীপুর জেলার ভূমিখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। ঐ দ্বীপটি এখনকার সুতাহাটা ও মহিষাদল থানা। †

সুতাহাটা ও মহিষাদল থানার ন্যায় খাজুরী থানারও নৈসর্গিক সীমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ডিব্যারোর ষোড়শ শতাব্দীর মানচিত্রে ভাগীরথীর মোহানায় একটি নূতন দ্বীপ গঠিত হইতেছিল দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ভ্যালেন্টীনের মানচিত্রে সেই স্থানে—একটির দক্ষিণে আর একটি—দুইটি দ্বীপ অঙ্কিত আছে। এই দুইটি

---

* District Gazetteer p. 8

† District Gazetteer pp. 8-9, 221.

দ্বীপ যথাক্রমে খাজুরী দ্বীপ ও হিজলী দ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহাদের কথা কোম্পানীর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কাগজ-পত্রে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এই দুইটি দ্বীপের মধ্য দিয়া কাউখালী নদী নামে একটি নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষণে উহার অস্তিত্ব নাই। ঐ নদীটি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় খাজুরী ও হিজলী দ্বীপ দুইটি একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া এক্ষণে মেদিনীপুর জেলার ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। *

জল-বায়ু ও স্বাস্থ্য।

মেদিনীপুর জেলার ভূমি-প্রকৃতি যেরূপ দ্বিবিধ, ইহার জল-বায়ুও সেইরূপ দুইপ্রকার। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ঘাটাল মহকুমার এবং মেদিনীপুর সদর মহকুমার কতকাংশের জল-বায়ু বিশেষ অস্বাস্থ্যকর; কিন্তু তমলুক ও কাঁথি-মহকুমার এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। পরন্তু চিরদিন এরূপ ছিল না। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অধিকাংশ স্থানের জল-বায়ু মন্দ ছিল এবং অন্যপক্ষে ঘাটাল ও মেদিনীপুর সদর মহকুমার জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে একদিকে যেমন এই অঞ্চল ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সেইরূপ কাঁথি ও তমলুকের লবণ-ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় ঐ অঞ্চলের জল-বায়ুরও হীনাবস্থা তিরোহিত হইয়াছে। লবণ-ব্যবসা দ্বারা জল ও বায়ু উভয়ই বিদূষিত হইত।

পশু, পক্ষী ও সরীসৃপাদি।

মেদিনীপুর জেলায় শৈল-মালা নিবিড় অরণ্য, সুবৃহৎ নদ-নদী ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সকল নিদর্শনই বর্ত্তমান থাকায় এই জেলায় নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্যাদি দেখিতে পাওয়া

* District Gazetteer p. 9.

যায়। এই জেলার জঙ্গল-মহালে কেঁদো, নেক্‌ড়ে প্রভৃতি জাতীয় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, বন্যবিড়াল, কুক, শৃগাল, বানর, হনুমান্, খরগোস, সজারু, উদ্, খাট্টাশ প্রভৃতি বন্যজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় বন্যহস্তীও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল হইতে আসিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের মৃগ ও ময়ূর এই জেলার জঙ্গল-মহালে ও অন্যান্য অনেক স্থানে আছে। টীয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নানাপ্রকারের বন্য ও সামুদ্রিক পক্ষীও এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রকারের সুস্বাদু সামুদ্রিক মৎস্য ও কাঁকড়া এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কেলেঘাই নদীর চিংড়ী মৎস্য সুপ্রসিদ্ধ। রসুলপুর, হলদী, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীতে কুম্ভীর ও শিশুকও যথেষ্ট আছে এবং সময় সময় ঐ সকল নদীর মোহানায় হাঙ্গর দেখা যায়। এই জেলা নানা প্রকার বিষাক্ত সর্প, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোধিকা ও কচ্ছপেরও বাসভূমি। মেদিনীপুর জেলার লোকালয়ে গো, মেষ, ছাগল, কুক্কুর, বিড়াল ও অশ্ব গৃহপালিত পশু; হাঁস, কপোত ও কুক্কুট গৃহপালিত পক্ষী। কেহ কেহ ময়ুর, হরিণ, শালিক, টীয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, প্রভৃতি পুষিয়া থাকে।

আবাদী ও অনাবাদী ভূমি।

মেদিনীপুর জেলার বিগত সেটেলমেণ্টের কার্য্য-বিবরণী হইতে জানা যায় যে, এই জেলায় নদীগর্ভ ছাড়া মোট ৫,০৫৬ বর্গ-মাইল বা ৩২,৩৫,৬৩৫ একার ভূমি আছে। তন্মধ্যে আবাদী ভূমি ৩,১১৬ বর্গ-মাইল বা ১৯, ৯৪, ৩৭৫ একার, আবাদের উপযোগী পতিত ১,১০৭ বর্গ-মাইল বা ৭,০৮,১৭৫ একার এবং আবাদের অনুপযোগী পতিত, ৮৩৩ বর্গ-মাইল বা ৫,৩৩,০৮৫ একার (বাস্তবাটী ৬৪,১৩৮ একার, জলাশয় ২,২০,২৭১ একার, রাস্তা, বাঁধ, শ্মশান, গোচারণ-ভূমি ইত্যাদি ২,৪৮,৬৭৮ একার)

ভূমি আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোট ভূমির শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ আবাদী, ২২ ভাগ আবাদের যোগ্য পতিত এবং অবশিষ্ট ১৬ ভাগ আবাদের অনুপযুক্ত পতিত ভূমি। উপরি উক্ত ১৯,৯৪,-৩৭৫ একার বা ৩,১১৬ বর্গ-মাইল ভূমির মধ্য হইতে ৪৭,১৭৬ একার বা ৭৪ বর্গ-মাইল মাত্র ভূমি সংবৎসরের মধ্যে দুইবার চাষ হয়। অর্থাৎ মোট ২০,৪১,৫৫১ একার বা ৩,১৯০ বর্গ-মাইল জমি এক্ষণে প্রতি বৎসর চাষ হইয়া থাকে। *

কৃষিজ দ্রব্য।

ধান্যই এই জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পূর্ব্বে এ দেশে তুলা, নীল ও তুঁতের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। এক সময় এই সকল দ্রব্য বাণিজ্যার্থে এ প্রদেশ হইতে দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত হইয়াছে। † এক্ষণে নীলের ব্যবসা নাই বলিলেই চলে, তুলার চাষ প্রায় কেহই করে না, তুঁতও পূর্ব্বের তুলনায় সামান্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক সময় এতদ্দেশে রেশম-ব্যবসায়েরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এরূপ গ্রাম ছিল না, যেখানে রেশম-ব্যবসা সম্বন্ধীয় দু'একজন অভিজ্ঞ লোক দৃষ্ট না হইত। এক্ষণে এই ব্যবসাটিও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এতদঞ্চলে কফি ও গোল আলুর চাষ বড় একটা কেহই করিত না। কিন্তু আজকাল ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় কফি ও গোল আলুর চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে। নারিকেল, সুপারি, আনারস, কদলী প্রভৃতি এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নানা প্রকার সুস্বাদু ও সদ্‌গন্ধযুক্ত পান, সুস্বাদু ও সুবৃহৎ মূলা, সার কচু, মান ও তরমুজের চাষও এই জেলার স্থানে স্থানে হইয়া থাকে।

---

* Final Report of the Midnapore District Settlement by Mr. A. K. Jameson M. A., I. C. S.

† Hunter's Orissa Vol. I. p. 313.

বাঙ্গালার শস্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। এই জেলার দোফসলী জমী সমেত মোট আবাদী ২০,৪১,৫৫১ একার জমির মধ্যে ১৮,১৯,৮৯৪ একার জমিতে কেবল ধান্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য ফসল অবশিষ্ট ২,১২,৬৫৭ একার জমিতে উৎপন্ন হয়। ধান্যোৎপত্তির পরিমান হিসাবে বাঙ্গালার জেলাগুলি বিন্যাস করিলে মেদিনীপুর প্রথম স্থান অধিকার করে। ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জের স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। * কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য যে সকল দেশে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সকল দেশের উৎপন্ন ফসলের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরে অতি সামান্য ধান্যই উৎপন্ন হয়। প্রতি একারে স্পেন দেশে ৭১½ মণ, ইটালীতে ৪১½ মণ, মিসর দেশে ৪১ মণ, জাপানে ২৬¾ মণ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৫ মণ করিয়া ধান্য উৎপন্ন হয়। † কিন্তু মেদিনীপুরে মাত্র ১৬ মণ। সমগ্র ভারতবর্ষে ধান্যোৎপত্তির গড়পরতা পরিমাণ প্রতি একারে প্রায় ২০ মণ। সমগ্র ভারতে অন্যূন দশ হাজার রকম আমন ধান্য আছে। বাঙ্গালা দেশেই প্রায় চারি হাজার প্রকার দৃষ্ট হয়। আউশ ধান্য যে কত প্রকার আছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ‡ মেদিনীপুর জেলায় নিম্নলিখিত নামে ৩০।৩২ রকমের আমন ধান্য এবং ১৫।১৬ রকমের আউশ ধান্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

আমন ধান্য ঃ—গেরিকাজল, লোনা, হেমতা, রামশাল, দ্রৌপদী-শাল, কলমকাঠি, কালিন্দী, রঙ্গিকয়াল, জামাইগাড়ু, গয়াবালি,

---

* Agricultural Statistics of Bengal 1914—15. p. 6.

† Bulletin of Agricultural Statistics of the Internatio nal Institute of Agriculture, Rome, March 1914.

‡ কৃষক, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২০।

হলুদগুঁড়ি, সোনাতার, সিতাহার, বাঁশকুলি, দাউদখানি, কামিনীকুঞ্জ, বকুলকুঞ্জ, রূপশাল, পাণ্ডুলই, পশীনাদন, চেঙ্গা, গুয়াখুরী, বাঁকুই, মহিষমুড়ি, পিঙ্গাশোল, মহীপাল, ভুতাশোল, কর্ণশাল, মেটে আকড়া, কাশিফুল, গাঁজাকলি প্রভৃতি।

আউশ ধান্য :—মন্দিরকণা, বেড়ানতি, আসলভূমনি, ঝিঙ্গি, ভুতমুড়ি, শাটী, পিপড়েশার, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, মধুমালতী, থুকুনি, কাজলা, দলকচু, সোহাগজান, তুলসীমঞ্জুরী, সৌরভি, কালামাণিক প্রভৃতি।

এই জেলায় যে যে ফসল যে পরিমাণ জমিতে উপন্ন হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। *

ফসলের নাম ও	জমির পরিমাণ(একার)	ফসলের নাম ও	জমির পরিমাণ(একার)
খাদ্য শস্য ও কলাই :—		**তৈলবীজ :—**	
ধান্য	১৮, ১৯, ৮৯৪	তিল	১৪, ১৪৭
বজরা, জনার	১২, ৩৫৯	সরিষা	১৩, ২৩৬
কোদো	২১, ৬৫৪	তিসি	৪, ৮৫৫
বিরি ও মুগ	১৮, ৪৬৯	জাড়া	১, ৬৬৪
অড়হর	৭, ৪৪৬	গুন্দলী	৭, ৪৩১
গম	৮০১	শূরগুজা	৪, ১৯৮
যব	৫৩৪	**সূক্ষ্ম তন্তু :—**	
বুট	৭৫৪	পাট	১২, ৬৪৮
খেসারি, মসুর	১৪,০৬৫	তুলা	২, ৫৫৯

* Mr. Jameson's Final Report of the Midnapore District Settlement.

মসলা ঃ—		**মাদক দ্রব্য ঃ—**	
লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি	৩, ২৬২	তামাক	৭৩৯
রং ঃ—		**বাগান ও বরোজ ঃ—**	
নীল	৯৫	আম-বাগান	১২, ০১৮
কুসুম	৩৮	কলা-বাগান ও	
চিনি ঃ—		পান-বরোজ	২৭, ৮৯৩
ইক্ষুদণ্ড	৬, ৬৩৮	তুঁত	১০, ১৭০
গাজর, বীট ইত্যাদি	৩, ৮৪৪	**বিবিধ ঃ—**	
তরি-তরকারী ঃ—		জুন ও বাবই	৫৩২
গোল আলু	৩, ১২৪	দলঘাস	১১৮
শাক-সবজি	১৪, ২৯১	মাদুরকাঠি	১, ৬৭৮
সার কচু	৩৯৭		

বৃক্ষ, লতা ও ফল, মূল, ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন এই জেলায় কাঁঠাল, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা, লোনা, জাম, জামরুল, গোলাপজাম, কামরাঙ্গা, জলপাই, তেঁতুল, আমড়া, চালতা, পেঁপে, কত্‌বেল, জামির, কাগজি, বাতাপি নেবু, তাল ও খেজুর প্রভৃতি ফল, যজ্ঞডুম্বুর, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্ত এরণ্ড, শিরীষ, ঘৃতকুমারী, ধুতুরা, শতমূল, অনন্তমূল, আমআদা, পিপুল, সজিনা, চিরতা, গুলঞ্চ, কালকাসন্দ, হাতীশুঁড়া প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদাদি এবং গোলাপ, বেল, যূঁই, চামেলী, কুন্দ, গন্ধরাজ, কামিনী, শেফালি, টগর, করবী, চাঁপা, বকুল, রজনীগন্ধা, কেতকী প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্প প্রচুর পাওয়া যায়। এই জেলার বালুকা-স্তূপের উপর বাদাম নামক এক প্রকার ফলের বৃক্ষ (Anacordium Occidental) জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ উহা "হিজলী-বাদাম" আখ্যায় আখ্যাত। ফলগুলি দেখিতে

সুন্দর এবং আস্বাদও সুস্বাদু। বাঁশ, বেত, নল, শর, খড়ি, হোগলা প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণোপযোগী শরঞ্জামীও এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জেলার জঙ্গল-মহালে শাল, পিয়াশাল, মহুল, কুসুম, পলাশ প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে জঙ্গল-মহালে এই সকল কাষ্ঠ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত; কিন্তু বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ প্রস্তুত হওয়ার পর হইতে বৎসর বৎসর জঙ্গল কাটাইয়া ঐ সকল কাষ্ঠ বিক্রীত হইয়া যাওয়াতে মেদিনীপুরে সেগুলি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

জেলার আয়তন।

মেদিনীপুর জেলার মোট পরিমাণ-ফল ৫,১৮৬ বর্গ-মাইল। * ইহার আয়তন ইংলণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ, স্কটল্যাণ্ড অথবা আর্ল্যাণ্ডের ছয় অংশের একাংশ, ডেন্‌মার্ক অথবা সুইজারল্যাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ এবং বেলজিয়ামের অর্দ্ধেকের সমান। ইউরোপের তুরস্ক অথবা ওয়েল্‌স্ মেদিনীপুর জেলার চেয়ে অল্পই বড়। মণ্টেনিগ্রোর ও মেদিনীপুর জেলার আয়তন প্রায় সমান। বঙ্গদেশের অন্তর্গত জেলাগুলির তুলনায় ময়মনসিংহ জেলা প্রথম এবং মেদিনীপুর জেলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া ও বগুড়া এই চারিটি জেলার মোট আয়তন মেদিনীপুর জেলার আয়তনের প্রায় সমান।

মহকুমা ও থানা বিভাগ।

রাজ্যশাসন ও রাজস্ব সম্পর্কীয় নানাপ্রকার কার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলাকে মেদিনীপুর-সদর, কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল নামে চারিটি উপবিভাগ বা মহকুমায় এবং নিম্নলিখিত ২৬টি থানায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

* ১৯১১ খৃঃ অব্দের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে এই সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার জরিপ, জমাবন্দি হইবার পর ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখা যায়।

সদর মহকুমাঃ—(১) মেদিনীপুর, (২) খড়্গপুর, (৩) নারায়ণ-গড়, (৪) দাঁতন, (৫) গোপীবল্লভপুর, (৬) ঝাড়গ্রাম, (৭) বিনপুর, (৮) গড়বেতা, (৯) শালবনি, (১০) কেশপুর, (১১) ডেবরা, (১২) সবঙ্গ।

কাঁথি মহকুমাঃ—(১) কাঁথি, (২) খাজুরী, (৩) রামনগর, (৪) এগরা, (৫) পটাশপুর, (৬) ভগবান্‌পুর।

তমলুক মহকুমাঃ—(১) তমলুক, (২) মহিষাদল, (৩) নন্দিগ্রাম, (৪) সুতাহাটা, (৫) পাঁশকুড়া।

ঘাটাল মহকুমাঃ—(১) ঘাটাল, (২) চন্দ্রকোণা, (৩) দাসপুর।

পুলিশ-ষ্টেশন।

পূর্ব্বোক্ত ২৬টি থানা ব্যতীত এই জেলার (নারায়ণগড় থানায়) কেশিয়াড়ী, (দাঁতন থানায়) মোহনপুর, (সবঙ্গ থানায়) পিঙ্গলা, (গোপীবল্লভপুর থানায়) নয়াগ্রাম, (কাঁথি থানায়) বাহিরী ও বাসুদেবপুর, (ভগবান্‌পুর থানায়) হেঁড়িয়া, (তমলুক থানায়) ময়না, (মহিষাদল থানায়) গেঁওখালী, এবং (চন্দ্রকোণা থানায়) রামজীবনপুর এই দশটি স্থানে দশটি পুলিশ-ষ্টেশন আছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর ষ্টেশনেও একটি পুলিশ-ষ্টেশন আছে।

সদর মহকুমা।

মেদিনীপুর সদর মহকুমার পরিমাণ ফল ৩,২৭০ বর্গ-মাইল। ইহা সাধারণতঃ জঙ্গল-মহাল ও বিলাত-মহাল নামে দুই ভাগে বিভক্ত। বিনপুর, গড়বেতা, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ও গোপী-বল্লভপুর, প্রধানতঃ এই পাঁচটি থানা জঙ্গলমহালের অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ফল ১,৮২৭ বর্গ-মাইল। অবশিষ্ট সাতটি থানা বিলাত-মহাল। জঙ্গল-মহালের সর্ব্বত্র যদিও এক্ষণে জঙ্গল নাই,তথাপি এখনও উহার স্থানে স্থানে নিবিড় শাল-জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহালে গালা, মধু, ধুনা, তসরগুটী, পশুচর্ম্ম, হরিনের শিং, নানাপ্রকার জন্তুর হাড়, পাখীর পালক ইত্যাদি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর সদর মহকুমার বিলাত-মহাল জঙ্গলশূন্য, সমস্তই কৃষ্ট ভূমি।

মেদিনীপুর সহর।

মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগরের নাম মেদিনীপুর। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ইহা কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২° ২৫´ ২৩´´, উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ২১´ ৪৫´´ পূর্ব্ব। মেদিনীপুর নগরীর সীমা-বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রচলিত আছে।—

"আবসবাটী যৎ উত্তরস্থাম্
গোপশ্চ যৎ পশ্চিমদিগ্বিভাগে।
কংসাবতী ধাবতি দক্ষিণে চ
সা মেদিনীনাম পুরী শুভেয়ম্ ॥"

মেদিনীপুর কতদিনের নগর, তাহা এক্ষণে সঠিক জানিবার উপায় নাই। আইন-ই-আক্‌বরীতে জলেশ্বরের মধ্যে মেদিনীপুর একটি সুবৃহৎ নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের কড়চা হইতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে এই সহরের মধ্য দিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। * ইহার পূর্ব্বের মেদিনীপুর সহরের আর কোন সন্ধান এত দিন পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিখর ভূমির রাজা রামচন্দ্র-কৃত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার এক স্থানে আছে ঃ—

* জয়গোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত গোবিন্দ দাসের কড়চা পৃঃ ২৮-২৯।

"শালি-ধানস্য চোৎপাদ গাণ্ডিচাদেশে প্রজায়তে
কৃষকাণাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্
প্রাণকরাখ্যো নৃপতির্গণ্ডিচাদেশস্য শাসকঃ
মেদিনীকোষকারশ্চ যস্য পুত্রো মহানভূৎ
বিহায় গাণ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ। ৭৫৪"

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ দেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন। এ প্রদেশে প্রাণকর নামে ঐরূপ একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকর কর্ত্তৃক এই মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। মেদিনী-করের প্রণীত মেদিনীকোষ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, ১২০০ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেদিনী-কোষ লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহারই মধ্যে কোন সময়ে মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হয়। *

মেদিনীপুর সহরেই মেদিনীপুর জেলার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টার, পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিভিল সার্জ্জন, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ অবস্থান করেন। মেদিনীপুর সহরে একটি জেলা বোর্ড আফিস এবং একটি সেণ্ট্রাল জেল আছে। এই জেলে সহস্রাধিক কয়েদী রাখিবার স্থান আছে। কয়েদীদের দ্বারা গালিচা, পাপোষ, বিছানার চাদর, বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেদিনীপুর সহরের গেড়েরীরাও উৎকৃষ্ট কম্বল

* মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

প্রস্তুত করিয়া থাকে। গেড়েরীরা ৪।৫ পুরুষ হইল, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এই সহরে বাস করিতেছে। উহাদের নিজেদেরই পালিত মেষ আছে এবং উহা হইতেই তাহারা লোম সংগ্রহ করিয়া থাকে। * মেদিনীপুর সহরের স্বর্ণকারগণও নানা প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার প্রস্তুত করে। আজকাল মেদিনীপুরের চর্ম্মকারগণও উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিতেছে।

খড়্গাপুর।

সদর মহকুমার অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে খড়্গপুর সহরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর সহর এই জেলার প্রধান নগর হইলেও দিন দিন খড়্গপুরের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এক সময় খড়্গপুর শুধু এই জেলার নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিবে। কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে খড়্গপুর একটী সামান্য পল্লী ছিল; বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সংযোগস্থল হওয়ার পর হইতেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। খড়্গাপুর হইতে মেদিনীপুরের দূরত্ব ৫।৬ মাইল মাত্র।

মেদিনীপুর নগরীর দক্ষিণে প্রবাহিত কংসাবতী নদীর পরপার হইতে “জগন্নাথ রাস্তা” নামে পরিচিত যে প্রশস্ত রাজপথটি উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে সেই রাজপথটীর উপরেই খড়্গপুর সহরটী অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে একখণ্ড তরুলতাবিহীন মরুভূমি তুল্য প্রস্তরময় সু-উচ্চ সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড ছিল। লোকে তাহাকে “খড়্গাপুরের দমদমা” বলিত। এই দমদমাটি পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ছিল। ইহার উপর দণ্ডায়মান হইলে ৪।৫

---

* Review of the Industrial Position and Prospects in Benga in 1908. Special Report by Mr. J. G. Cumming I. C. S., p. 13. part II.

মাইলমধ্যে বৃত্তাকারে অবস্থিত জনপদগুলি অতি নিম্নভূমি বলিয়া মনে হইত। খড়্গপুরের এইরূপ স্বাভাবিকী অবস্থা অবলোকন করিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে-কোম্পানী উহার উপরিভাগে তাঁহাদের রেলপথের সংযোগস্থল মনোনীত করিয়াছেন। দমদমা ও তৎসন্নিহিত পাঁচ ছয়-খানি গ্রাম-সংবলিত প্রায় চৌদ্দহাজার বিঘা ভূমির উপর বৃহদায়তন খড়্গাপুর ষ্টেশন ও অন্যান্য কার্য্যালয়াদি সমন্বিত খড়্গপুর সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নানাপ্রকার সুদৃশ্য সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুরুচি-সম্পন্ন মনোহর উদ্যান, তরুরাজি বিরাজিত সুপ্রশস্ত পথ, বৈদ্যুতিক আলোক, জলের কল প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত হইয়া খড়্গাপুর এক্ষণে একটি সুন্দর নগরে পরিণত হইয়াছে। সাহেব, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, পার্শী, শিখ, নাগপুরী, মারহাট্টি, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, বেহারী, আসামী প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানাজাতিয় নানাধর্ম্মাবলম্বী জনগণদ্বারা সমাকীর্ণ হওয়ায় ইহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। খড়্গাপুরের জল-বায়ুও বিশেষ স্বাস্থ্যকর। খড়্গপুর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রধান ষ্টেশন। রেলওয়ে-কোম্পানী এইখানে প্রায় দুই শত বিঘা জমীর উপরে একটি বৈদ্যুতিক গৃহ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ঐ কারখানায় কোম্পানীর যাবতীয় কার্য্যই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। খড়্গপুরে কোম্পানীর একটি প্রথম শ্রেণীর দাতব্য চিকিৎসালয় ও দুইটি সুপরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ী।

সদর মহকুমার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর এবং নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত কেশিয়াড়ি ও গগনেশ্বর গ্রাম এক সময় তসর-কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাদা, নীল, পীত, বেগুনে, ময়ূরকণ্ঠী প্রভৃতি নানা রঙ্গের নানাপ্রকার ধুতি, শাড়ী এই সকল স্থানে প্রস্তুত হইয়া দেশ বিদেশে

বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। সম্প্রতি বিশ পঁচিশ বৎসর হইল, এই ব্যাবসা এ জেলা হইতে এক প্রকার উঠিয়া যাইতেই বসিয়াছে। কলে প্রস্তুত বিলাতী সিল্কের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারাই এই ব্যাবসা-লোপের প্রধান কারণ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কেশিয়াড়িতে অন্যূন আট নয় শত ঘর তাঁতির বাস ছিল। এক্ষণে পঞ্চাশ ঘরও আছে কি না সন্দেহ। আনন্দপুরও এক সময় বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া অভিহিত হইত। আয়তনে ইহা মেদিনীপুর সহর অপেক্ষাও বড় ছিল। অনেক ধনী মহাজন এই স্থানে বাস করিতেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের চুয়াড়-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই গ্রামটি দুইবার লুণ্ঠন করিয়া পোড়াইয়া দিয়াছিল।

লোয়াদা।

ডেবরা থানার অন্তর্গত লোয়াদা গ্রামে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে অনেকগুলি মিছরীর কারখানা ছিল এবং এই স্থানে অনেক সঙ্গতিপন্ন মহাজনও বাস করিতেন। লোয়াদার মিছরী অনেক স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, এতদঞ্চলে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় গ্রামবাসী ও ব্যাবসায়িগণ অধিকাংশই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কারণে ব্যাবসাটিও দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোয়াদার সুবৃহৎ অট্টালিকা ও রাস্তাঘাট ক্রমশঃ জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে।

সবঙ্গ।

সবঙ্গ থানার অনেক স্থানে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট মাদুর প্রস্তুত হয়। বৎসরে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ জোড়া মাদুর এই জেলায় প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। সবঙ্গ থানার মধ্যে চারি পাঁচটি মাদুরের হাট আছে; প্রতি হাটবারে প্রত্যেক হাট হইতেই দেড় হাজার দুই হাজার টাকার

মাদুর বিক্রয় হয়। মহাজনগণ ঐ সকল স্থান হইতে মাদুর কিনিয়া লইয়া কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে বিক্রয় করে। *

সদর মহকুমার অন্তর্গত গড়বেতা ও দাঁতনে দুইটি মুন্‌সেফী চৌকী ও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। নারায়ণগড়ে ও সবঙ্গ থানার অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামেও এক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। খড়্গপুর থানার অন্তর্গত জক্‌পুর ও মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রামে, সবঙ্গ থানার পিঙ্গলা, রাজবল্লভ ও গোবর্দ্ধনপুর গ্রামে, দাঁতন থানার আগর-আড়া ও নারায়ণচক প্রভৃতি গ্রামে এবং নারায়নগড়, কেশপুর ও ডেবরা থানার স্থানে স্থানে অনেক কায়স্থ ও সৎ ব্রাহ্মণের বাস আছে। জঙ্গল মহালের অন্তর্গত ঝাড়গ্রাম, গিডনী, দহিজুড়ী, শিলদা প্রভৃতি স্থানের জল বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আজকাল অনেকে এই সকল স্থানে আসিয়া থাকেন।

সদর মহকুমার অন্যান্য স্থান।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কাঁথি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশর মহকুমাগুলির মধ্যে কাঁথি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীরামপুর মহকুমার পরেই কাঁথি মহকুমার নাম করা হইয়া থাকে। কাঁথি মহকুমার পরিমান ফল ৮৪৯ বর্গমাইল। আয়তনে ইহা হাওড়া জেলার দ্বিগুণ। কাঁথি মহকুমার মধ্যে একটি সুউচ্চ বালুকাস্তূপ-শ্রেণী আছে। কাঁথি মহকুমার প্রধান নগর কাঁথি ধবল-শিখরমালা শোভিত এই বালুকাস্তূপের উপর অবস্থিত। এই বালুকাস্তূপ-শ্রেণী পূর্ব্বদিকে রসুলপুর নদীর মোহানা হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিম দিকে সুবর্ণরেখা নদীর মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত

কাঁথি মহকুমা।

* Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908, part II. p. 17.

রহিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬ মাইল এবং প্রস্থে কোথাও এক, কোথাও অর্দ্ধ মাইলের কমও দেখা যায়। আর কিছু উচ্চ হইলে এই বালুকাস্তূপকে বালুর পাহাড় বলা যাইত। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই বালুয়াড়ীর গঠন সম্বন্ধে অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর এক ভীষণ বন্যায় যেরূপে উড়িষ্যার চিল্কা উপসাগরের একপার্শ্বে এক সুবিস্তৃত বালুকাময় ভূমিখণ্ড গঠিত হইয়া চিল্কা উপসাগরকে চিল্কা হ্রদে পরিণত করিয়াছে এই বালুয়াড়ীও সেইরূপে সেই একই কারণে একই সময়ে গঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাননীয় বেলি সাহেবও (H. V. Bayley) এই মতাবলম্বী *

কাঁথি সহর।

কাঁথি সহরেই কাঁথি মহকুমার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও গবর্ণমেণ্টের খাস-মহাল অফিসাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাঁথিতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান করেন, কাঁথির নিকট বালুয়াড়ী বা বালুর কাঁথ আছে বলিয়া এই স্থানের নাম কাঁথি হইয়াছে। † ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ভ্যালেণ্টিনের মানচিত্রে যে স্থান কেন্দুয়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে পণ্ডিতগণ ঐ স্থানকেই কাঁথি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ‡ কাঁথি সহরে সুলভ মূল্যে সাধারণ গৃহস্থের

---

* "The innundation which is mentioned in Starling's Orissa to have caused the formation of the Chilka Lake and to have occurred in the 3rd century of our era is supposed to have reached this part of the country and formed this range and others to the west in the direction of Midnapore."

Selections from the Records of the Board of Revenue L. P.—Report on the Settlement of the Jallamutha Estates in the District of Midnapore p. 89.

† প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭—"গ্রামের নাম।"

‡ W. Hedge's Diary Vol. II. p. 131.

Blochman's Notes in Hunter's St. Account Vol. I. p. 377.

উপযোগী এক প্রকার বেতের চেয়ার প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা দীর্ঘ-কালস্থায়ী এবং দেখিতেও সুন্দর।

কাঁথি মহকুমার সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান-সমূহ।

কাঁথি থানার অন্তর্গত জুনপুট,দৌলৎপুর ও দরিয়াপুর এবং রামনগর থানার অন্তর্গত চাঁদপুর, বীরকুল, দীঘা প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলির জল-বায়ু যেরূপ স্বাস্থ্যকর, ঐ সকল স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যও সেইরূপ মনোরম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন দার্জ্জিলিং অনাবিষ্কৃত ও শিমলা-শৈল দুরধিগম্য ছিল, তখন রাজ্যসংস্থাপনের ও দেশব্যাপী অশান্তি নিবারণের চিন্তায় কাতর হইয়া ভারতের [illegible] ইংরাজগণ সময় সময় বিশ্রামলাভের জন্য এই সকল স্থানে আসিতেন। বীরকুল প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের গ্রীষ্মাবাস ছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের অনেক কাগজপত্রেই বীরকুলের উল্লেখ আছে। *

---

* Sydney Grier in the "Letters of Warren Hastings to his wife" :—"Beercool was the sanatorium—the Brighton—of Calcutta, and the newspapers and Council records mention constantly that So-and-So is 'gone to Beercool for his health.' Coursing, deer-stalking, hunting and fishing are mentioned as being obtainable in the neighbourhood, and in May of this year (1781) the "Bengal Gazette" gives publicity to a scheme for developing the place quite in the modern style. It has already the advantage of a beach which provides perhaps the best-road in the world for carriages and is totally free from all noxious animals except crabs, and there is a proposal to erect convenient appartments for the reception of nobility and gentry and organise entertainments." The scheme appears to have been partially carried out, for in 1796 Charles Chapman wrote :—"We passed part of the last Hot season at Beercool, to which place I believe you and Messrs. Hastings

ওয়ারেন হেষ্টিংস যে বাংলোতে বাস করিতেন, উহা বহুদিন হইল, বঙ্গোপসাগরের গর্ভসাৎ হইয়াছে। রামনগর থানার অন্তর্গত দীঘা গ্রামে এক্ষণে একটি ডাক-বাংলো আছে। রাজপুরুষগণ ঐ অঞ্চলে গেলে এক্ষণে সেই বাংলোতে বাস করিয়া থাকেন। জুনপুট ও দৌলতপুর গ্রামেও এক-একটি ডাক-বাংলো আছে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী ঐ সকল স্থানে মেলা বসে; সেই সময় সমুদ্রস্নান উপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের কথা আছে। সাহিত্য-সম্রাটের অমর লেখনী-সংস্পর্শে দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের নাম চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কাঁথি মহকুমার অন্যান্য স্থান।

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত পটাশপুর, ভগবান্‌পুর, খাজুরী (জনকা) ও রামনগরে এক-একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। কাজলাগড়ে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের প্রতিষ্ঠিত একটি চিকিৎসালয়ও বিদ্যমান। ভগবানপুরে এবং খাজুরী থানার অন্তর্গত কলাগেছিয়া গ্রামে গভর্ণমেণ্টের এক একটি খাস-মহাল কাছারী আছে। পটাশপুর ও রামনগর থানার অনেক স্থানে আজকাল উৎকৃষ্ট সূতার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। রামনগর থানার অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামে পিতলের সুদৃশ্য ঘটী ও অন্যান্য

---

once projected an Excursion. The Terrace of the Bunglow intended for you, is still pointed out by the People, but that is all that remains of it. The Beach is certainly the finest in the World and the Air such as to preclude any Inconvenience being felt from the Heat. Mrs. Chapman found the Bathing agree with her so well, that, if here and alive next year, we shall make another Trip" —District Gazetteer—p. 169.

নানাপ্রকার তৈজস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভগবানপুর থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে উৎকৃষ্ট সুদৃশ্য পাল্কী ও কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগরা থানার অন্তর্গত বালিঘাই গ্রামের বাজার এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত গোনাড়া গ্রামের মঙ্গলামাড় হাট এতদঞ্চলের মধ্যে বিখ্যাত। এগরা (নেগুঁয়া) গ্রামেই প্রথমে কাঁথি মহকুমার কার্য্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে ঐ স্থান হইতে কাঁথিতে উঠিয়া যায়। পটাশপুর থানার অন্তর্গত গোনাড়া, ব্রজলালপুর, পড়িহারপুর, ধুসুর্দ্ধা প্রভৃতি গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস আছে।

তমলুক মহকুমা।

তমলুক* মহকুমা মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে এবং কাঁথি মহকুমার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই মহকুমাটি গঠিত হয়। ইহার পরিমাণ-ফল ৬৫৩ বর্গ মাইল। তমলুকে আজকাল বালতি ও ষ্টীলের ট্রাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে। এক সময় এই মহকুমায় রেশম-ব্যবসায়ের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশী সিল্কের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে না পারায় এক্ষণে সে ব্যবসা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অনেক মহাজনই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; কেহ কেহ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অধিক কি, ওয়াট্‌সন কোম্পানীর মত ধনী মহাজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এ অঞ্চল হইতে ব্যবসা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। মধ্যে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীও সামান্যভাবে কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নীলের ব্যবসাও এক সময়ে এ অঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাও এক্ষণে সমূলে বিলুপ্ত।

* "Indigo, mulbery and silk the costly products of Bengal and

এই মহকুমার প্রধান নগর তমলুক রূপনারায়ণ নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। ইহার অক্ষাংশ ২২° ১৭´ ৫০´´ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ৫৭´ ৩০´´ পূর্ব্ব। এই মহকুমার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রভৃতি ও দাতব্য চিকিৎসালয় তমলুক সহরেই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে এই মহকুমার অন্তর্গত মছলন্দপুর গ্রামে একটি মুন্সেফী আদালত ছিল, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উহা নিকাশী গ্রামে উঠিয়া যায়। পরে আবার উহা তথা হইতে তমলুকে পুনরানীত হইয়াছে। এই মহকুমার অন্তর্গত প্রতাপপুর গ্রামেও একটি মুন্সেফী আদালত ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

তমলুক সহর।

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল গ্রামের নাম উল্লেখ যোগ্য। মহিষাদলে তত্রত্য রাজার গড়বাড়ী, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু দেব-দেবীর মন্দির, সুবৃহৎ সরোবরাদি এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তমলুক মহকুমার অন্তর্গত গেঁওখালী ও নন্দীগ্রামেও এক-একটি দাতব্য চিকিৎসালয় বিদ্যমান। এই অঞ্চলে পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, গেঁওখালী, হরিখালী, তেরপেখিয়া ও কুঁকড়াহাটীর বাজার প্রসিদ্ধ। এই কয়টী বাজার হইতেই ঐ অঞ্চলে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। কুঁকড়াহাটীতে গভর্ণমেণ্টের একটি খাসমহাল কাছারী আছে। তমলুক মহকুমার স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট মাদুর ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। তমলুকের মশারির থান প্রসিদ্ধ। এই মহকুমার অন্তর্গত কেলোমাল,

তমলুক মহকুমার অন্যান্য স্থান।

Orissa form the traditional articles of export from ancient Tamluk."

Hunter's Orissa Vol. I. p. 313.

মধ্যহিংলী, পুলসিটা প্রভৃতি গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস আছে। তমলুক মহকুমার অনেক স্থলে অনেক সংখ্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরও বাস দৃষ্ট হয়।

ঘাটাল মহকুমা।

ঘাটাল মহকুমা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে এই মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এই মহকুমার কার্য্যালয়াদি গড়বেতায় প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা 'গড়বেতা মহকুমা' নামে অভিহিত হইত। পরে হুগলী জেলা হইতে চন্দ্রকোণা পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে, ঘাটাল সহর এই মহকুমার প্রধান সহর বলিয়া গণ্য হয় এবং গড়বেতা মহকুমার পরিবর্ত্তে এই মহকুমা 'ঘাটাল মহকুমা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঘাটাল মহকুমার পরিমাণ-ফল ৩৭২ বর্গ-মাইল। ঘাটাল নগর শিলাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। ঘাটালের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যালয়াদি এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টার ছিলেন, সেই সময় ঘাটালের ফৌজদারী কার্য্যালয় একবার কিছু দিনের জন্য গড়বেতায় উঠিয়া গিয়াছিল। (১৮৯২) ঘাটালেও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

ঘাটাল মহকুমার শিল্পাদি।

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, রাধানগর প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ী, চাদর ও ছিট-কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে বহুসংখ্যক তাঁতির বাস আছে। পূর্ব্বে তাহারা সকলেই কাপড় প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের প্রস্তুত কাপড় ভারতের বহুস্থানে নীত হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত; * কিন্তু পরবর্ত্তিকালে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী

* District Gazetteer p. 126.

কাপড়ের আমদানী হওয়ায় দেশীয় কাপড় প্রতিযোগিতায় বিলাতী কাপড়ের সমকক্ষ হইতে না পারাতে ঐ সকল তাঁতির অধিকাংশই এক্ষণে জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখনও ঐ সকল স্থানের প্রস্তুত কাপড় অনেক স্থানেই প্রেরিত হইয়া থাকে।

ঘাটাল মহকুমার নানা স্থানে রেশমের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হয়। প্রতি বৎসর ঐ সকল স্থান হইতে অন্যূন ২০,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। * চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ঘাটাল ও খড়ারের কাঁসা ও পিত্তলের বাসন প্রসিদ্ধ। মাননীয় কামিং (Hon. Mr. J. G Cumming C. S. I., C. I. E., I. C. S.) সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে যে সকল স্থলে কাঁসা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যবসাটি বিশেষ শৃঙ্খলা ও সুপ্রণালীর সহিত পরিচালিত হইতেছে। এই স্থানের ব্যবসায়িগণ বিশেষ সঙ্গতিপন্ন; তাঁহারা ষ্টেট সেটেলমেণ্ট, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে টীন,তামা ইত্যাদি ধাতু সম্ভবমত সুলভ দরে প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া আনিতে পারেন বলিয়া এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ব্যবসাটিও বিশেষ নিপুণতার সহিত চালাইতেছেন। এক এক জন ব্যবসায়ীর কারখানায় শতাধিক ব্যক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। খড়ার সহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নয় হাজার; তন্মধ্যে প্রায় চারি হাজার লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। † কামিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, খড়ার কাঁসার থালা

* Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908 part II. p. 14.

† Industrial Position and Prospects in Bengal p. 25.

ও ঘাট্টাল গাড়ুর জন্য বিখ্যাত। ঘাটাল মহকুমায় নানাপ্রকার মাটীর হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদিও প্রস্তুত হয় এবং বিক্রয়ের জন্য নানা স্থানেও প্রেরিত হইয়া থাকে। * চন্দ্রকোণার মট্‌কী ঘৃত এ দেশে প্রসিদ্ধ।

ক্ষীরপাই, বীরসিংহ ও অন্যান্য গ্রাম।

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই সহরে পূর্ব্বে একটি মহকুমার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে এ জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, ঘাটাল প্রভৃতি স্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। ঐ অংশ ও বর্ত্তমান হুগলী জেলার কিয়দংশ লইয়াই ক্ষীরপাই মহকুমা গঠিত হয়। পরে ক্ষীর-পাই হইতে মহকুমার কার্য্যালয় জাহানাবাদে উঠিয়া যায়। জাহানাবাদ মহকুমা অধুনা আরামবাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা এক্ষণে হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, খড়ার, রামজীবনপুর এবং ইড়পালা গ্রামে এক-একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

ঘাটাল মহকুমার অনেক গ্রামে উচ্চ-শিক্ষিত বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। এই মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা গ্রামে ভারত-গৌরব লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিবাস ছিল। পরে তাঁহারা ঐ স্থান হইতে উঠিয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাইপুর গ্রামে বাস করেন। অদ্যাপি চন্দ্রকোণায় সিংহবংশের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী প্রভৃতির নিদর্শন আছে। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অতুল সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই আজ মেদিনীপুর সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি উচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ

* Industrial Position and Prospects in Bengal p. 14.

হইয়াছে। বীরসিংহ গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি বিদ্যমান আছে। বঙ্গবাসী সেদিন মহাসমারোহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এইবার তাঁহারা বীরসিংহের এই সিংহ-শিশুটির জন্মভূমিতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটা কিছু স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন নাকি ?

পরগণাবিভাগ।

পরগণাগুলির উৎপত্তির ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে দিয়াছি। মেদিনীপুর জেলায় এক্ষণে ১১৫টী পরগণা আছে। সেগুলির নাম ও বিগত ১৮৭২—৭৮ খৃঃ অব্দের রেভিনিউ সার্ভের সময় উহাদের পরিমাণ-ফল (বর্গ মাইল) যেরূপ নিরূপিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত কয়িয়া দেওয়া হইল ঃ—

(১) অমর্শী ৪০'৯৫ (২) আমিরাবাদ ৩'৫৫ (৩) অরঙ্গানগর ১৮'৬৯ (৪) বাহাদুরপুর ৮৫'৬১ (৫) বাহিরীমুঠা ৪৬'০৫ (৬) বজ্জরপুর ৬'১০ (৭) বলরামপুর ৫৯'৭০ (৮) বালিজোড়া ১৩'৭৩ (৯) বালিসিতা ৫'৮৫ (১০) বালিসাই ১১.৮৯ (১১) বরদা ৫৯'১৫ (১২) বোড়ইচোর ২২'৩২ (১৩) বারাজিত ৬'৪৩ (১৪) বাটীটাকী ১১'৪৫ (১৫) [illegible]বাজার ১.০০ (১৬) বেলাবেড়্যা ২০'৬০ (১৭) ভাইটগড় ২'০৬ (১৮) ভোগরাই ১৯'[illegible] (১৯) ভুঁয়ামুঠা ১৬'০৫ (২০) ভূরশুট ১'৭৪ (২১) বীরকুল ২৭'২৮ (২২) বিশওয়ান ৩৮'৩০ (২৩) বগড়ী ৪৪৫'৮৩ (২৪) ব্রাহ্মণভূম ৯৩'৬৬ (২৫) চন্দ্রকোণা ১২৪.০৪ (২৬) চিতুয়া ১০৪.১৯ (২৭) চিয়াড়া ৩৩'৮৩ (২৮) দক্ষিণমাল ৪'৫৪ (২৯) দাঁতনচোর ৪০.৩০ (৩০) দণ্টখড়ই ৪'১২ (৩১) দত্তমুঠা ১৬'৯১ (৩২) ধারেন্দা ৩৬.১৬ (৩৩) ঢেকিয়াবাজার ২৫'৫৩ (৩৪) দিগপারই ২৯'৩৫ (৩৫)

দ্বিপাকিয়ারচাঁদ ৩৩'৪৫ (৩৬) দোরো ভুবনান ৭১ ৩০ (৩৭) এগরা-চোর ৩৩'৪৭ (৩৮) ইড়িঞ্চি ৬৯'২৬ (৩৯) গগনেশ্বর বা বাগভূম ৪৫'১৪ (৪০) গাগনাপুর ৩০'৯৬ (৪১) গওমেশ ১'৪২ (৪২) গুমাই ১৩'৪৯ (৪৩) গুমগড় ৯৯'৭৯ (৪৪) হাভেলীজলেশ্বর ০'৮২ (৪৫) কশবা হিজলী ১৮'৫০ (৪৬) চক ইসমাইলপুর ১৬'৮১ (৪৭) জলামুঠা ৫২'১৭ (৪৮) জামবনী ১০৩'৯৬ (৪৯) জামিরাপাল ৮'৯১ (৫০) জামনা তপ্পা ৩'০৪ (৫১) জাহানাবাদ ৩ ৯৭ (৫২) ঝাড়গ্রাম ১৭৫' ২৬ (৫৩) ঝাটীবনী বা শিলদা ২৪৩'৮৩ (৫৪) জুলকাপুর ৫ ৬৮ (৫৫) কালরুইতপ্পা ২'৫৯ (৫৬) কালিন্দিবালিসাই ৩২'৩৫ (৫৭) কাকরাজিত ৪'১৪ (৫৮) কাকরাচোর ২'১২ (৫৯) কাশীজোড়া ১১৯'০৪ (৬০) কাশীজোড়া কিসমৎ ০'৪৭ (৬১) কাশিমনগর ৬'৫৬ (৬২) কেদারকুণ্ড ৪৭'০৪ (৬৩) কেশিয়াড়ী ৮'০৯ (৬৪) কেশিয়াড়ী কিসমৎ ০'৪৭ (৬৫) খালিসা ভোগরাই ০'৮৫ (৬৬) খান্দার ১৪৭'৫২ (৬৭) খড়্গপুর ৪৩'৬৬ (৬৮) খড়্গপুর কিসমৎ ৪'১২ (৬৯) খটনগর ৬৭'৮২ (৭০) খেলাড় নয়াগ্রাম ১৮৮'৯৪ (৭১) কুড়ুলচোর ৪৩'৫৬ (৭২) কুতবপুর ৪৫'০৩ (৭৩) লাটশাল ২'৭০ (৭৪) মাজনামুঠা ৮৩'৫৯ (৭৫) মল্লভূম বা ঘাটশিলা ১৩'৪৪ (৭৬) মণ্ডলঘাট ৩৬'২১ (৭৭) খারিজা মণ্ডলঘাট ১১'৯২ (৭৮) মনোহরগড় ৩'৮৩ (৭৯) মাৎকদাবাদ ৩'১৯ (৮০) মাৎকন্দপুর বা কল্যাণপুর ৩৯'৮৮ (৮১) ময়নাচোর ৭৫' ৫৭ (৮২) মেদিনীপুর ৩৭১ ৫৩ (৮৩) মিরগোদা ২২'২৬ (৮৪) মহিষাদল ৬২'৯৯ (৮৫) নাড়াজোল ১১'৯৬ (৮৬) মেদিনীপুর কিসমৎ ১৫'২০ (৮৭) নারাঙ্গাচোর ১৪'০২ (৮৮) নারায়ণগড় ১৫'৬৮ (৮৯) নারায়ণগড় কিসমৎ ৮'৪৪ (৯০) নাড়ুয়ামুঠা ৫৫'৭৬ (৯১) কেওড়া-মাল নয়াবাদ ৪'৪৭ (৯২) মাজনা নয়াবাদ ০'৫১ (৯৩) নয়াবসান

১৫১.৫৬ (৯৪) পাহাড়পুর ২৩.৩২ (৯৫) পটাশপুর ৬৩.৫৩ (৯৬) পটাশপুর কিসমৎ ১০.৫৩ (৯৭) প্রতাপভান ১৫.৫২ (৯৮) পুরুষোত্তমপুর ১৩.৬৬ (৯৯) রাজগড় ১৭.৯০ (১০০) রামগড় ৪৮.৭৩ (১০১) রোহিনী মৌভাণ্ডার ৪২.২১ (১০২) সবঙ্গ ৮৫.৬৩ (১০৩) সাহাপুর ৫৭.৫০ (১০৪) সাহাপুর কিসমৎ ২.১৫ (১০৫) সেক পাটনা ০.৪০ (১০৬) সাঁকাকুল্যা বা লালগড় ৫২.৫৩ (১০৭) সরিফাবাদ ২.২২ (১০৮) শীপুর ৬৫.০৫ (১০৯) শীপুর কিসমৎ ২.৭০ (১১০) সুজামুঠা ৪৫.২৭ (১১১) তমলুক ৯৯.৭৭ (১১২) তেরপাড়া ৯.৪৯ (১১৩) তুরকাচোর ৪৪.৪৯ (১১৪) উত্তর বিহার ২৫.০০ (১১৫) ওলমারা (ময়ূরভঞ্জের রাজ্যভুক্ত গড়জাত মহাল) ১২.০৯।

বিগত ১৯১১খৃঃ অব্দের আদম সুমারীর সময় এই জেলায় ১১,৩১৬টি গ্রাম ও নিম্নলিখিত ৮টি মিউনিসিপ্যাল সহর ছিল।—(১) মেদিনীপুর (২) খড়্গপুর, (৩) ঘাটাল, (৪) খড়ার, (৫) রামজীবনপুর, (৬) চন্দ্রকোণা, (৭) তমলুক, (৮) ক্ষীরপাই। এই আটটি সহরের মধ্যে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটী সর্ব্ব-পুরাতন, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে এই মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা, ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর এবং ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে খড়ার মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হইয়াছে। খড়্গপুর সহর বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ প্রস্তুত হইবার পর অল্পদিন হইল স্থাপিত। কাঁথিতে মিউনিসিপ্যালিটী নাই।

গ্রাম ও নগর।

বর্গভীমার মন্দির—তমলুক

ঐতিহাসিক-বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন কাল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই পূর্ব্বতন ইতিহাস সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের; অতএব বলা বাহুল্য যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন ইতিহাসও তিমিরাবরণের অন্তরালে অবস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মেদিনীপুর জেলার অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা অসম্ভব। বঙ্গদেশ পলিমাটীর দেশ; ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা বয়সে নবীন। তবে ইহার উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির ভূমি অতি প্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশের কিয়দংশও পূর্ব্বোক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশের বিনপুর থানার অন্তর্গত, ঝাটিবনী বা শিলদা পরগণার তামাজুড়ী গ্রামের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে একখানি তাম্রনির্ম্মিত কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগে উহার একখানি ছবি দিয়াছেন।

কুঠারখানি ৭·˝১০ইঞ্চি দীর্ঘ, ৬·˝৪০ ইঞ্চি প্রস্থ, এবং ০·˝৬৩ ইঞ্চি পুরু ; ওজনে প্রায় দুই সের। * বাঙ্গালার অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশের স্থানে স্থানেও তাম্রনির্ম্মিত নানাপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই সকল অস্ত্র 'তাম্রের যুগের' নিদর্শন। তাঁহারা প্রাগৈতিহাসিক যুগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;—প্রস্তরের যুগ (Stone Age), তাম্রের যুগ (Copper Age) ও লৌহের যুগ (Iron Age)। তাঁহারা বলেন, তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রসমূহ মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীন ধাতব অস্ত্র। ইহার পূর্ব্বে আদিম মানব ধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। তাঁহারা তৎকালে প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। এই কারণে পণ্ডিতগণ ধাতব অস্ত্র-নির্ম্মাণকাল পর্য্যন্ত সময়ের নাম 'প্রস্তরের যুগ' দিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে ধাতু আবিষ্কৃত হইলে মানবগণ শিলানির্ম্মিত আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। † বোধ হয়, তাম্রের বহু পরে লৌহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; সেই কারণে বহুকাল যাবৎ এতদ্দেশে তাম্রের ব্যবহার ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ চারি সহস্র হইতে দুই সহস্র খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন বাবিরুষ (Babylon) দেশে তাম্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্ত্তিকালে আর্য্য-বিজয়ের পর হইতে বাবিরুষ, মিশর (Egypt) প্রভৃতি প্রাচীন দেশ-সমূহে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে তাঁহারা অনুমান করেন, আর্য্য-বিজয়ের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ তাম্রের ব্যবহার

* Catalogue and Hand Book of the Archælogical Collections in the Indian Museum part II p. 485.

† বাঙ্গালার ইতিহাসে—১ম ভাগ—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১০—১১।

উঠিয়া যায়। * কিন্তু এক্ষণে সেই সকল যুগের সীমা-নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানব-জাতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়াতে কোন্ সময়ে কোন্ দেশের যুগ-বিপ্লবের ফলে যে সেই সেই দেশবাসীকে প্রস্তরখণ্ডের পরিবর্ত্তে ধাতুখণ্ডের অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং মেদিনীপুর জেলায় প্রাপ্ত তাম্রনির্ম্মিত কুঠারফলকখানি বা বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে যে সকল প্রস্তর বা তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি যে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানব-সভ্যতার নিদর্শন, তাহা বলিবার উপায় নাই!

বৈদিক যুগ।

পুরাতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, বৈদিক যুগে বাঙ্গালা দেশে আর্য্য-জাতির বসতি ছিল না। বেদের সংহিতা-ভাগে বঙ্গাদি দেশের নাম নাই। অথর্ব্ববেদে মগধের 'বগধ' এবং ঋক্-সংহিতায় 'কীকট' নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায় বৈদিক কালের পর অঙ্গাদি দেশে আর্য্য-জাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে আর্য্য সভ্যতা পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্মাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। সে কত কালের কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; পুরাণে অঙ্গ রাজ-গণের পরিচয় আছে, কিন্তু পুণ্ড্র বঙ্গাদিদেশের রাজ-বংস বা রাজ-গণের বিশেষ কোন কথা নাই। ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গনাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগ-ধাশ্চের পাদান্যান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।—২।১।১

ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, বগধ ও চেরদেশবাসিগণকে আর্য্যগণ পক্ষীবৎ জ্ঞান করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্-পণ্ডিত-

* বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম ভাগ—পৃঃ ১৩—১৫।

গণ অনুমান করেন যে, ঐতরেয় আরণ্যকে আর্য্যগণ যাহাদিগকে পক্ষীজাতিয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাঁহারা দ্রবিড় জাতিয় ছিলেন। * তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দ্রবিড় জাতির প্রাচীন আবাস ভূমি; তাঁহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে তাঁহারা খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাবিরুষ অধিকার করিয়া বাবিরুষ ও অসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। †

প্রাচীন দ্রবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হ'ন, তখন তাঁহারা বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, এক সময়ে বঙ্গে এই দ্রবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং এই মেদীনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান তমলুক নগর তাঁহাদের একটী প্রধান নগর ছিল। ‡ তিনি লিখিয়াছেন "তমলুক, বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ নানা দেশে যাইত। ফা-হিয়ান তমলুক হইতেই গিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তম-

* বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম ভাগ—পৃঃ ১৯

† H. R. Hall's The Ancient History of the Near East pp. 171-174

‡ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—মানসী—বৈশাখ—১৩২১।

লুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তামা রপ্তানী হইত তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটী প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এক কালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল ইহা হইতেই তাহা কতক বুঝা যায়। এখনকার Anthropologistsরা স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মঙ্গল ও দ্রবিড় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।" *

"আঠার শত বৎসর পূর্ব্বের তামিল" নামক গ্রন্থেও অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত কনকসভই পিলেও লিখিয়াছেন "Most of the Mongolion tribes emigrated to Southern India from Tamalitti, the great emporium of trade at the mouth of the Ganges and this accounts for the name "Tamils" by which they were collectively known among the most ancient inhabitants of Deccan. The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti." "The Tamra liptas are alluded to, along with the Kosals and Odras as inhabitants of Bengal and adjoining Sea coast in the Vayu and Bishnu Puranas. They were known as Tamils most probably because they had

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—মানসী—বৈশাখ, ১৩২১।

emigrated from Tamalitti (Tamralipti) the great Sea port at the mouth of Ganges."

তাম্রলিপ্তি পালিভাষায় তামলিপ্‌টী রূপ পরিগ্রহ করে। তামিল শব্দও তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। সুপণ্ডিত রাধাকুমোদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "Indian Shipping" নামক তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে কনকসভই পিলে মহাশয়ের মত প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। † ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক পরিচালিত "প্রতিভা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে পিলে মহাশয়ের উক্ত মতের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন "পিলে মহাশয়ের অনুমান যদি ভ্রান্ত না হয় তাহা হইলে এই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, তামলিপ্‌টী হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, তামিলেরা যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সচরাচর ব্যবহার করিত, দাড়ী, নাড়ী, হাঁড়ী, ভুড়ী প্রভৃতি তৎ সমুদয়ের অবশেষ।" ‡ পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন "যেমন বিজয় সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায়।" §

পূর্ব্বোক্ত মনস্বীগণের এই সকল সিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইবার

---

* Tamils Eighteen Hundred Years Ago—pp. 46, 235.

† Indian Shipping, p. 143.

‡ প্রতিভা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

§ পৃথিবীর ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড—পৃঃ ১৬০।

বহুকাল পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তের সভ্যতাই দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরাই দক্ষিণ-ভারতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে গিয়াই তাঁহারা খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুদূর বাবিরুষ ও অসুরে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হল অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁহারা তখন ধাতব অস্ত্র-ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। নানাবিধ শিল্পও তখন তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। *

পরবর্ত্তিকালে আর্য্যগণ দ্রবিড়-জাতীয় অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তাম্রলিপ্তরাজ্যও দ্রবিড়দিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্য্যাধিকারে আইসে।

আর্য্য-অধিকার।

বঙ্গে আর্য্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে দ্রবিড়গণ দেশত্যাগ করিয়া যান নাই; তাঁহাদের অধিকাংশই বিজেতৃগণের ধর্ম্ম, রীতি-নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়া এ দেশেই থাকিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যগণ যে কোন্ সময়ে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; প্রাচীন সাহিত্যে তাহার উল্লেখ নাই। তবে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ অধিকার করিয়া এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে তাঁহাদের যে অনেক সময় লাগিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, প্রাচীনকালে এখনকার মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রথমে কলিঙ্গ-রাজ্যের ও তৎপরে সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৌধায়ন স্মৃতি ও মনুসংহিতায়

* Hall's Ancient History of the Near East, pp. 171-174.

কলিঙ্গ একটি অনার্য্য-নিবাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত-রচনার সময় উহা যজ্ঞীয়-গিরিশোভিত এবং সতত দ্বিজগণসেবিত পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখা যায়, কলিঙ্গের রাজা শ্রুতায়ু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনুসংহিতা বা রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নাম নাই। অনুমান, তখনও তাম্রলিপ্তে দ্রবিড়জাতির প্রাধান্য ছিল—আর্য্যদিগের আধিপত্য তখনও তাম্রলিপ্তে স্থাপিত হয় নাই।

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান শ্রুত হওয়া যায় এবং নানা গ্রন্থে ইহার নানা প্রকার নামও দৃষ্ট হয়। মহাভারতে ইহার নাম 'তাম্রলিপ্ত', ভারতকোষে 'তাম্রলিপ্তী', ত্রিকাণ্ডশেষে 'বেলাকূল', 'তাম্রলিপ্ত', 'তাম্রলিপ্ত' ও 'তমালিকা', হেমচন্দ্র অভিধানে 'দামলিপ্ত', 'তমালিনী' ও 'বিষ্ণুগৃহ', শব্দরত্নাবলীতে 'তমো-লিপ্ত' এবং শব্দকল্পদ্রুমে ইহার 'তমোলিপ্তী' নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে ইহা 'তমোলিতি,' 'তম্মোলিত্তি' প্রভৃতি নামেও পরিচিত। এই সকল নামের অপভ্রংশে পরবর্ত্তিকালে 'তমলুক' নাম হইয়াছে। তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি।

"[illegible]রীভূতো হি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ [illegible] [illegible] ॥ ৫৬
অরুণাখ্যসারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ ॥" ৫৭

আবার কেহ কেহ 'তাম্রলিপ্ত' বা 'তমোলিপ্ত' নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পাপে জড়িত (তমঃ=darkness or sin এবং লিপ্ত=soiled) অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নাম কাহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাম্রলিপ্ত নামের কি অর্থ করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সম্ভবতঃ দামল-জাতির প্রাধান্য ছিল বলিয়া সে সময়ে এই স্থান 'দামলিপ্ত' বা 'দামলিপ্তি' ঐরূপ কোন একটা নামে পরিচিত ছিল। আর্য্যগণ তাঁহাদের সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া দামলিপ্তকে ঘৃণাসূচক 'তমোলিপ্ত' নামে পরিণত করিয়া থাকিবেন। পরে যখন সেই 'তমোলিপ্তে' আবার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিত্র অর্থসূচক নাম তমোলিপ্তেরও পবিত্র অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তাহাতেই লিখিয়াছেন, "বিষ্ণু যখন কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণকে ধ্বংস করেন, সেই সময়ে যুদ্ধশ্রমে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম বিগলিত হইয়া এই স্থানে পতিত হয়। দেবশরীর-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছে।" * এইজন্য ইহার এক নাম 'বিষ্ণুগৃহ'। সম্ভবতঃ এই অসুরগণ সেই দ্রবিড় বা দামল-জাতি এবং তাঁহাদের পরাজয়ের পর হইতেই দামলিপ্তি বা তমোলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজকগণের উচ্চারণের পার্থক্যে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি শব্দই তাঁহাদের গ্রন্থে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে।

মহাভারতের অনেক স্থানেই তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মদেশের নামো-

---

* Hunter's Orissa vol. I. p. 311. তমলুক ইতিহাস, পৃঃ ১১।

ল্লেখ আছে। কুরুপাঞ্চালীয় অনেক ঘটনার সহিত তাম্রলিপ্তাধিপতি সংসৃষ্ট ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য তাম্রলিপ্তাধিপতিও উপস্থিত ছিলেন। সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে ভীমের হস্তে তাম্রলিপ্তেশ্বরের পরাজয়কাহিনী পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত সভাপর্ব্বেই দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞকালে তাম্রলিপ্তাধিপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সুশিক্ষিত পর্ব্বতপ্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দ্রোণপর্ব্বে বীরবর্গ-পরিপূজিত পরশুরামের যুদ্ধবর্ণন উপলক্ষে ও কর্ণপর্ব্বে সঙ্কুল যুদ্ধের প্রসঙ্গে গজযুদ্ধবিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মেকল, তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি বীরগণের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত আছে। অপিচ, ভীষ্মপর্ব্বে অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের পুণ্যদাত্রী নদীসমূহের ও জনপদের নামকীর্ত্তনকালেও সঞ্জয় তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

মহাভারতীয় কাল।

"কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ।
কিরাতবর্ব্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥"

মহাভারতোক্ত বকরাক্ষসের উপাখ্যানের সহিতও মেদিনীপুর জেলার কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমান হয়। মহাভারতে লিখিত আছে, পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহের সময় বিদুর-প্রেরিত যন্ত্রচালিত নৌকাযোগে গঙ্গা উত্তরণ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতঃপর তন্নিকটবর্ত্তী একচক্রানামক গ্রামে কিছুদিন বাস করেন। সেই প্রদেশ বক-নামক এক রাক্ষসের অধিকারভুক্ত ছিল।

বক-রাক্ষসের কাহিনী।

বক প্রতিদিন এক একটি মনুষ্যকে বধ করিয়া আহার করিত। এই রাক্ষসের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হয়; ভীম তাহার পৃষ্ঠদণ্ড ভঙ্গ করিয়া দেন, তাহারই ফলে বকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণায় বক-রাক্ষসের অধিকার ছিল। 'বকডিহি' বা বক-রাক্ষসের স্থান, এই অর্থেই বকডিহির অপভ্রংশে বগড়ী নাম হইয়াছে। ঐ স্থানে কৃষ্ণনগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে; বগড়ী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরায়জীউর মূর্ত্তি ঐ গ্রামেই বিদ্যমান। ঐ গ্রামের অনতিদূরে একচক্রা বা এখনকার একারিয়া গ্রামটি অবস্থিত। পাণ্ডবগণ জননী কুন্তীদেবী সহ এই গ্রামের যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, লোকে অদ্যাপি তাহা দেখাইয়া থাকে। ইহারই প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ভিকনগর নামে আর একটি গ্রাম আছে। কিংবদন্তী আছে, পাণ্ডবগণ এই গ্রাম হইতেই প্রতিদিন তাঁহাদের আহার্য্যদ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। অধিকন্তু বগড়ী পরগণার মধ্যে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতা যাইবার পথে এক্ষণে 'গনগনির ডাঙ্গা' নামক যে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরটি দৃষ্টিগোচর হয়, ঐ স্থানেই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে বকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। এই কিংবদন্তীর পোষকতা করিয়া, ঐ প্রান্তরে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রোথিত অস্থি-তুল্যাকার কতকগুলি সুবৃহৎ পদার্থকে লোকে বক-রাক্ষসের' অস্থিখণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেগুলির সহিত বক-রাক্ষসের বা কোন প্রাণিবিশেষের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই; রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সেগুলি অশ্মীভূত বৃক্ষকাণ্ড (Fossilized wood) ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

এই জনশ্রুতির মূলে কতটুকু ইতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহ

বলা সুকঠিন। বর্ত্তমান বগড়ী পরগণার অধিবাসীদিগের মধ্যে বাগ্‌দী-জাতির সংখ্যাই অধিক। বাগ্‌দীগণ প্রাচীন বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী। মূলে উহারা অনার্য্য-জাতিই ছিল, পরে আর্য্যদিগের সংস্রবে আসিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বকডিহির অধিবাসী বলিয়া উহাদের "বাগ্‌দী" নাম হওয়াই সম্ভব। বক-রাক্ষস হয় ত উহাদেরই রাজা ছিলেন। প্রাচীনকালে অনার্য্য-জাতিদিগকে আর্য্যগণ রাক্ষস, অসুর ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যে এইরূপ রাক্ষস বা অসুরগণের অধিকার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে ঐতরেয় আরণ্যকের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, প্রাচীন ভাষ্যকারগণ ঐ শ্লোকের 'বঙ্গা' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, 'বগধা' অর্থাৎ মগধবাসিগণ এবং 'চেরাপদা' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ এই ত্রিবিধ অনার্য্যজাতিগণকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্গাবগধের রাক্ষস অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্য-টীকাকার আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া এই তিনটি জাতিকে যথাক্রমে পিশাচ, অসুর ও রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল কারণে হয় ত মহাভারতে অনার্য্য-জাতীয় বক রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং সেই রাক্ষস নামের সঙ্গে সঙ্গে নরমাংস-ভোজনের কাহিনীটিও সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিংবা ঠিক বলা যায় না, হয় ত সে সময় বাগ্‌দীদের মধ্যে নরবলি-প্রথাও প্রবর্ত্তিত ছিল। আর্য্যবীর ভীমসেন অনার্য্য-রাজ বককে নিহত করিয়া সে প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া থাকিবেন।

বকডিহির বাগ্‌দী-জাতি।

জৈমিনিভারতে উল্লিখিত একটি ঘটনার সঙ্গেও তাম্রলিপ্তের

সংস্রব ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জৈমিনির আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে, যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার আশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্বের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিলে তাম্রধ্বজের সহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ ঘটে। কৃষ্ণার্জ্জুন পরাজিত হন। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের অশ্ব ও অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুরে আসিয়া পৌঁছিলে পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের পরাজয়-কাহিনী শুনিয়া দুঃখিত হন এবং পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং অর্জ্জুন এক বালকবেশে রত্নপুরে উপস্থিত হইয়া ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক-মাত্র পুত্রকে সিংহে ধরিয়াছে, যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ পুত্রটিকে ফিরাইয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতে সম্মত হইলে, বাসুদেব তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। ময়ূরধ্বজ তাঁহা-দিগকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং ধন, জন, রাজ্যসম্বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। *

তাম্রধ্বজ রাজার কাহিনী।

কাহারও কাহারও মতে, জৈমিনিভারতে উল্লিখিত রত্নপুরই প্রাচীন কালের তাম্রলিপ্ত নগর। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে কিংবা বর্দ্ধমানা-ধিপতির বা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। জৈমিনিভারতে উক্ত ঘটনা নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী রত্নপুর বা রত্ননগরে হইয়া-ছিল বলিয়া লিখিত আছে। নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী বিলাসপুরের উত্তরে রত্নপুর নামে একটি স্থানও আছে। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, উক্ত ঘটনা নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী রত্নপুরেই ঘটিয়াছিল। আবার

* জৈমিনিভারত—৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। বিশ্বকোষ ৬৯০।৬৯১ পৃঃ।

তমলুকের রাজবাটীস্থিত রাজাদের প্রাচীন বংশাবলী-তালিকায় প্রথম রাজার নাম ময়ূরধ্বজ ও তাঁহার পুত্রের নাম তাম্রধ্বজ লিখিত থাকায় এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের যুগলমূর্ত্তি অতি প্রাচীনকাল হইতে তমলুকে বিরাজমান থাকা হেতু উক্ত ঘটনা তমলুকে ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে জল্পনা-কল্পনা করিয়াও আসিতেছে। রত্নাবতী নামে একটি স্থানও পূর্ব্বে তমলুকের অন্তর্গত ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি। * আমরা অনুমান করি, উক্ত ঘটনা নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী রত্নপুরে বা রত্নাবতী নগরেই ঘটিয়াছিল। তাম্রলিপ্তাধিপতি রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুনকে নর্ম্মদাতীরেই পরাজিত করিয়া থাকিবেন, পরে তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের যুগলমূর্ত্তি স্বীয় রাজধানী তাম্রলিপ্ত নগরে প্রতিষ্ঠিত করায় উক্ত ঘটনা তমলুকেই ঘটিয়াছিল বলিয়া লোকে মনে করিয়া লইয়া থাকিবে। মহাভারত হইতে তৎকালীন তাম্রলিপ্তাধিপতির শৌর্য্য-বীর্য্যের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে করিবারও বিশেষ কারণ নাই।

মহাভারতোক্ত এই সকল ঘটনার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতীয় কালে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় আর্য্য ও অনার্য্য উভয়জাতিরই অধিকার ছিল। এই জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে তাম্রলিপ্ত প্রদেশে আর্য্যগণ রাজত্ব করিতেন আর উত্তরপশ্চিমাংশে জঙ্গলময় প্রদেশটিতে অনার্য্যদিগের অধিকার ছিল। সমগ্র জেলাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। অদ্যাপি এই জেলার উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে স্থানে স্থানে শৈলমালা ও নিবিড় অরণ্যানী রহিয়াছে এবং পার্ব্বতীয় অনার্য্যজাতিগণ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ঐ অঞ্চলে বাস করিতেছে।

* Hunter's Orissa vol. 1, p. 309.

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনায় আমরা খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাম্রলিপ্তের পরিচয় পাই। এক্ষণে মহাভারতীয় ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, দেখা যাউক।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব।

আমাদের দেশীয় পঞ্জিকার মতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি* কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলের্গতাব্দাঃ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর। তাহা হইলে খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়কাল হয়। কিন্তু দেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৪৩০। * রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ১২৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। † অধ্যাপক কোলব্রুক সাহেব গণনা করিয়াছেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন সাহেব ও এল্ফিন্ষ্টোন সাহেব সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ‡ উইলফোর্ড সাহেব বলেন যে, ১৩৭০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। বুকানন সাহেবের মতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব অনুমান করেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। হাণ্টার সাহেব প্রাট্ সাহেবের মতাবলম্বী। ¶ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যে ঠিক কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই; ফলতঃ ইহার যে কোন একটি মত ধরিলেও তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মহাভারতীয় কালেও যে এ প্রদেশ বিশেষ গণনীয়

---

* কৃষ্ণচরিত্র—তৃতীয় সংস্করণ—পৃঃ ২৩-২৭।

† History of Civilisation in Ancient India vol. I. p. 83.

‡ Cowell's Elphinstone, Book III. ch. III. p. 156.

¶ Hunter's Brief History of the Indian people pp. 58-59.

ছিল, তাহাও সপ্রমাণ হয়। কেন না, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্য-ভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাজসূয়যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিতি ও সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সহস্র হস্তী উপঢৌকন প্রদান এবং পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে।

কাঁথির প্রস্তর মূর্ত্তি

চতুর্থ অধ্যায়।

হিন্দু-রাজত্ব—তাম্রলিপ্ত রাজ্য।

তাম্রলিপ্তে জৈন প্রভাব।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর একপ্রকার আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য বিলুপ্ত এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয় প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করগণের আবির্ভাবে বরং ক্ষত্রিয় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, জৈনধর্ম্মপ্রচারক চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে প্রায় সকল তীর্থঙ্করের সহিত বাঙ্গালীর সংস্রব ঘটিয়াছিল। ইহাঁরা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন-সমাজে "দেবাধিদেব" অর্থাৎ দেব-ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। জৈন তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী ৭৭৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মানভূম জেলাস্থ সমেত-শিখরে (বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাভ করেন। জৈন কল্পসূত্রে দেখা যায়, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর পর চতুর্বিংশ বা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের অভ্যুদয়। মহাবীরের অপর নাম বর্দ্ধমান স্বামী। বর্দ্ধমান স্বামী যে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে সেই দেশের নাম

'বৰ্দ্ধমান' হয়। জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেলির নাম ভদ্রবাহু। ভদ্রবাহুর শিষ্য-প্রশিষ্যে সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটি শাখার সৃষ্টি হয়। (১) "তাম্রলিপ্তিকা" -তমলুক, (২) "কোটি-বর্ষীয়া"—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওকোট পরগণা, (৩) "পুণ্ড্র-বৰ্দ্ধনীয়া"—মালদহ ও বগুড়া জেলা, (৪) দাসী কর্ব্বটীয়া—সম্ভবতঃ মানভূম জেলা। * এই শাখা-চতুষ্টয়ের নাম হইতে জানা যায় যে, দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বতন কালেও মেদিনীপুর জেলায় জৈনদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তথায় তাহাদের এক শক্তিশালী শাখারও অভ্যুদয় হইয়াছিল।

মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের অভ্যুদয় এক সময়েই হইয়াছিল এবং উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্ত।

উভয়েই বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডের নিন্দা ও জ্ঞান-কাণ্ডের আবশ্যকতা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে ধৰ্ম্মপ্রচার করিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন (৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ)। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব সমুদায় এসিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐ সময় তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহের নানা স্থানে তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যখ্যাতিও সে সময় সমুদয় সভ্য-জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। † যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবলীলা সমাপ্ত হয়, সেই বৎসর বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সিংহল

* বিশ্বকোষ—১৭শ ভাগ—পৃঃ ৪০৬।

† Hunter's Orissa. Vol. 1, p. 309.

অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে তাম্রলিপ্তে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। * বিজয়সিংহ সমুদ্রপথে সেই সকল জাহাজ লইয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, ৩০৭ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটি প্রধান বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং ঐ বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধি-দ্রুম সিংহলে প্রেরিত হয়। † খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাত-নামা গ্রীক বণিক্ "আরব্য-সাগর—বহির্বাণিজ্য-বিবরণ" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ ইংরাজীতে "Periplus of the Erithrian" নামে অনুবাদিত হইয়াছে। উহাতেও লিখিত আছে যে, তৎকালে তাম্রলিপ্ত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ‡ ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যে যবনগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন, তাঁহারাও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হইতেই গমন করেন। ¶ বৌদ্ধযুগে তাম্রলিপ্তে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের প্রধান সঙ্ঘা-রাম ছিল। তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই যে সে সময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা অনুমান করা সুকঠিন হইলেও মেদিনীপুরের বিজন পল্লী ও নদী-সৈকত এখনও শত শত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ভস্মাচ্ছাদিত অস্থিখণ্ডের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অত্যল্পকাল পরে নন্দবংশীয় রাজগণ মগধের

* বঙ্গদর্শন—ষষ্ঠ খণ্ড—পৃঃ ৩১৩।

† মহাবংশ—১১শ ও ১২শ পরিচ্ছেদ।

‡ Mukherjee's Magazine, June, 1873 p. 260.

¶ Hunter's Orissa vol. 1. p. 310.

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা প্রায় একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে মৌর্য্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীকরাজ সিলিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস্ তাঁহার রাজসভায় বহুকাল অবস্থান করিয়া "ইণ্ডিকা" নামক একখানি গ্রন্থে প্রাচ্য-জগতের একটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী গ্রীক লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে 'গণ্ডরিডই' বা 'গঙ্গারিডি' নামে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল। গঙ্গরিডিগণের অসংখ্য বৃহদাকার দুর্জ্জয় রণহস্তসমূহ থাকায় ঐ রাজ্য কখনও কোন বিদেশীয় নৃপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে পারে নাই। গঙ্গানদী ঐ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত ছিল। * বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত অর্থাৎ যে অংশ প্রাচীনকালে সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, রাঢ় প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল, সেই অংশ গঙ্গরিডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার দক্ষিণদিকে অবস্থিত গোদাবরী পর্য্যন্ত প্রদেশ যাহা তৎকালে কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত, সেই অংশও ঐ রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল। †

গঙ্গরিডি বা গণ্ডরিডই রাজ্য।

মেগাস্থিনিস্ গঙ্গার মোহানার নিকট সমুদ্রের উপকূলপ্রদেশে

---

* Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W Mc Crindle pp. 33-34.

† গৌড়রাজমালা—১ম ভাগ, পৃঃ ২। বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম ভাগ, পৃঃ ৩০।

তালুক্তি নামক এক পরাক্রান্ত জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। অনু-বাদক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে তাহা পুরা-তন বন্দর তাম্রলিপ্তবাসীর নির্দ্দেশক। * খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। † চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য যে অর্থ-শাস্ত্রের পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। ‡ মেগাস্থিনিস্ গঙ্গরিডি-রাজ্যের বৃহদাকার দুর্জ্জয় রণহস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও দেখা যায় যে, তাম্রলিপ্তাধিপতি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পর্ব্বতপ্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান করিয়াছিলেন। ¶ পূর্ব্ব-অধ্যায়ে তাম্রধ্বজের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ-ঘটনাপ্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, আমাদের অনুমান, সে সময় তাম্রলিপ্তাধিপতির অধিকার নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাম্রধ্বজ নর্ম্মদাতীরেই পাণ্ডববাহিনীকে পরাজয় করিয়া সেই ঘট-নার স্মরণার্থ কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্ত্তি স্বীয় রাজধানী তাম্রলিপ্তে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গঙ্গরিডি-রাজ্যের অবস্থান-নির্ণয়ও তাহার সপক্ষে একটি প্রমাণ। মেগাস্থি-নিসের লিখিত বিবরণ হইতে অনুমান করা যায়, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে তাম্রলিপ্ত মগধরাজের অধিকারভুক্ত ছিল না এবং তিনি যাহাকে গঙ্গরিডি-রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই প্রাচীন-কালের সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত-রাজ্য। সুতরাং ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রায় মহাভারতীয় কাল হইতে মহারাজা

---

* Mc Crindle's Megasthenes, pp. 132-133.

† Ptolemy's Ancient India, p. 170.

‡ মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদে শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিভাষণ।

¶ মহভারত—সভাপর্ব্ব—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—পৃঃ ৬৯।

চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্ত একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়াই পরিগণিত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। কিন্তু কলিঙ্গ বা তাম্রলিপ্তে তখনও মৌর্য্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিন্দুসারের পরে তৎপুত্র প্রিয়দর্শী অশোকবর্দ্ধন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক প্রথম হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। স্বীয় রাজত্বের নবম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গজয়ের সময় বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবধ হয়; ইহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি শান্তিময় ধর্ম্মগ্রহণের প্রয়াসী হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার এই মধুর ধর্ম্মের ফল সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিল। ভারতের নানাস্থানে তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। অঙ্গ-বঙ্গাদি প্রদেশের অনেক বিহার ও চৈত্য ঐ সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্তম্ভে প্রিয়দর্শীর আদেশবাণী খোদিত থাকিত। ঐরূপ একটি স্তম্ভ তাম্রলিপ্ত নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং তাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শী পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব-সাগর এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুশাসন-সমূহে পৃথগ্‌ভাবে গঙ্গরিডি বা তাম্রলিপ্ত-রাজ্য জয়ের কোন উল্লেখ না থাকিলেও তিনি বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবধ করিয়া যে কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, উহা যে সেই গঙ্গরিডি রাজ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার রাজ্যকালে মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে আর কোন স্বাধীন

তাম্রলিপ্তে অশোকের অধিকার।

রাজ্যই ছিল না। অশোক গঙ্গরিডি রাজ্যের সেই প্রাচীন রাজবংশকে উন্মূলিত করিয়া তাঁহার বিজয়চিহ্ন-স্বরূপ রাজধানী তাম্রলিপ্তে শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজবংশের কোন কথা বা কোন রাজার নাম আজ পর্য্যন্ত সঠিক জানা যায় নাই।

অশোকের রাজত্বকালে যখন চারিদিকে প্রচারক প্রেরিত হইতেছিল, সেই সময় অশোকের পুত্র মহেন্দ্রও সিংহলের রাজা তিষ্যের অনুরোধে ২৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিতে হইলে তাম্রলিপ্তই একমাত্র বন্দর ছিল। অশোক-পুত্র মহেন্দ্রও বিস্তর ভিক্ষুবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ বন্দর হইতে সিংহল-যাত্রা করিয়াছিলেন।*

অশোকের মৃত্যুর পরেও, বোধ হয়, তাম্রলিপ্ত মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। পরে শেষ মৌর্য্য-নরপতি বৃহদ্রথ তাঁহার শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণজাতীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হইলে, সম্ভবতঃ জৈনরাজ খারবেল এই প্রদেশ জয় করেন। উড়িষ্যার উদয়গিরি পর্ব্বতে হস্তিগুম্ফার উপরে কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব তৃতীয় নরপতি খারবেলের একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, খারবেল মগধ ও উত্তরাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। † সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সময় তাম্রলিপ্তও কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

তাম্রলিপ্তে খারবেলের অধিকার।

মৌর্য্য-রাজবংশের অধঃপতনের পর শুঙ্গবংশীয় বা শুঙ্গভৃত্যবংশীয়

* Pilgrimage of Fa-Hian, ch. XXVIII. p. 53.

† Epigraphia Indica, Vol. X. App. pp. 160-61. No. 1345.

রাজগণ কিছুদিন আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে শক-দিগের রাজ্যারম্ভ। শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা কুষাণ-বংশীয় প্রথম কাণিস্কের সময়ে কুষাণ-সাম্রাজ্য পূর্ব্বে প্রাচীন চীন-সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমা পর্য্যন্ত এবং উত্তরে সাইবিরিয়া হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সেই বিস্তৃত কুষাণ-সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায় এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে গুপ্তাধিকার আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত গুপ্ত-রাজগণ মগধ ও বঙ্গে প্রবল ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে সম্রাট্ সমুদ্র গুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত সম্রাট্ প্রথম কুমার গুপ্তের অধিকার উৎকলের উদয়গিরি পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। † পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজাধিরাজ স্কন্দ গুপ্ত হূণ-যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিলে বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। রাখাল বাবু অনুমান করেন, স্কন্দ গুপ্তের পরে যাঁহারা গুপ্ত-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মগধ ও বঙ্গের বাহিরে অন্য কোন প্রদেশে অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। ‡ পরবর্ত্তিকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত পুনরায় পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উপকণ্ঠ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ করগত করিয়া গৌড়-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৎপরে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যও

কুষাণ-সাম্রাজ্যে ও গুপ্তাধিকারে তাম্র-লিপ্ত রাজ্য।

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ – পৃঃ ৪৭।

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III p. 44.

‡ বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ পৃঃ ৩৩।

লৌহিত্যের উপকণ্ঠ (ব্রহ্মপুত্রনদ) হইতে পশ্চিমে পয়োধি পর্য্যন্ত ও মহেন্দ্রগিরি (কলিঙ্গ) হইতে তুঙ্গশিখরী গঙ্গাশ্লিষ্ট-সানু হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সে সময় তাম্রলিপ্তও যে কুষাণ-সাম্রাজ্য বা গুপ্তাধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু তখনও তাম্রলিপ্ত যে একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল, বৌদ্ধ পরিব্রাজক-দিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তাম্রলিপ্তের সেই প্রাচীন রাজবংশ অশোক কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইলে পরে যে বা যে কয়টি রাজবংশ তাম্রলিপ্তের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। মগধ বা কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সামন্তরূপেই তাঁহারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্ত বা সুহ্ম রাজ্যের সীমাও তখন অনেক কমিয়া গিয়া আরও কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তবে এই সকল রাজ্যের সামন্তগণই সময় সময় প্রধান রাজবংশের দুর্ব্বলতা দর্শনে সুযোগ পাইয়া কখনও কখনও কাহারও অধীনতাই স্বীকার করিতেন না; যত দিন পারিতেন, স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। আবার খারবেল, কাণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির ন্যায় ক্ষমতা-শালী রাজগণ যখন রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন, তখন তাঁহারা ঐ সকল রাজবংশকেও অধীনতাস্বীকারে বাধ্য করিতেন। পরবর্ত্তিকালে তাম্রলিপ্ত-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজগণ এইরূপ সামন্ত বা অর্দ্ধস্বাধীন রাজা ছিলেন বলিয়াই আমরা অনুমান করি এবং এই জন্যই বোধ হয়, তাম্রলিপ্তের কোন রাজার প্রদত্ত শাসনপত্র বা সেই বংশের কোন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৮৮১ খৃঃ অব্দে রূপনারায়ণ নদ পূর্ব্বখাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হইলে, ভূগর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা বাহির হইয়াছিল। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টার উইল্‌সন্ সাহেব ও তমলুকের তৎকালীন সব্‌ডিভিজন্যাল অফিসার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় উহার কতকগুলি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মুদ্রাগুলির অধিকাংশই সচ্ছিদ্র ছিল; উহাদের উপর কিছুই খোদিত ছিল না। কোন কোনটির উপর পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মৃগ, সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। পণ্ডিতগণের অনুমান, ঐ সকল মুদ্রা খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। ঐগুলি তাম্রলিপ্তের সেই প্রাচীন ক্ষমতাশালী রাজবংশের মুদ্রা হইলেও হইতে পারে; সঠিক বলা যায় না।

তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা।

মৌর্য্য-রাজবংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে 'পুরাণ'-নামক একপ্রকার চতুষ্কোণ রজতখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। মগধ ও বঙ্গের নানা স্থানে ঐরূপ কয়েকটি 'পুরাণ' আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে (বাঙ্গালা ১২৭৫ সাল) দীনবন্ধু মিত্র তমলুক নগরে একটি 'পুরাণ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে সময় 'পুরাণ' ব্যবহৃত হইত, সে সময় দুই জাতীয় তাম্রমুদ্রারও ব্যবহার ছিল। প্রথম, বৃহৎ তাম্রখণ্ড হইতে কর্ত্তিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা; দ্বিতীয়, ছাঁচে ঢালা (Cast) চতুষ্কোণ বা গোলাকার মুদ্রা। দীনবন্ধু মিত্র তমলুকেও শেষোক্ত প্রকারের একটি তাম্রমুদ্রা পাইয়াছিলেন।

বঙ্গের নানা স্থানে কুষাণবংশীয় রাজগণেরও কয়েকটি মুদ্রা

---

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112.

বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩২।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তমলুকে প্রথম কাণিস্কের একটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়। ঐ মুদ্রাটিতে রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত ও গ্রীক অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। * গুপ্ত-রাজগণের কয়েকটি মুদ্রাও বঙ্গের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তমলুকে গুপ্ত-সম্রাট্ মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের একটি সুবর্ণ-মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রাটির এক দিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি ও অপরদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত। রাজা অশ্বারোহণে বামদিকে গমন করিতেছেন। † ১৯০৪ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুর জেলায় অন্যতম গুপ্ত-সম্রাট্ মহারাজ স্কন্দগুপ্তেরও একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঐ মুদ্রাটিতে রাজমূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বে একটি রমণী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন, এই রমণীমূর্ত্তিটি স্কন্দগুপ্তের পট্টমহিষীর মূর্ত্তি। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর জন আলেন মহোদয় স্থির করিয়াছেন যে, স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণ-মুদ্রায় খোদিত রমণীমূর্ত্তিটি শ্রী বা লক্ষ্মীমূর্ত্তি। উহা তাঁহার পট্টমহিষীর মূর্ত্তি নহে। ‡ গুপ্তরাজগণ লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের এই জাতীয় সুবর্ণ-মুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য; সামান্য কয়েকটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তমলুকে পাঠান ও মোগল বাদশাহগণের কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্তের কোন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই।

গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে চীনদেশীয় কয়েকজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণে

---

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1882, p. 112.

† J. R. A. S. 1893, p. 121 and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882. p. 112.

‡ Catalogue of Coins in the Indian Musium, p. 127, No. 7.

তাম্রলিপ্তের অনেক কথা জ্ঞাত হওয়া যায়। তাম্রলিপ্ত তখনও পূর্ব্ব-ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। গুপ্তসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান আর্য্যাবর্ত্ত-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণের শেষ দুই বৎসর (৪১১—৪১২ খৃঃ অব্দ) তাম্রলিপ্ত বন্দরে বাস করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুতকরণে এবং দেবমূর্ত্তির চিত্রসঙ্কলনে নিরত ছিলেন। * ফা-হিয়ান সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহুতর বৌদ্ধাচার্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত হইতেই অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সিংহলযাত্রা করেন। † সম্ভবতঃ ফা-হিয়ান হিন্দুগণকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, সেই জন্য তাঁহার লিখিত বিবরণে কোন হিন্দু-কীর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরিব্রাজক ফা-হিয়ান।

খৃষ্টীয় ৫২৬ অব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে কাণ্টনযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন সম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্মের 'কাষায়' ও 'ভিক্ষাপাত্র' জাপানের ইক্রুণ মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে 'প্রজ্ঞাপারমিত হৃদয়সূত্র' ও 'উষ্ণীষবিজয়ধারিণী' নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ দু'খানি জাপানের প্রসিদ্ধ 'হোরিউজি মঠ' হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ যে সকল স্তব-কবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করিয়া থাকেন, সে সমুদয় পূর্ব্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত। ‡

আচার্য্য বোধিধর্ম্ম।

* গৌড়রাজমালা—১ম ভাগ, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৫।

† Cowell's Elphinstone, p. 288 (App. IX.)

‡ বিশ্বকোষ—১৭শ ভাগ—পৃঃ ৪১১।

খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক স্বনামখ্যাত ইউ-য়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সে সময় গৌড়-বঙ্গ হিরণ্যপর্ব্বত (মুঙ্গের), চম্পা (ভাগলপুর), কাজুঙ্ঘির-পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া), সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ এই কয়টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইউয়ান-চোয়াং তাঁহার প্রণীত "সি-য়ু-কি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি সমতট (বর্ত্তমান ঢাকা) হইতে পশ্চিমদিক্ ধরিয়া নয় শত 'লি' গমন পূর্ব্বক তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত উপসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী ও নিম্নভূমি। এই রাজ্যের পরিধি ১৪০০ 'লি' এবং উহার রাজধানী ১০'লি'র অধিক বিস্তৃত। উহার অন্তর্বাণিজ্য স্থলপথে এবং বহির্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইত। উহার বাণিজ্য-সমারোহ দেখিয়া ইউয়ান-চোয়াং চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তে সে সময় দশটি বৌদ্ধ মঠ ও সহস্রাধিক বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং নগরের এক প্রান্তে মহারাজ অশোকনির্ম্মিত দুইশত ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ দেখিয়া গিয়াছিলেন। উহার পার্শ্বে সিঁড়ি ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধগণ তাহার উপর বসিতেন ও বেড়াইতেন। দুর্লভ ও মূল্যবান্ দ্রব্য তাম্রলিপ্তে প্রচুর পাওয়া যাইত। বিস্তর ধনী মহাজন ও জাহাজের অধিবাসিগণ সেখানে বাস করিতেন। সাধারণতঃ অধিবাসীরা ধনী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং তাম্র-লিপ্তে বৌদ্ধ মঠ ব্যতীত পঞ্চাশটি পৌত্তলিক হিন্দু-মন্দিরও দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদিও তৎকালে ঐ প্রদেশের ভূমি সকল নিম্ন ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্ব্বর থাকাতে কর্ষিত হইয়া

পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং।

যথেষ্ট ফল ও ফুল উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী ও কার্য্যতৎপর ছিলেন। *

ইউয়ান-চোয়াঙের লিখিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, ৬৩৫ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রে ধৌত হইয়া গিয়াছিল। † ইহা যে কিরূপ ধৌত, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই লেখা নাই। অনুমান বিগত ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে কিংবা ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ভীষণ ঝটিকা ও জলপ্লাবনে এই নগরটি যেরূপ ধৌত হইয়া গিয়াছিল, উহাও সেইরূপ হইবে। নতুবা একবারে সমগ্র নগরটি সমুদ্রের গর্ভসাৎ হইলে ইউ-য়ান-চোয়াং অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া তাহা লিখিতেন। কারণ, তিনি ৬৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এতদ্দেশের বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। ‡

পরিব্রাজক ই-চিঙ্।

ইউয়ান-চোয়াঙের পরে খৃষ্টীয় ৬৭৩ অব্দে ই-চিঙ্ নামক আর একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক চীনের কাং-চাউ নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগীরথীর মোহানায় তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখান হইতে নালান্দায় গমন করেন এবং তথায় সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া অর্ণবযানারোহণে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেনন। ¶ তিনি তাম্রলিপ্তের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, মোটামুটী ধরিতে গেলে ভারতের মধ্যদেশ হইতে ইহা প্রান্তদেশ—পূর্ব্ব ও পশ্চিমে তিন শত যোজনের অধিক, দক্ষিণে ও

* Samuel Beal's Budhist Records of the Western World Vol. II. pp. 200-201 and Hunter's Orissa, Vol I. pp 309-310.

† Imperial Gazetteer of India; Vol. VIII. p 5-14.

‡ Watter's on Yuan-Chwang, Vol. I & II.

¶ Max Muller's India What Can it Teach us ? pp. 342—34:.

উত্তরে সীমান্তভূমি চারিশত যোজনেরও অধিক দূরবর্ত্তী। ভারতের পূর্ব্ব-সীমা হইতে এই রাজ্য ৪০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত "মহাবোধি" ও শ্রীনালন্দ হইতে প্রায় ষাইট যোজন। পরিব্রাজকগণকে চীন-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ঐ স্থানেই পোতারোহণ করিতে হয় এবং সেখান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমাগত দুই মাস কাল গমন করিলে তাঁহারা ক-চ নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু যাঁহারা সিংহলে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সিংহলদ্বীপ তাম্রলিপ্ত হইতে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত। তাম্রলিপ্তে তৎকালে পাঁচ ছয়টি ধর্ম্মমন্দির ছিল এবং তথাকার অধিবাসীরা সকলেই ধনী ছিলেন। *

-চিঙের পরে আরও কয়েকজন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ নূতন কথা কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁহারা কোন্ পথে কি ভাবে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ আলোচনা করিলে, কোন্ কোন্ দেশের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল পর্য্যটকের মধ্যে তাও-লিন, তাং-চেং-তেং, হুই-লুন, উ-হিং-চেং-কন, চাং-মিন প্রভৃতি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তাও-লিন যবদ্বীপ ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের পথে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। তাং-চেং-তেং লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়া বরাহবিহারে বাস করিয়াছিলেন। যে বাণিজ্যপোতে তিনি তাম্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, পথি-

অন্যান্য পরিব্রাজকগণ।

* Indian Shipping, p. 161.

মধ্যে সেই বাণিজ্যপোত দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। হুই-লুন ও উ-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কাদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্তের সহিত যে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যায়।

তাম্রলিপ্তে চালুক্য-রাজবংশ।

খৃষ্টীয় ৬৭৩ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিঙ্ তাম্রলিপ্তে আসিয়া একটি বরাহ-মন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে তৎকালে হারিতী দেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইত। সুপণ্ডিত বীল সাহেব লিখিয়াছেন যে, চালুক্যগণ ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজবংশ আপনাদিগকে হারিতী দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বরাহ-মূর্ত্তিও চালুক্যদিগের জাতীয় চিহ্ন। তিনি অনুমান করেন, তমলুকের প্রাচীন বরাহ-মন্দিরটি চালুক্যবংশীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। † অন্যতম চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং ৬২৯ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৩৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণে ঐ বরাহ-মন্দিরটির উল্লেখ নাই। এই কারণে মনে হয়, ৬৩৫ খৃঃ অব্দ হইতে ৬৭৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোম্বাই-প্রদেশে কালাডগি জেলায়, ঐহোল নগরে মেগুটি নামক স্থানে দাক্ষিণাপথরাজ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর যে শিলালিপিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে জানা যায় যে, পুলকেশী কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিয়াছিলেন। ‡ হর্ষবর্দ্ধন চালুক্যরাজ পুলকেশী কর্ত্তৃক

---

* পৃথিবীর ইতিহাস, দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৩।

† Budhist Records of the Western World. Vol. I. p. 110.

‡ Epigraphia Indica. Vol. VI. p. 6,

পরাজিত হইয়াছিলেন। রাখাল বাবু অনুমান করেন, উড়িষ্যায়, দক্ষিণ-কোশলে ও কলিঙ্গে হর্ষের সহিত পুলকেশীর সংঘর্ষ হইয়াছিল। * প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু ঘটে। † সম্ভবতঃ ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে যৎকালে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-কোশল পুলকেশীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তৎকালে কিছুদিনের জন্য তাম্রলিপ্তেও তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই সময়েই পূর্ব্বোক্ত বরাহ-মন্দিরটি স্থাপিত হইয়াছিল।

পালবংশ ও দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল।

গুপ্ত রাজগণের পরে গৌড়-বঙ্গে পাল-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে পাল-বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তাঁহাদের সময় হইতেই তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাম্রলিপ্ত-রাজ্য তখন দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্রতন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেব যখন গৌড়ের সম্রাট, সেই সময় গৌড়রাজ্য কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ শিলালিপিতে তদীয় উত্তরাপথাভিযানের বিবরণ আছে। ‡ উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে আসিয়া দুর্গম ওড্ড বিষয় (উড়িষ্যা), মনোরম কোশলনাড়ু (কলিঙ্গের নিকটস্থ মহাকোশল—বর্ত্তমান সম্বলপুর প্রভৃতি জেলা), মধুকরনিকর-পরিপূর্ণ উদ্যান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি (দণ্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৮।

† V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 352.

‡ Epigraphia Indica, Vol. IX. pp. 232-233.

ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ), প্রসিদ্ধ তক্কন লাড়ম (দক্ষিণরাঢ়), রত্ন-সম্পন্ন উত্তির লাড়ম (উত্তররাঢ়) প্রভৃতি প্রদেশের অধিপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তন্দবুত্তিতে তখন ধর্ম্মপাল নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিলালিপিতে উৎকীর্ণ তন্দবুত্তি বা দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের নাম। তাঁহারা অনুমান করেন, বর্ত্তমান দাঁতন নামক স্থানই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। * কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান নাম বিহার। † কারণ, তিব্বতীয় ইতিহাসে 'বিহার' ওতন্তপুরী বা ওতন্দপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রাখাল বাবু লিখিয়াছেন যে, ওতন্দপুর সংস্কৃত উদ্দন্তপুরের অপভ্রংশ এবং উদ্দন্তপুর বিহার নগরের প্রাচীন নাম—বিহারের আবিষ্কৃত বহু খোদিত লিপি হইতে জানা যায়। সুতরাং বিহার কখনই দণ্ডভুক্তি হইতে পারে না। দণ্ডভুক্তি কোশলদেশের পরে ও দক্ষিণরাঢ়ের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানেই হওয়া সম্ভব। ‡

তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ যুদ্ধে দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজয় করিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে তাঁহার তাম্রলিপ্তরাজ্য-জয়ের কোন উল্লেখ নাই। দণ্ডভুক্তির পরেই দক্ষিণ-

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, পৃঃ ২২০।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড), পৃঃ ১১০।

† Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 10.

‡ বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, পৃঃ ২২০-২২১।

রাঢ়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, তাম্রলিপ্ত তখন দক্ষিণ-রাঢ়রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা তাম্রলিপ্তে সেরূপ কোন ক্ষমতাশালী রাজা থাকিলে নিশ্চয়ই রাজেন্দ্র চোলের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিত। পরন্তু ইহাও সম্ভব নহে যে, দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল তাম্রলিপ্তাধিপতির নিকট পরাজিত হওয়াতে শিলা-লিপিতে সে কথার উল্লেখ করেন নাই।

শূর-রাজবংশ ও দক্ষিণ রাঢ়রাজ্য।

এই ঘটনার কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে পালবংশীয় অন্যতম নরপতি রাজা রামপাল যখন কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃ-রাজ্য বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধন করেন, তখন গৌড়-বঙ্গের তৎকালীন ক্ষমতাশালী রাজারা প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-প্রণীত 'রামচরিত'-নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ও তাহার টীকা তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস ও ভূগোলের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। * রামচরিতে রামপালের বিস্তারিত জীবনী আছে। ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে, বারেন্দ্র অভিযানে যে সকল সামন্ত গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহ ও অপার-মান্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূরও ছিলেন। † শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'কোট' অথবা কোটাটবী দেশ বিশাল অরণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ এবং অপার-মান্দারের বর্ত্তমান নাম মান্দারণ। ‡ মান্দারণ

* Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III.

† রামচরিত, ২।৫ টীকা।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—(রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৯১, ১৯৯।

মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ; এক্ষণে উহা হুগলী জেলার অন্তর্গত। কোটাটবীর পরে দণ্ডভুক্তি এবং তৎপরে অপার মান্দার ; রামচরিতেও তাম্রলিপ্তাধিপতির নাম নাই। ইহাও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সাপক্ষে আর একটি প্রমাণ। তবে লক্ষীশূরকে সামন্তচক্রের প্রধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাম্রলিপ্তাধিপতি সেই সামন্তচক্রের অন্যতম হইলেও হইতে পারেন। রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে এই জন্যই হয় ত পৃথগ্‌ভাবে তাম্রলিপ্ত-জয়ের কথা নাই। দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতিকে পরাজয় করায় তাঁহার সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল। অপার-মান্দার বা মান্দারণই এক সময়ে দক্ষিণরাঢ়ের রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আইন্-ই-আক্‌বরীর রাজস্ব-বিভাগেও দেখা যায় যে, তৎকালেও দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিকাংশ সরকার মান্দারণের অন্তর্ভূত ছিল এবং এই জেলার অন্তর্গত চিতুয়া, চন্দ্রকোণা, বরদা প্রভৃতি পরগণা এবং বর্ত্তমান তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল পরগণাও ঐ সরকারের অন্তর্ভূত ছিল। * সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূর ও অপার-মান্দারের লক্ষীশূর একই বংশসম্ভূত ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে শূর উপাধিধারী রাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূয়সী জনশ্রুতি আছে। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ-সমূহের আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক সময়ে শূর উপাধিধারী রাজবংশ গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। † কিন্তু ঐতিহাসিক রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, যে জাতীয় প্রমাণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol, I. p. 369.

† গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—(রাজন্যকাণ্ড)—নগেন্দ্রনাথ বসু।

রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে শূরবংশীয় দুই জন-মাত্র নরপতির নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে—রণশূর ও লক্ষ্মীশূর। * আমাদের অনুমান, দক্ষিণরাঢ়ে এই শূর-বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত তখন একটি ক্ষুদ্রতন রাজ্যে পরিণত হইয়া দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্ভূত হয়। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেবও অনুমান করেন, রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তরাজ্য দক্ষিণরাঢ়ের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। †

সেন রাজবংশ ও অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ।

শূরবংশের পরে সেনবংশ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেন-বংশের খোদিত লিপিমালা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজয়-সেন সেনরাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। রাখাল বাবু অনুমান করেন, বিজয়সেন প্রথমে রাঢ়দেশের অংশবিশেষের, পরে পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ অধিকার করিয়া লইয়া গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বিজয়সেন শূরবংশের দুহিতা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‡ দক্ষিণ-রাঢ়ে সেন-রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাম্র-লিপ্তও তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। "বিজয়সেন অন্যূন পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উৎকলরাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্র-

* বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, ২০৮-২০৯।

† District Gezttteer, p. 21.

‡ বাঙ্গালার ইতিহাস,—প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮—২৯০।

শাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগের (উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়) কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দারের দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। * রাখাল বাবু অনুমান করেন যে, উৎকলরাজ অনন্তবর্ম্মা স্থায়িভাবে রাঢ়দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। বিজয়সেন যে সময় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই অবসরে অনন্তবর্ম্মা রাঢ়দেশ অধিকার করেন। যুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় পুনরায় বিজয়-সেনের করতলগত হয়। কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয়সেন কলিঙ্গাধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিলে। সে সময়ে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গই কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজ-বংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময় দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিকাংশই মুসলমানদিগের করগত হইয়াছিল; অবশিষ্টাংশ উৎকলের প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গবংশ অধিকার করিয়া লয়েন। উৎকলরাজ অনঙ্গভীমদেব খৃষ্টীয় ১২১১ অব্দ হইতে ১২৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস মাদলাপাঞ্জীতে অনঙ্গভীমদেবের রাজ্যকালের যে বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে উৎকল রাজ্যের উত্তর-সীমা কাঁসবাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি তাঁহার রাজ্যাধিকার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ‡ তাম্রলিপ্ত, মান্দারণ প্রভৃতি ভূভাগ

* J. A. S. B, 1896 Vol. I. p. 239—241

† বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮—২৯০।

‡ J. A. S. B, Geography of Orissa.

কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দার দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। * রাখাল বাবু অনুমান করেন যে, উৎকলরাজ অনন্তবর্ম্মা স্থায়িভাবে রাঢ়দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। বিজয় সেন যে সময় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই অবসরে অনন্তবর্ম্মা রাঢ়দেশ অধিকার করেন। যুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তর-রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ় পুনরায় বিজয় সেনের করতলগত হইয়াছিল। কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কলিঙ্গাধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। সে সময় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গই কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন। †

"খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজবংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময় গৌড়রাজ্যের কিয়দংশ মুসলমানদিগের করতলগত হয় এবং দক্ষিণরাঢ়ের অধিকাংশ উৎকলের প্রবল-প্রতাপান্বিত গঙ্গবংশ অধিকার করেন। উৎকলরাজ অনঙ্গভীমদেব খৃষ্টীয় ১২১১ অব্দ হইতে ১২৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস মাদলা পঞ্জীতে অনঙ্গভীমদেবের রাজ্যকালের যে বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে উৎকলরাজ্যের উত্তর সীমা কাঁসবাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; কিন্তু তিনি তাঁহার রাজ্যাধিকার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ‡ তাম্রলিপ্ত, মান্দারণ প্রভৃতি ভূভাগ ঐ প্রদেশেরই অন্তর্গত। অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ যে স্থায়িভাবে দক্ষিণরাঢ় অধিকার করিতে

* J. A. S. B, 1896, pt. I. p. 239-241.

† বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮-২৯০।

‡ Journal and Procceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series, vol. XII, 1916, No I, p. 31.

পারেন নাই, পুনরায় যে উহা সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, মাদলা পাঞ্জীর উল্লিখিত বিবরণে অনঙ্গভীমদেবের নূতন করিয়া সেই প্রদেশ অধিকার করায় পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হইতেছে।

তাম্রলিপ্তের রাজা দেবরক্ষিত ও দেবসেন।

এতক্ষণ আমরা তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের কথা লইয়াই আলোচনা করিলাম। কিন্তু মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতিতে এবং বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থানে তাম্রলিপ্তরাজ্যের কথা থাকিলেও তাম্রলিপ্তের কোন রাজার নাম বা রাজবংশের কোন কথা পাওয়া যায় নাই। যে জাতীয় প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে সুহ্ম বা তাম্রলিপ্তের তিন জনমাত্র রাজার নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে;—রাজা দেবরক্ষিত, রাজা দেবসেন ও রাজা গোপীচন্দ্র। বিষ্ণুপুরাণে রাজা দেবরক্ষিতের নাম পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তাধিপতি দেবরক্ষিত কোশল, উড্র ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ-সমূহেরও অধীশ্বর ছিলেন। * কিন্তু রাজা দেবরক্ষিতের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বা উত্তর-পুরুষের আর কোন বিবরণী পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বিষ্ণুপুরাণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত পূর্ব্বদিকে লৌহিত্যনদের (ব্রহ্মপুত্র) উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা (কলিঙ্গ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক

* বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থাংশ—বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২৯২।

উন্মূলিত হইয়াছিল। * শশাঙ্কের পরে তাম্রলিপ্ত-রাজ্য সম্রাট্ হর্ষ-বর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। বাণভট্টের রচিত 'হর্ষচরিতে' সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকালের বিবরণ আছে। হর্ষচরিতে সুহ্মের অধিপতি দেবসেন নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই সুহ্মাধিপতি যে তাম্রলিপ্ত-রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন এবং সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত তখন যে একই রাজ্য ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কারণ, ঐ সময়েই সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গদেশ যে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্ত-রাজ্য তন্মধ্যে একতম। তাঁহার লিখিত বিবরণে সুহ্মরাজ্যের নাম নাই। † হর্ষচরিতে দেখা যায়, দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। তিনি বিষচূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল-সাহায্যে দেবসেনকে নিহত করেন। অতঃপর এই রাজবংশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, বলা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবি রামচন্দ্র-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে তাম্রলিপ্তের গোপীচন্দ্র রাজার নাম পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্র ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুখে ক্রোধে অধীর হইয়া এক ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ করায় দেবী অধো-মুখী হইয়া থাকেন। কিছু দিন পরে গোপীচন্দ্র পাঙ্গাভূমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরের স্রোতে মন্ত্রেশ্বরের কাছে জলে ডুবিয়া যান। সেই সময় কাকড় দেশের কৈবর্ত্ত-রাজা হাজার কৈবর্ত্ত সেনা লইয়া তিন দিন রাজধানী লুণ্ঠন করেন এবং পোড়াইয়া দেন। ইহার পর হইতে তাম্রলিপ্তে কৈবর্ত্তদিগের অধিকার আরম্ভ হয়। ‡ কবি

তাম্রলিপ্তের রাজা গোপীচন্দ্র ও কালু ভূঞা।

* গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ—১ম ভাগ, পৃঃ ৭-৮, ১৩।
† Hunter's Orissa—vol. I. p. 309-310.
‡ মেদিনীপুর সাহিত্যপরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

রামচন্দ্র কৈবর্ত্তরাজের নামোল্লেখ করেন নাই। তমলুকের বর্ত্তমান রাজবংশ জাতিতে কৈবর্ত্ত। কালু ভূঞা নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালু ভূঞা ঠিক কোন্ সময়ে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তমলুক রাজবাটীতে যে বংশপত্র আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কালু ভূঞার পরে যথাক্রমে ধাঙ্গড় ভূঞা, মুরারি ভূঞা, হরবার ভূঞা ও ভাঙ্গড় ভূঞা রাজ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লিখিত আছে, ৮১০ সালে (১৪০৩ খৃঃ অব্দে) ভাঙ্গড় ভূঞার মৃত্যু হইয়াছিল। * ভাঙ্গড় ভূঞার পরে যাঁহারা রাজপদ প্রাপ্ত হন, বংশপত্রে তাঁহাদের সকলেরই রাজত্ব-কালের নিরূপণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক গণনানুসারে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া হিসাব করিলে মোটামুটী জানা যায়, কালু ভূঞা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রামচন্দ্রের পুঁথিতে উল্লিখিত ঘটনার সময়ও প্রায় ঐরূপ। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত পুঁথিতে দেখা যায়, কাকড় দেশের কৈবর্ত্ত-রাজা হাজার কৈবর্ত্ত সেনা লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন; এ দেশেও বহুকাল হইতে একটি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কালু ভূঞা উড়িষ্যা হইতে আইসেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে চারি শত ঘর কৈবর্ত্ত এতদ্দেশে আসিয়া বাস করে। † মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, উড়িষ্যার উত্তর-সীমায়, সমুদ্রতীরে এক্ষণে কাকরাচোর নামে একটি পরগণা আছে। কাকরাচোর প্রাচীন পরগণা। উৎকলের মাদলা পাঞ্জীতে দেখা যায়, তৎকালে উৎকলপ্রদেশ যে একশত দশটি বিশিতে বিভক্ত ছিল, কাকরাচোর তন্মধ্যে একতম। আমরা অনুমান করি,

* Bayley's Memoranda of Midnapore, p. 33.

† Hunter's Orissa, vol. I, pp. 313-14.

এই কাকরাচোর পরগণাই রামচন্দ্রের উল্লিখিত কাকড়দেশ এবং এই কালু ভূঞাই সেই কৈবর্ত্ত-রাজা।

তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ইহার প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে নদীমাতৃক বরেন্দ্রভূমে কৈবর্ত্তগণের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; সংখ্যায়ও তাহারা কম ছিল না। সমস্ত নৌকা ও নৌবল তাহাদের করায়ত্ত ছিল। তৎকালীন পাল-রাজগণ তাহাদিগকে জলপথের রক্ষক বলিয়াই সমাদর করিতেন। পরে তাহাদের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তাহারা গৌড়ের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপালদেবকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া মিথিলা হইতে বরেন্দ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে। উত্তরকালে রামপাল এই বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। * সম্ভবতঃ ইহার পরেই কৈবর্ত্তগণ নদী-মাতৃক নিম্ন-বঙ্গের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রতর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অতঃপর সেনরাজবংশের অধঃপতনসময়ে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাকড়দেশে প্রতিষ্ঠিত কৈবর্ত্ত-নায়ক কালু ভূঞা দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্ভূত তাম্রলিপ্তের সামন্তরাজ গোপীচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। ইহার পরে ঐ প্রদেশে গঙ্গবংশের অধিকার বিস্তৃত হয়।

মাদলা পাঞ্জীতে উৎকলাধিপতি অনঙ্গভীমদেবের রাজ্য-বিস্তৃতির যে বিবরণ আছে, তদ্দ্বারাও আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হয়। মাদলা পাঞ্জীতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অনঙ্গভীমদেব ভূঞা-দিগকে পরাজিত করিয়া উত্তরদিকে কাঁসবাঁস নদী হইতে বড়দনাই নদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যাধিকার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। † অনঙ্গ-

* বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১ম ভাগ, দশম পরিচ্ছেদ।

† "By the grace of Lord Jagannath, by the blessings of

ভীমদেবও খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং তিনি ভূঞাদিগকে পরাজিত করিয়া যে প্রদেশ করতলগত করেন, তাহা যে এই কালু ভূঞারই রাজ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনঙ্গভীমদেব এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়া ভূঞাবংশকে উৎখাত করেন নাই; দেখা যায়, ভূঞাবংশ গঙ্গবংশের সামন্তরূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ।

তমলুকের রাজবাটীর বংশপত্রিকায় কালু ভূঞার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কয়েকজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সেই কয়েকটি নাম ব্যতীত তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথাই জানা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে তাঁহাদের কোন স্থান নাই। আমরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। পূর্ব্বোক্ত বংশপত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম রাজার নাম ময়ূরধ্বজ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে যথাক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, বিদ্যাধর রায়, নীলকণ্ঠ রায়, জগদীশচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর রায়, বীরকিশোর রায়, গোবিন্দদেব রায়, যাদবেন্দ্র রায়, হরিদেব রায়, বিশ্বেশ্বর রায়, নৃসিংহচন্দ্র রায়, শম্ভুচন্দ্র রায়, দ্বীপচন্দ্র রায়, দিব্যসিংহ রায়, বীরভদ্র রায়, লক্ষ্মণচন্দ্র রায়, রামচন্দ্র রায়, পদ্মলোচন রায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গোলোকনারায়ণ রায়, বলিনারায়ণ রায়, কৌশিকনারায়ণ রায়, অজিতনারায়ণ রায়, কৃষ্ণকিশোর

Brahmans and through faith in god Bishnu, conquring with sword the Bhuyas and Puranas, I have extended my kingdom on the north from Kasabas to the river Danai Burha (Jan Perdo or the old Damodar), ***" J. A. S. B.—New Series—vol. XII. 1916, No I. p. 31,

রায়, চন্দ্রার্ক রায়, মৌঞ্জীকিশোর রায়, মার্কণ্ডকিশোর রায়, ইন্দ্রমণি রায়, সুধন্বা রায়, মৃগয়া দেবী (সুধন্বা রায়ের ভগিনী ও কুমার যামিনী-ভঞ্জের স্ত্রী), রায়ভানু রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, নিঃশঙ্কনারায়ণ রায় (লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের জামাতা, কন্যা চন্দ্রা দেবীর স্বামী)। তৎপরে কালু ভূঞা ও তাঁহার অধস্তন পুরুষগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। *

এই বংশপত্রিকা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত রাজা ময়ূরধ্বজ ও তৎপুত্র তাম্রধ্বজ এবং এই বংশ-পত্রিকায় বিবৃত রাজা ময়ূরধ্বজ ও রাজা তাম্রধ্বজ যথাক্রমে একই ব্যক্তি; আর উক্ত রাজা ময়ূরধ্বজ হইতে রাজা কালু ভূঞা ও বর্ত্তমান ভূস্বামী পর্য্যন্ত একই রক্তের ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক গণনানুসারে তিন পুরুষে বা তিন জন রাজায় এক শতাব্দী হিসাব করিলে দেখা যায় যে, রাজা ময়ূরধ্বজ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত ঘটনা উহার বহুকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা অনুমান করেন যে, বংশপত্রিকায় সমস্ত রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই, কেবল খ্যাতিসম্পন্ন রাজাদের নামই বিবৃত আছে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষ হিসাবের দ্বারা তাঁহাদের সময়ের যথার্থ নিরূপণ অসম্ভব।

এই মতটি গ্রহণ করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, তাহা হইলে উক্ত তালিকায় দেবরক্ষিতের নাম নাই কেন? দেবরক্ষিত যে খ্যাতিমান্ রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, দেখা যায় যে, তিনি স্বরাজ্য তাম্রলিপ্ত ব্যতীত কোশল, উড্র ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ-সমূহের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি তৎকালে খ্যাতিমান্ রাজা ছিলেন বলিয়াই বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার

* Hunter's Statistical Account of Bengal, vol. III. p. 63.

নাম পাওয়া যায়। সেই জন্ত বিষ্ণুপুরাণের রাজা দেবরক্ষিতের নাম যেমন উড়াইয়া দিবার উপায় নাই, সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বঙ্গের তৎকালীন বহু ঐতিহাসিক ঘটনা সংবলিত শিখরভূমির রাজা রামচন্দ্র-কৃত প্রাচীন পুঁথিখানিতে উল্লিখিত রাজা গোপীচন্দ্রের প্রসঙ্গও কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান যুগের স্বনাম-খ্যাত ঐতিহাসিক শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ংও পুঁথিখানির ঐতিহাসিকত্বে বিশ্বাস করেন। গোপীচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে তমলুকে কৈবর্ত্তদিগের প্রাধান্ত বিস্তৃত হয়। কালু ভূঞা জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন এবং তমলুকের বর্ত্তমান ভূস্বামীও কৈবর্ত্ত। সমসাময়িক ঘটনাবলী দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত হয়;—পূর্ব্বে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত রাজগণের সহিত দেবরক্ষিত বা গোপীচন্দ্রের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া যেরূপ মনে হয় না, সেইরূপ কালু ভূঞার সঙ্গে দেবরক্ষিত বা গোপী-চন্দ্রের বংশের অথবা পূর্ব্বোক্ত রাজগণেরও কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কালু ভূঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির নাম। পূর্ব্বোক্ত রাজাদের মধ্যে কাহারও ঐরূপ নাম নাই; বরং কালু ভূঞার অধস্তন পুরুষগণের মধ্যে ধাঙ্গড়, ভাঙ্গড়, হরবাব, খিতাই প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত গণ্ডরিডি-রাজ্যের প্রসঙ্গে আমরা লিখি-য়াছি যে, আমাদের অনুমান, তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ মহাভারতীয় কাল হইতে সম্রাট্ অশোকের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। পণ্ডিত-গণের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল এবং সম্রাট্ অশোক খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। বংশপত্রিকায় উল্লিখিত রাজাদের

নামের তালিকায় ছত্রিশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, এবং পূর্ব্বোক্ত-রূপ গণনার দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যকাল প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর নির্ণীত হয়। তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশের রাজত্বকালও প্রায় ঐরূপ এবং জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত রাজা ময়ূরধ্বজ ও তৎপুত্র তাম্রধ্বজের নামের সহিত বংশপত্রিকায় প্রথম দুই জন রাজার নামের সৌসাদৃশ্য থাকায় আমরা এই রাজবংশকে সেই প্রাচীন রাজবংশ বলিয়াই অনুমান করি। সম্ভবতঃ প্রিয়দর্শী অশোকবর্দ্ধন কর্ত্তৃক উক্ত রাজবংশ উন্মূলিত হইবার পর আর কোন রাজবংশই স্থায়িভাবে বেশী দিনের জন্য তাম্রলিপ্ত-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খারবেল, কানিষ্ক, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্দ্ধন, পুলকেশী, রণশূর, বিজয় সেন প্রভৃতি উৎকল, গৌড়, বঙ্গ বা রাঢ়ের অধিপতিগণ যখন রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন, তখন বোধ হয়, তাঁহারা পূর্ব্বতন রাজবংশকে উৎখাত করিয়া নূতন রাজার হস্তে বিজিত রাজ্যের ভারার্পণ করিতেন। সেই জন্য ধারাবাহিকরূপে সেই সকল রাজার নাম সংগৃহীত হয় নাই। দেবরক্ষিত বা দেবসেন অথবা গোপীচন্দ্র প্রভৃতি রাজারা সেই সকল রাজবংশ-সম্ভূত হইতে পারেন। উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্তবর্ম্মাও তমলুকের ঐরূপ কোন রাজবংশ-সম্ভূত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

তাম্রলিপ্তে গঙ্গবংশ।

কেশরিবংশের অধঃপতনের পর উড়িষ্যায় গঙ্গবংশের অধিকার আরম্ভ হয়। কলভিন সাহেব যে অনুশাসন-পত্র পাইয়াছিলেন, সুপণ্ডিত উইলসন সাহেব উহার পাঠোদ্ধার করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গঙ্গবংশের আদিপুরুষ গঙ্গারাঢ়ী অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি এই প্রদেশ হইতে গিয়াই উড়িষ্যায় আধিপত্য

বিস্তার করেন। * ঐতিহাসিক এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবও উইলসন সাহেবের মত সমর্থন করিয়াছেন। † এই ঘটনা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত গঙ্গবংশীয়গণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। গঙ্গারাঢ়ী প্রদেশ বলিতে যে গঙ্গা-সন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশকে বুঝায়, বর্ত্তমান যুগের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ‡ কিন্তু ঐ গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধে কোন কথা আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে বহুকালাবধি এ প্রদেশে একটি জনশ্রুতি আছে যে, এই দেশেরই এক রাজকুমার উৎকল জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তৎকালে গঙ্গারাঢ়ী প্রদেশের মধ্যে তাম্রলিপ্তের রাজারাই বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। এই কারণে আমরা অনুমান করি, অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ তাম্রলিপ্তের কোন রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১০৭৮ হইতে ১১৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উৎকলের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ¶

গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্তবর্ম্মা বঙ্গের সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। অনুমান, দক্ষিণরাঢ়ের

---

* H. H. Wilson's Introduction to Mackenzie Collection CXXXVIII,

† History of India, Book IV. Chapter II. p. 243.

‡ The Cyclopedia of India, vol. I. p. 40., R. C. Dutts' History of India. পৃথিবীর ইতিহাস—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৫। বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, ২৩১। ২৩২। নব্যভারত, ১৩১৭—হিন্দুর বৈদেশিক উপনিবেশ।

¶ গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ—প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫১।

শূরবংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া বিজয় সেন যে সময় এ প্রদেশ অধিকার করেন, সেই সময় তিনি অনন্তবর্ম্মার বংশকে উৎখাত করিয়া রাজা গোপীচন্দ্রের কোন পূর্ব্বপুরুষের হস্তে তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া থাকিবেন। অনন্তবর্ম্মা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া উৎকলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উৎকলের খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস এক অরাজকতার ইতিহাস। ঐ সময় কেশরি-রাজবংশের অবসানে তাঁহাদের দুর্ব্বলতায় সুযোগ পাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ এক প্রকার নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের যখন এইরূপ দুরবস্থা, তখন প্রজাগণ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজকতা দূর করিবার জন্য অনন্তবর্ম্মাকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তিকালে, পূর্ব্ব-অপমানের প্রতিশোধ লইতেই বোধ হয়, অনন্তবর্ম্মা উৎকলের প্রজাপুঞ্জের আনুকূল্যেই স্বীয় রাজ্য বা পিতৃরাজ্যের অপহর্ত্তা বিজয় সেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়িভাবে তাহা অধিকার করিতে পারেন নাই—তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, এই অনন্তবর্ম্মার বংশও এক সময় তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তবে বলা বাহুল্য, এ সকলই আমাদের অনুমান মাত্র; বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের উপাদান-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্যক। অদ্যাবধি এমন কোন তাম্রশাসন, খোদিত লিপি বা প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা এই সকল অনুমানের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণীকৃত হইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হইলে পর তাম্রলিপ্ত-রাজ্যও উৎকলাধিপতির অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর হইতে তাম্রলিপ্তের শেষ হিন্দু-রাজত্বের ও মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাস উৎকলের ইতিহাসের সহিত জড়িত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে তাম্রলিপ্ত-রাজ্য উৎকল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এক প্রকার ঐ সময় হইতেই তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-খ্যাতিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেন-যে, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পরে আর তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায় না। * কিন্তু পেগু দেশের কল্যাণী গ্রামে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টের জন্মের বার শত কি তের শত বৎসর পরেও তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পেগুতে যাইয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। † মেজর উইলফোর্ডও লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ১০০১ অব্দে তাম্রলিপ্তের জনৈক রাজা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে চীনদেশে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‡ খৃষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত কি পনর শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও চণ্ডীর গান পাওয়া যায়, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। সে সময় লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত। ¶

তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-খ্যাতি।

তমলুকে আধুনিক যে সকল জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন তাম্রলিপ্তবাসীর পোতারোহণ-কাহিনীর ও বাণিজ্যাদির দ্বারা উন্নতি হওয়ার গল্প। এইরূপ কিংবদন্তী—পূর্ব্বকালে এই নগরে ৭০০০ ঘর ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। তাঁহারা বাণিজ্যাদির দ্বারা বিশেষ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ক্রমশঃ সমুদ্র সলিল

---

* District Gazetteer—Midnapore—p. 220.

† মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

‡ Hamilton's East India Gazetteer, vol. II. p. 682.

¶ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

অপসারিত হইলে তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত যে একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রূপনারায়ণ নদের ভাঙ্গনে ও তমলুক সহরের নিকটবর্ত্তী শিমলা, নিমতোড়ী প্রভৃতি গ্রামে পুষ্করিণ্যাদি খননকালে দশ পনর ফিট মৃত্তিকার নিম্নে বহুসংখ্যক কূপ, অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট ভাগ, প্রাচান মুদ্রা, প্রস্তরমূর্ত্তি ও অর্ণবযানাদির কাষ্ঠাদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক। তবে এক্ষণে গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি প্রাচীন নগরগুলিতে যেরূপ প্রস্তর ও ইষ্টকের ভগ্নাবশেষ স্তূপীকৃত দেখা যায়, তমলুকে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল। কারণ, তৎকালে যে সকল নগর নদীতীরে বা সাগরকূলে অবস্থিত ছিল, সে সকল নগরের ঘর-বাড়ী প্রায়ই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইত এবং পাহাড় বা উচ্চ স্থানে অবস্থিত গৃহাদি ইষ্টক বা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইত বলিয়া সে কালের লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। * বিশেষতঃ ঝটিকা ও জলপ্লাবন হইলে তাম্রলিপ্ত নগর যে সময় সময় ধৌত হইয়া যাইত, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ইউ-য়ান-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেও তাহা জানা যায়। এই কারণেই বোধ হয়, তাম্রলিপ্তবাসিগণ তৎকালে ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

বহু শত বৎসরের বহু শত কারণপরম্পরায় হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা আজ স্বপ্ন-কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল—যে দিন বাঙ্গালীর পোতারোহণ-কোলাহলে তাম্রলিপ্তের লবণাম্বুবেলা নিয়ত কলকলায়মান রহিত। বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত কত দেশের

* Mc' rindles' Ancient India, pp. 68, 204.

রত্ন ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তই তখন পূর্ব্ব-ভারতের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। * এই বন্দরেই তখন বাণিজ্য-পোত ও রণতরী-সমূহ নির্ম্মিত হইত এবং এই বন্দর হইতেই বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান-সমূহ মন্দ-পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য লইয়া দেশবিদেশে যাতায়াত করিত। তখন অনন্ত নীল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে তাম্রলিপ্তের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত আর সেই তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালীর বাণিজ্যপোত কত দেশের রত্ন-ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায় শত সৌধ-চূড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। কিন্তু এখন আর তাম্রলিপ্তের সে অনন্ত নীল জলরাশি নাই, সে বাণিজ্যপোত নাই, আর বাঙ্গালীর পোতারোহণের সে কলকলায়মান কোলাহলও নাই! কালচক্রে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বহু-সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগর এক্ষণে একটি ক্ষুদ্র উপনগরে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্রকায় রূপনারায়ণ নদ অব্যক্ত ভাষায় কুলু-কুলু স্বরে সেই অতীত গৌরব-কাহিনী গাহিতে গাহিতে তমলুকের পাদমূল ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। যে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া জগদ্বিখ্যাত বাবিলন, ট্রয় প্রভৃতি উন্নতিশালী নগর সকল এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যে সর্ব্বগ্রাসী কালের বশবর্ত্তী হইয়া বিখ্যাত গৌড়, পাণ্ডুয়া প্রভৃতির গৌরব-সূর্য্য অস্তাচলে চির-নিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত-রাজ্যও অব্যাহতিলাভে সমর্থ হয় নাই।

---

* Indian Shipping, p. 161.

দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির—কর্ণগড়

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দু-রাজত্ব—উৎকল-রাজ্য।

কলিঙ্গ বা উৎকল-রাজ্য।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এই জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ যৎকালে সুহ্ম বা তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তৎকালে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ কলিঙ্গ বা উৎকলের অন্তর্ভূত থাকে। যখন যে রাজা বা রাজবংশ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তখন সেই রাজা বা রাজবংশ ঐ প্রদেশের উপরেও আধিপত্য করিতেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কাল হইতেই উৎকল বা কলিঙ্গে হিন্দুদিগের আধিপত্য ছিল। বৌদ্ধ-যুগও উৎকলের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। উৎকলের গিরিগাত্রে খোদিত লিপিতে, কারুকার্য্যখচিত বিভিন্ন আকারের শত শত গুহায়, মন্দিরে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডে সে পরিচয় পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলায় বুদ্ধ-দন্ত।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত তাম্রলিপ্ত নগর হইতে সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ দাঠাবংশ হইতে জানা যায় যে, ক্ষেম-নামা বুদ্ধ-শিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দন্তটি কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত উহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণ-মণ্ডিত

করিয়া দেন। যে নগরে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দন্তপুর বা দন্তপুরী নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুহশিব বা শিবগুহ নামে একজন রাজা ছিলেন। শিবগুহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু একদিন দন্তপুর নগরের দন্তোৎসব দেখিয়া, তিনি মুগ্ধ হইয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলিপুত্রাধিপতির নিকটে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, তিনি বুদ্ধদন্ত সহ শিবগুহকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চিত্তযান-নামক এক সামন্ত-নরপতিকে প্রেরণ করেন। পাটলিপুত্রে দন্তটি আনীত হইলে সেখানে বহু অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটিতে থাকে। পাটলিপুত্রাধিপতি তাহা দেখিয়া বুদ্ধদন্তের ভক্ত হইয়া পড়েন। শিবগুহ দন্তটি সহ দন্তপুরে প্রেরিত হন। পাটলিপুত্রাধিপতির মৃত্যুর পরে ক্ষীরধার-নামক পার্শ্ববর্ত্তী এক নৃপতির জামাতা অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে শিবগুহের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবগুহ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার জামাতা উজ্জয়িনী-রাজকুমার রাজকন্যা হেমকলা সহ ছদ্মবেশে সেই পবিত্র দন্তটি লইয়া তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপস্থিত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহলে গমন করেন। সিংহলাধিপতি মেঘবাহন তাঁহাদিগের নিকট হইতে দন্তটি সাদরে গ্রহণ করিয়া "দেবানম পিয়" তিষ্য নির্ম্মিত ধর্ম্ম-মন্দিরে রক্ষা করেন। উহা তদবধি সিংহলে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সিংহলে মহাসমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। *

উক্ত দন্তপুর নগরের বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় লইয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের

* বিশ্বকোষ—৮ম ভাগ—পৃঃ ৩০৪।

মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কানিংহাম সাহেব রোমক পণ্ডিত প্লিনীর ভারতীয় স্থান-সমূহের নির্দ্দেশকালে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্য কলিঙ্গ অন্তরীপ হইতে দন্তপুর নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ কলিঙ্গ অন্তরীপ বর্ত্তমান করিঙ্গপত্তনের নিকট এবং দন্তপুর নগর প্লিনীর মতে গঙ্গার মোহানা হইতে ৫৭৪ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রী নগরের দূরতা গঙ্গার মোহানা হইতে প্রায় ঐ পরিমাণ হইবে। এই কারণে কানিংহাম সাহেবের মতে রাজমাহেন্দ্রী প্লিনীর কথিত দন্তপুর নগর। তিনি প্রমাণ-স্বরূপ বলেন যে, বর্ত্তমান করিঙ্গপত্তন হইতে রাজমাহেন্দ্রী বা প্রাচীন দন্তপুরের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল। * ফারগুশন সাহেবের মতে এখনকার পুরী নগর প্রাচীন দন্তপুর। পুরীতে জগন্নাথ-দেবের মন্দির যে বেদীবৎ স্থানের উপর নির্ম্মিত, তাঁহার মতে উহা বৌদ্ধদিগের দহগবের ন্যায় এবং উহার গঠন-প্রণালীও তদ্রূপ। তিনি বলেন, জগন্নাথ-দেবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটিই প্রাচীন দন্তমন্দির। হাণ্টার সাহেবও ঐ মতাবলম্বী। † আমাদের দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গ-নগরীতে প্রথম বুদ্ধ-দন্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তৎপরে পিপ্লির নিকট একস্থানে মন্দির নির্ম্মিত করিয়া তন্মধ্যে দন্তটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতন নামক স্থানটিই প্রাচীন দন্তপুর নগর। ‡ প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও ঐ কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজমাহেন্দ্রী বা পুরী দন্তপুর হইতে পারে না। ¶

দন্তপুর বা দাঁতন নগর।

---

* Ancient Geography of India, p. 518

† Hunter's Orissa.

‡ Antiquitties of Orissa, vol. II. pp. 106-107.

¶ বিশ্বকোষ—৮ম ভাগ—পৃঃ ৩০৫।

দাঠাবংশের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। সে সময় পুরীও একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন যখন পুরীতে আসেন, তখনও পুরী একটি বৃহৎ বন্দর। পুরী যদি দন্তপুর হইত, তাহা হইলে শিবগুহের জামাতা সেই স্থান হইতেই পোতারোহণ করিয়া সিংহল-যাত্রা করিতে পারিতেন, তাঁহাকে বহু-দূরবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসিতে হইত না। রাজমাহেন্দ্রী হইতে সিংহল-যাত্রা করিতে গেলেও তাম্রলিপ্ত অপেক্ষা পুরী-বন্দরই অনেক নিকটবর্ত্তী ছিল। দাঁতন হইতে তাম্রলিপ্তের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ ষাট মাইল; কিন্তু পুরীর দূরত্ব প্রায় তিন শত মাইল। রাজমাহেন্দ্রী আরও অনেক দূরে অবস্থিত। অধিকন্তু, দাঁতনের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। দাঁতন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে পুষ্করিণ্যাদি খননকালে মৃত্তিকার নিম্নে প্রস্তর-নির্ম্মিত কূপ ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশিষ্ট যাহা পাওয়া যায়, তাহাই উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক। * দাঁতনের নিকটবর্ত্তী সাতদ্দোলা ও মোগলমারী গ্রামে রাজঘাট-রাস্তা নির্ম্মাণ-কালে অনেক সুবৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সকল ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে তথায় একটি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। কালবশে তৎসমুদায় করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। ঐ স্থানের প্রাচীন ভূগর্ভ রীতিমত খনিত ও উদ্ঘাটিত হইলে হয় ত অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি-রাশি আবিষ্কৃত হইতে পারে। †

---

* List of Ancient Monuments in Bengal, p. 30.

† "On the occasion of excavating earth to get out bricks and stones for the use of Rajghat Road under construction several mag-

দাঠাবংশের বিবরণে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ কলিঙ্গাধিপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, পাটলিপুত্রাধিপতি তাঁহাকে লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, সে সময় শিবগুহের রাজ্য পাটলিপুত্রাধিপতির সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে সমুদ্রগুপ্ত মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। * সম্ভবতঃ এই মগধ-সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের সময়েই শিবগুহ পাটলিপুত্রে নীত হইয়াছিলেন।

উৎকলে সমুদ্রগুপ্ত।

সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ জয় করিতে যাত্রা করিয়া পথে মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের দুই জন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ-কোশলরাজ মহেন্দ্র ও দ্বিতীয় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ। ইহার পর তিনি উৎকল বা কলিঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। † প্রাচীন দন্ত-

বাগভূম ও ব্যাঘ্ররাজ।

---

nificent remains of old buildings have been discovered at Satadaulla and Mogalmari and bricks and stones, it is estemated, have been dug out numbering about 26 lacks and some crores yet lie buried under the ground."

"From these it appears that the above place were once the residence of the ancient Rajas and exceedingly populous."

Harrison's Report on the Archœlogy of the District of Midnapore, No. 207 dated the 20th. Augt. 1873.

* Fleets' Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. III. p. 6-8.

† বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১ম ভাগ—পৃঃ ৪১।

পুর বা আধুনিক দাঁতন পরগণার উত্তরে অবস্থিত কেশিয়াড়ি, গগনেশ্বর প্রভৃতি পরগণা পুরাতন কাগজপত্রে 'বাগভূম' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি—প্রাচীনকালে ঐ প্রদেশ বাগ-নামক জনৈক অনার্য্য-জাতীয় রাজার অধিকৃত ছিল। অদ্যাপি ঐ প্রদেশের স্থানে স্থানে কয়েকটি পুরাতন পুষ্করিণী বাগবংশীয় রাজাদের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বাগভূমের সহিত ব্যাঘ্ররাজের অধিকৃত ভূভাগের অবস্থানের ঐক্য দেখিয়া মনে হয়, খোদিত লিপিতে উল্লিখিত ব্যাঘ্ররাজ ও বাগভূমের বাগরাজা একই ব্যক্তি ছিলেন। বাগভূম-প্রদেশের স্থানে স্থানে এখনও নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান। প্রাচীনকালে মগধ হইতে উৎকল-গমনের পথটি এই বাগভূম-প্রদেশের মধ্য দিয়া গিয়াছিল ; এখনও তাহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

উৎকলের কেশরিবংশ।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, উড়িষ্যায় শৈব-ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শৈবধর্ম্মাবলম্বী কেশরিবংশ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, তাঁহারা তাঁহাদের রাজধানী ভুবনেশ্বর বা একাম্রকাননকে প্রকৃত শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তথায় কোটী বা ঊনকোটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অদ্যাপি যে সকল প্রাচীন শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই যে ঐ কেশরিবংশীয়দিগের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। কেশরিবংশের অধঃপতনের পর উৎকলে গঙ্গবংশের অধিকার আরম্ভ হয়। তবে কেশরিবংশের রাজত্বের শেষভাগে তাঁহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া উৎকলের সীমান্তে স্থানে স্থানে কয়েকটি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের পূর্ব্বকথিত দণ্ডভুক্তি রাজ্যটি অন্যতম।

তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ যুদ্ধে দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। * 'ভুক্তি'-অন্ত প্রদেশের নাম গৌড়দেশেই ছিল এবং পাল-রাজগণের সময়েই এরূপ নামের বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, তীরভুক্তি, শ্রীনগরভুক্তি প্রভৃতি প্রদেশের নামকরণ ঐ সময়েই হয়। কিন্তু উৎকলে হিন্দু-রাজত্ব-কালে ভুক্তিকে 'দণ্ডপাঠ' বলিত। † উৎকলের রাজস্ব-বিভাগে দণ্ড-ভুক্তি নাম নাই। টানিয়া দণ্ডপাঠের মধ্যে দাঁতনিয়া চোর নামে একটি বিশি ছিল। উৎকলের অন্তর্ভূত প্রদেশের 'ভুক্তি'-অন্ত নাম দেখিয়া মনে হয়, কেশরিবংশের অধঃপতনের সময়ে বঙ্গের পালরাজগণের সামন্ত অথবা অনুগত রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক উৎকলের প্রান্তবর্ত্তী ঐ প্রদেশটি অধিকৃত হইলে পর উহার ঐরূপ নাম রক্ষিত হইয়াছিল। দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় নাই। তবে ঐ সময়েই ধর্ম্মপাল-নামক একজন রাজার নাম অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে।

দণ্ডভুক্তি-রাজ্য।

মাণিক গাঙ্গুলা, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ম্মমঙ্গল-নামক কাব্যে ধর্ম্মপাল রাজার নাম আছে। এই ধর্ম্মপাল যখন 'গৌড়ের সিংহাসনে' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন কর্ণসেন-নামক জনৈক রাজা সেনভূম ও গোপভূমে রাজত্ব করিতেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ

রাজা ধর্ম্মপাল।

* গৌড়-রাজমালা পৃঃ ৩৯। Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 232.

† "It (*Dandapata*) covered generally a considerable tract of the country and corresponded to the Sanscrit *Bhukti* used tn Bengal and Mithila,"
J. A. S. B., (The Geography of Orissa), Vol. XII, 1916, p, 30.

ও কর্ণসেনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পুত্র-শোকে কর্ণসেনের রাণী বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্ম্মপালের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ধর্ম্মপাল ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী তৎকালে বিবাহ-যোগ্যা ছিলেন, ধর্ম্মপাল তাঁহারই সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের মধ্যে ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ময়নাগড় এই মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই অবস্থিত। রঞ্জাবতীর গর্ভে কর্ণসেনের লাউসেন-নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার হস্তেই ইছাই ঘোষ নিহত হন। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে।

আমরা দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল ও ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপালকে একই ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করি। রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নির্দ্ধারণমতে খৃষ্টীয় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনেরও স্থিতি কাল নিরূপিত হয়। ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতা ধর্ম্মপালকে 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় গৌড়রাজ্যে পালরাজগণ প্রতি-ষ্ঠিত থাকিলেও ধর্ম্মপাল নামে কোন রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধি-ষ্ঠিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে, ধর্ম্মপাল নামে পালবংশীয় যে রাজা গৌড়-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে ও নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন; দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নহে। * গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম রন্নাদেবী;

* গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৪।

ত্রিভুবনপাল-নামক তাঁহার আর এক পুত্রও ছিলেন। * কিন্তু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলানুসারে তাঁহার পত্নীর নাম বল্লভা; ধর্ম্মপাল অপুত্রক ছিলেন। নির্ব্বাসিতা বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রন্থমধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। † ঐতিহাসিক রাখাল বাবু ঘনরামের ঐ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। সমুদ্রের বংশে বা সমুদ্রের কূলে বঙ্গের পাল-রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছিল ব'লিয়া একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; তিনি সমুদ্রের ঔরসে রাণী বল্লভার গর্ভে অজ্ঞাত-নামা পুত্রের উৎপত্তি দেখিয়া মনে করেন, ঘনরামের সময়েও সে কাহিনী প্রচলিত ছিল, ধর্ম্মমঙ্গলে ঘনরাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ‡ অধিকন্তু ইছাই ঘোষ কর্ত্তৃক গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল যে কোন দিন পরাজিত হইয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন ঐতি-হাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবও নয়।

আমরা অনুমান করি, ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপাল 'গৌড়েশ্বর' নহেন, তিনি কোন প্রাদেশিক রাজা ছিলেন। মিথিলাধিপ শিবসিংহ মৈথিল-কবিদিগের নিকট যেরূপ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম্মপালও তাঁহার দেশীয় কবিগণ কর্ত্তৃক 'গৌড়েশ্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। উত্তর-বঙ্গে রঙ্গপুর অঞ্চলেও ধর্ম্মপাল-নামক একটি প্রাদেশিক রাজার নাম শ্রুতিগোচর হয়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরাদির ধ্বংসাবশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, রঙ্গপুর ও দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল একই

---

* গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্র—৪৩, ২৬।

† ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল—"কাওুর যাত্রা পালা"।

‡ বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ—পৃঃ ১৪৪, ১৪৫।

ব্যক্তি ছিলেন। যে সময় উত্তর-রাঢ় ও বরেন্দ্রে বিখ্যাত নরপতি মহী-পালদেব সৌভাগ্য অর্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারই কোন আত্মীয় এই ধর্ম্মপালও পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তথায় বেশী দিন স্থায়ী হইতে হয় নাই। রাজা মাণিক-চন্দ্রের পত্নী রাণী ময়নাবতী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি মেদিনীপুর জেলায় একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। * কিন্তু রাখাল বাবু লিখিয়াছেন যে, অদ্যাপি এমন কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা নগেন্দ্র বাবুর উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। দণ্ডভুক্তির অধি-পতি ধর্ম্মপালের সহিত মহীপালদেবের সম্বন্ধসূচক কোন প্রমাণও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে তিনি দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপালকে পাল-রাজবংশসম্ভূত বলিয়াই মনে করেন। † আমরাও মনে করি, পালরাজগণের সহিত দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপালের কিছু না কিছু সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কের বলেই তিনি এতদ্দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, কর্ণসেন ধর্ম্মপালের মহাসামন্ত ছিলেন। ইছাই ঘোষ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলে, ধর্ম্মপাল তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। দণ্ড-ভুক্তি হইতে ময়নাগড়ের দূরত্ব বেশী নয়, উভয় স্থানই একই জেলার মধ্যে অবস্থিত। এরূপ অবস্থায় কর্ণসেনের পক্ষে উত্তর-বঙ্গের এক প্রাদে-শিক রাজার সহিত কুটুম্বিতা করিয়া সুদূরবর্ত্তী একজন সামন্ত-রাজকে পরাজয় করিবার জন্য আহ্বান করিয়া আনা অপেক্ষা স্বীয় সেনভূম বা গোপভূম রাজ্যের নিকটবর্ত্তী দণ্ডভুক্তির অধিপতির সাহায্যগ্রহণ করাই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—(রাজন্য-কাণ্ড)—পৃঃ ১৭৯-১৮০।
† বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ—পৃঃ ২২১, ২৬১।

অধিকতর সম্ভবপর। এই সকল কারণে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ধর্ম্মমঙ্গলে উল্লিখিত রাজা ধর্ম্মপাল গৌড়েশ্বর নহেন, তিনি কোন প্রাদেশিক রাজা ছিলেন। অধিকন্তু ঐ সময়ে উক্ত নামে যে দুই জন প্রাদেশিক রাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে দণ্ডভুক্তির রাজার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর একতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মপাল ও দণ্ডভুক্তির ধর্ম্মপাল একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই তিন ধর্ম্মপালকে একই ব্যক্তি বলা যাইতে পারে।

রাজা লাউসেন।

কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন বিপুল-বিক্রমশালী বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অজয় নদের তীরস্থ ঢেকুর-রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। ময়নাগড়ে রাজা লাউসেনের কীর্ত্তি-নিদর্শন অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তিনি ময়নাগড়ের চতুর্দ্দিকে শত-বিঘা-ব্যাপী যে গড়খাত করিয়াছিলেন, উহার মধ্যে তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। * রঙ্কিণী-নাম্নী কালী ও লোকেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। বৃন্দাবনচকে যে ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তাহাও লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। † পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজাদের নামের মধ্যে লাউসেনের নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক লাউসেনের অস্তিত্বেই সন্দিহান।

* District Gazetteer—Midnapore—p. 208.

† Hunter's Annals of Rural Bengal.

লাউসেনের প্রাচীন আখ্যায়িকার পরবর্ত্তিকালে অনেক বিকৃতি ঘটিলেও এবং ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত লাউসেনের কীর্ত্তিকাহিনী কবি-কল্পনায় জড়িত হইলেও মূলতঃ তাহাদের ঐতিহাসিকত্বে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে বহু প্রাচীন গ্রন্থেও লবসেন বা লাউসেনের নাম পাইয়াছেন। * সম্প্রতি ঢেকুরী গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার দ্বারাও ইছাই ঘোষের ঐতিহাসিকত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। †

ধর্ম্মমঙ্গল ও ধর্ম্মপূজা।

লাউসেনের যত্নেই সাধারণের উপযোগী বৌদ্ধধর্ম্মের একাঙ্গ ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি প্রচারিত হয়। রমাই পণ্ডিত সে পদ্ধতির প্রথম প্রচারক। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমাদের দেশের ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর-মাত্র। বুদ্ধদেবই পশ্চিম-বঙ্গে ধর্ম্ম নামে পূজা পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের উপর ধর্ম্মদেবের পৌরাণিক আখ্যান প্রতিষ্ঠিত। হাড়ী ও ডোম জাতীয় আচার্য্যগণই প্রথমে ধর্ম্মের পূজক ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা দেবতার পূজা ও পদ্ধতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজেরা পুরোহিত হইয়াছেন। ময়নাগড়ে ও তন্নিটবর্ত্তী অনেক স্থানে এখনও ধর্ম্মপূজার প্রচলন আছে। ধর্ম্মপূজার প্রচলন জন্যই এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে 'ধর্ম্মমঙ্গল' নামক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল-গুলি বৌদ্ধরাজা ও ভিক্ষুগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে প্রথমতঃ রচিত হইলেও পরে ব্রাহ্মণগণের হস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও পরাভূত হইলে, ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিও দেবলীলা-জ্ঞাপক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—(রাজন্যকাণ্ড)—পৃঃ ৪৭৮।

† বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন—Introduction p. 37.

এখনও উহার মধ্যে ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্ম্মের লুক্কায়িত ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

রাজেন্দ্র চোলের হস্তে ধর্ম্মপালের ধ্বংসের পর সম্ভবতঃ সেই বংশীয় অন্য কেহ দণ্ডভুক্তির রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের চিত্রসেন-নামক এক পুত্রের নাম দৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে এই সেনবংশেরও অন্য কোন রাজার নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়ের প্রায় ৭০ বৎসর পরে জয়সিংহ নামে দণ্ডভুক্তির আর একজন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। পালবংশের অন্যতম অধীশ্বর রাজা রামপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১০৬:-১১০৩) বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রাজা রামপালের সামন্ত ঐ দণ্ডভুক্তিরাজ জয়সিংহের নাম আছে। উক্ত গ্রন্থে রাজা জয়সিংহ "দণ্ডভুক্তি-ভূপতিরদ্ভুত-প্রভাকর-কমল-মুকুল - তুলিতোৎকলেশ - কর্ণকেশরি-সরিবদ্বলভঃ কুম্ভসম্ভবো" উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। † অগস্ত্য যেমন সিন্ধুকে গ্রাস করিয়াছিলেন, জয়সিংহও তদ্রূপ উৎকলদেশের অধিপতি কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজা জয়সিংহ।

উৎকলের ইতিহাসে কর্ণকেশরী নামে কোন রাজার নাম নাই; কোনও খোদিত লিপিতেও অদ্যাবধি কর্ণকেশরী নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। ‡ এই জন্য বলা যাইতে পারে, কর্ণকেশরী সমগ্র উৎকলের রাজা ছিলেন না, তিনি উৎকলের অন্তর্গত কোন প্রদেশের অধিপতি

রাজা কর্ণকেশরী ও রাজা বিক্রমকেশরী।

Sastri's 'Discovery of Living Budhisim in Bengal''—Census Report of Bengal, 1901, pt I. pp. 202-204.

† Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 36.

‡ বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৯।

ছিলেন। রাজা রামপালের সামন্ত জয়সিংহের পক্ষে ঐরূপ কোন রাজাকে পরাজয় করাই সম্ভবপর। রাজা কর্ণকেশরী কোন্ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা সঠিক বলা যায় না। দণ্ডভুক্তি-প্রদেশে বিক্রম-কেশরী নামে এক রাজার নাম শ্রুত হওয়া যায়। বর্ত্তমান দাঁতন নগরীর দুই মাইল উত্তরে এক্ষণে মোগলমারী নামে যে গ্রামটি পরিচিত, উহার প্রাচীন নাম অমরাবতীপুরী। জনশ্রুতি, ঐ স্থানে বিক্রমকেশরীর রাজধানী ছিল। * বিক্রমকেশরীর কন্যা সখীসেনা বা শশিসেনা ও জামাতা অহিমাণিক সম্বন্ধে অদ্যাপি এ প্রদেশে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান-নিবাসী কবি ফকিররাম 'সখীসেনা'-নামক কাব্যে বিক্রমকেশরীর কন্যা ও জামাতার প্রণয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। † দেখা যায়, ধর্ম্মপাল ও জয়সিংহ যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই প্রদেশে বিক্রমকেশরী নামে একজন রাজাও এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমাদের অনুমান, রাজা ধর্ম্মপাল রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর উৎকলের কেশরি-বংশীয় বিক্রমকেশরী অথবা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ পুনরায় ঐ প্রদেশ হস্তগত করিয়া থাকিবেন। রাজা কর্ণকেশরীও সম্ভবতঃ সেই বংশ-সম্ভূত।

ধর্ম্মপাল ঐ প্রদেশটি অধিকার করিয়া লইয়া পাল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কিছুকাল পরেই বরেন্দ্রভূমের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া পালবংশীয় নরপতি মহী-পালকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে। ঐ বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত্ত-

---

* Harrison's Report on the Archaelogy of Midnapore, 1872-73.

† বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম ভাগ, Introduction, p.

জাতীয় দিব্বোক, তাঁহার ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম যথাক্রমে বরেন্দ্রভূমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। * ঐ সময়ে দণ্ডভুক্তি প্রদেশটিও পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় উৎকল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত হইয়া থাকিবে। পাল-রাজগণের তখন এরূপ ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁহারা উহা পুনরধিকার করিতে পারেন। উত্তরকালে রাজা রামপাল ঐ কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধন করিলে পর তাঁহারই সামন্ত জয়সিংহ স্বাধীনতাবলম্বী রাজা কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়া পাল-বংশের সামন্তরূপে দণ্ডভুক্তি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন।

মেদিনীপুরের কর্ণগড়।

এই জেলার মধ্যে বর্ত্তমান মেদিনীপুর নগরীর উত্তরে তিন ক্রোশ স্থানমধ্যে কর্ণগড় নামে একটি প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ গড়টি মেদিনীপুর নগরীর দুই ক্রোশ উত্তরে আরম্ভ হইয়া এক ক্রোশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। ঐ এক ক্রোশ স্থানের মধ্যে রাজবাটী, সৈন্যশালা, দেব-দেবীর মন্দির, দীর্ঘিকা প্রভৃতি সকলই বিরাজ করিত। গড়ের দক্ষিণাংশে অনাদিলিঙ্গ ভগবান্ দণ্ডেশ্বর ও ভগবতী মহামায়ার দুইটি মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। ঐ মহামায়া-মন্দিরের গঠন প্রণালী ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ গড় ও মন্দিরাদি কবে এবং কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। সাধারণে উহাকে মহাভারতোক্ত 'অঙ্গাধিপতি কর্ণ-রাজার গড়' বলিয়া বিশ্বাস করে। পঞ্জিকায় লিখিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহের তালিকাতেও উহার ঐরূপ পরিচয় আছে। কিন্তু অঙ্গাধিপতি কর্ণ-রাজার সহিত সেগুলির যে কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ষোড়শ

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথমভাগ—পৃঃ ২৩২-২৩৩।

শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে ঐ গড়ের নামানুসারে কর্ণগড়-রাজবংশ নামে একটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ঐ গড়-মন্দিরাদি তাঁহাদের নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, উক্ত রাজবংশ এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদেও কর্ণগড় বা কর্ণদুর্গের অস্তিত্ব ছিল। * অধিকন্তু, মন্দিরাদির গঠন-প্রণালীও উহাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করে। মহামায়ার মন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখিলে মনে হয়, উহা উৎকলের প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও মেদিনীপুর সাহিত্য-পারিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে মেদিনীপুরে আসিয়া ঐ মন্দিরটি দর্শন পূর্ব্বক উহাকে উৎকল-শিল্প বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ মন্দিরই কেশরিবংশের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উৎকলের ইতিহাসে দেখা যায়, শিল্পরম্য সৌধমন্দিরমালা-নির্ম্মাণে কেশরিবংশীয়গণের একটা পুরুষানুক্রমিক আগ্রহ ছিল। আমাদের অনুমান, সেই আগ্রহের ফলেই সেই বংশীয় রাজা কর্ণকেশরী এই প্রদেশের সীমান্তে ঐ গড়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

রাজা জয়সিংহের বা তদ্বংশীয় কোন রাজার পরে এই প্রদেশে করবংশীয় রাজাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় শিখরভূমির রাজা রামচন্দ্র-কৃত পুঁথিখানি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রাণকর-নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র 'মেদিনীকোষ'-রচয়িতা মেদিনীকর কর্ত্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত

* গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—২য় ভাগ, পৃঃ ৪২।

হইয়াছিল। মেদিনীপুর নগরের নামকরণ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। স্বনামধন্য আভিধানিক স্বীয় পরিচয়-স্থলে নিজ-গ্রন্থেও পিতৃ-নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনী-কোষে রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধ ও গোবর্দ্ধনের নাম পাওয়া যায় এবং রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান পুত্রগণের সভাসদ্ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খৃঃ অব্দে অমরকোষের যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মেদিনীকোষ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন দেখা যায়। এই কারণে শাস্ত্রী মহাশয় ১২০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব হইতে ১৪৩১ খৃঃ অব্দের মধ্যে মেদিনীকরের গ্রন্থ-রচনার সময় নির্দ্দেশ করেন। * ইহার মধ্য হইতেও আবার কতক সময় বাদ দেওয়া যাইতে পারে। উৎকলের মাদ্‌লা পাঞ্জীতে উল্লিখিত অনঙ্গ ভীমদেবের রাজ্যকালের বিবরণ-প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অনঙ্গ ভীমদেব তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তরে কাঁসবাস নদী হইতে বড়দনাই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি ১২৩৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরে, ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গবংশীয় যে কয়জন রাজা উৎকলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের অধিকার স্থাপিত হইলেও তাঁহারা কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উৎকলের কোন অংশই অধিকার করিতে পারেন নাই। এমত অবস্থায় করবংশও যে এ প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। উৎকলাধিপতি চতুর্থ নরসিংহ দেবের একখানি তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ১৩৯৭ খৃঃ অব্দে ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি এই জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর

রাজা প্রাণকর ও মেদিনীকর।

* মেদিনীপুর সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

(আধুনিক নারায়ণগড়) কটকে অবস্থানকালে উক্ত শাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। * নারায়ণপুর পূর্ব্বোক্ত দণ্ডভুক্তি প্রদেশের অন্তর্গত এবং মেদিনীপুর সহর হইতে মাত্র আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তাম্র-শাসনে নারায়ণপুর 'কটক' নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎকালে রাজ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলি কটক নামে পরিচিত ছিল। ঐ সকল স্থানে এক একটি রাজপ্রাসাদ থাকিত। রাজা সময় সময় তথায় আসিয়া রাজকার্য্যাদি করিতেন। † এমত অবস্থায় ইহারই আট ক্রোশ দূরে যে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকিতে পারে, ইহা বোধ হয় না। সুতরাং ১২৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মেদিনীকরের সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি বিহার রিসার্চ্চ সোসাইটির পত্রিকায় করবংশের একখানি তাম্র-লিপি বাহির হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, করবংশীয় রাজারা এক সময়ে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কেশরিবংশ ধ্বংস হইলে গচাড়, উমট্, কর প্রভৃতি বংশের কিছুদিনের জন্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে গঙ্গবংশের হস্তে ঐ সকল বংশের ধ্বংস হয়। সম্ভবতঃ মূলবংশ ধ্বংস হইলে সেই বংশীয় কেহ উত্তরাঞ্চলে আসিয়া জয়সিংহ-বংশের হস্ত হইতে এ প্রদেশের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পরে অনঙ্গভীম-দেবের হস্তেই আবার ঐ করবংশের নাশ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ কর-বংশকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, করেরা বৈদ্য। উইলসন সাহেবের মতে করেরা কায়স্থ। ‡ আমরা বলি, করেরা তাম্বূলীও হইতে পারে। এ দেশে এবং বালেশ্বর জেলায় নানা স্থানে এখনও 'কর' উপাধিধারী অনেক সঙ্গতি-

---

* J. A. S. B., 1895, p. 152.

† J. A. S. B. Geography of Orissa vol. XII. 1916. No I. P. 30.

‡ বৈদ্যজাতির ইতিহাস, বসন্তকুমার সেন গুপ্ত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৬।

পন্ন তাম্বূলীর বাস আছে। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে ঐ প্রদেশে বাস করিতেছেন বলিয়া থাকেন।

অনঙ্গভীম দেবের সময়েই বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত ভূভাগ গঙ্গবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়েই তাম্রলিপ্ত-রাজ্যের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু গঙ্গবংশীয় রাজগণ তমলুকের কৈবর্ত্ত-রাজবংশকে উৎখাত করেন নাই; তাঁহারা গঙ্গবংশের সামন্তরূপেই উক্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার অন্য অংশ তৎকালে মালঝিটা, নারায়ণপুর, জৌলিতি, নইগাঁ, টানিয়া ও ভঞ্জভূম-বারিপাদা নামে যে ছয়টি দণ্ডপাটে বিভক্ত ছিল, সেই সকল দণ্ডপাটে এক এক জন রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন। তাঁহারা 'দেশাধিপতি' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের হস্তেই দণ্ডপাঠগুলির শাসন ও সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত থাকিত। এই প্রদেশের ঐরূপ কয়েকটি দেশাধিপতির নাম ও বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

গঙ্গবংশের রাজত্বে মেদিনীপুর জেলা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে চৈতন্যদেবের প্রিয়শিষ্য রামানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়েক মালঝিটা দণ্ডপাঠে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক সময়ে রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিল্য করায় উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র দেব তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। পরে চৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যস্থতায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হয় এবং তিনি পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন। * সাধারণতঃ দেখা যায়, তৎকালে উৎকলের দণ্ডপাঠগুলিতে দেশাধিপতিগণ যোগ্যতানুসারে

মালঝিটা দণ্ডপাঠ ও গোপীনাথ পট্টনায়েক।

* চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ, কালিকা-প্রেস সং, পৃঃ ৩৩৭-৩৪০।

পুরুষানুক্রমেই নিয়োজিত হইতেন। গোপীনাথ পট্টনায়েকের পূর্ব্ব-পুরুষগণও ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে হিজলীরাজ্য-প্রসঙ্গে সে বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে।

নারায়ণপুর দণ্ডপাঠ ও গন্ধর্ব্ব পাল।

নারায়ণপুর ও নারায়ণগড় একই স্থান, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ প্রদেশে 'নারায়ণগড় রাজবংশ' নামে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস ছিল। বিগত শতাব্দীতে ঐ বংশের লোপ হইয়াছে। ঐ বংশের কুলাখ্যান পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে ছাব্বিশ জনের নাম আছে। প্রথম ব্যক্তি গন্ধর্ব্ব পাল ৬৭১ বঙ্গাব্দে (১২৬৪ খৃঃ অঃ) উৎকলাধিপতি কর্ত্তৃক 'শ্রীচন্দন' উপাধিতে ভূষিত হইয়া সেই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উত্তরপুরুষগণও সেই প্রদেশে আধিপত্য করেন। মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ঐ বংশ নারায়ণগড়ের জমিদার নামে পরিচিত ছিলেন।

জৌলিতি দণ্ডপাঠ ও কালিন্দীরাম সামন্ত।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের অনুমান, এখনকার সবঙ্গ থানার ভূভাগ লইয়াই সেকালে জৌলিতি দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল; সবঙ্গ, ময়না, বালিসীতা প্রভৃতি স্থান ঐ ভূভাগের অন্তর্ভূত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 'ময়নাগড়ের রাজবংশ' নামে একটি জমিদার-বংশ ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উহাঁদের কুলাখ্যান-পত্র হইতে জানা যায় যে, গোবর্দ্ধনানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ বালিসীতাগড়ে বাস করিতেন এবং তত্তৎস্থানের অধিপতিরূপে পরিচিত ছিলেন। উৎকলাধিপতি কর্ত্তৃক তাঁহারা 'সামন্ত' উপাধিতে ভূষিত হন। ঐ বংশের প্রথম সামন্তের নাম কালিন্দীরাম। তৎপরে যথাক্রমে

মুরলীধর, বৈষ্ণবচরণ, চৈতন্যচরণ ও নন্দীরাম সামন্তপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নন্দীরামের পুত্রই গোবর্দ্ধনানন্দ। গোবর্দ্ধনানন্দ বালিসীতা হইতে ময়নাগড়ে উঠিয়া যান ; দেখা যায়, ঐ সময় হইতেই এই বংশের 'রাজা' ও 'বাহুবলেন্দ্র' উপাধি হয়। আমরা মনে করি, এই সামন্ত-বংশই জৌলিতি দণ্ডপাঠের দেশাধিপতি ছিলেন এবং ঐ বালিসীতা ও জৌলিতি একই স্থান।

নইগাঁ দণ্ডপাঠ ও প্রতাপ ভঞ্জ।

পটাশপুর থানার মধ্যে প্রতাপভান নামক একটি পরগণা আছে। জনশ্রুতি, হিন্দুরাজত্বে ঐ স্থানে প্রতাপ ভঞ্জ নামক জনৈক রাজা উৎকলাধিপতির সামন্তরূপে রাজত্ব করিতেন। সেই বংশ বহুকাল ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা অমরসিংহ ঐ বংশের শেষ রাজা। কথিত আছে, মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি জনৈক মুসলমান সাধুর অবমাননা করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। রাজা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় বর্ত্তমান সময়ের অমর্শী পরগণার অন্তর্গত কশবা গ্রামের একটি সুগভীর কূপে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারেই উত্তরকালে প্রতাপভান ও অমর্শী পরগণার নামকরণ হয়। ঐ সকল স্থানের মধ্যে কাট্‌নাদিঘী, বেলদা, প্রতাপদিঘী, টিক্‌রাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি সুবৃহৎ প্রাচীন পুষ্করিণী ও কয়েকটি দেবালয়ের ভগ্নাবশিষ্ট দৃষ্ট হয়। সেগুলি ঐ বংশেরই কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এগরার প্রসিদ্ধ হটনগর মহাদেবের মন্দিরটিও উহাঁদের সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া থাকেন। ঐ প্রদেশে হাতীবেড়, ঘোড়াবসান নামে কয়েকখানি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি যে, সে সকল স্থানে ঐ বংশের হস্তিশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি সংস্থাপিত ছিল। এতদ্ব্যতীত ঐ বংশ সম্বন্ধে

আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আমাদের অনুমান, এগরা ও পটাশপুর থানার ভূভাগ লইয়াই নইগাঁ দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। সেই জন্য আমরা ইহাও অনুমান করি যে, ঐ বংশই তৎকালে উক্ত দণ্ডপাঠের অধিপতি ছিলেন।

টাঁনিয়া দণ্ডপাঠের কোন দেশাধিপতির নাম বা বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মাদলাপাঞ্জীতে দেখা যায় যে, তৎকালে টাঁনিয়া দণ্ডপাঠ ছয়টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিশি বা খণ্ডে খণ্ডপতি নামে এক এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং হিসাব-পরিদর্শনের জন্য 'বিশোই' বা 'ভূঁইমাল' নামে আর একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন। কোন কোনও দণ্ডপাঠে বিশিগুলি 'খণ্ড' বা 'চৌর' নামেও পরিচিত হইত। বিশি বা খণ্ডের আয়তন প্রায় পরবর্ত্তী কালের পরগণাগুলির আয়তনের অনুরূপ ছিল। বিশিগুলি আবার কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত থাকিত। সে কালে ঐ গ্রাম বা গাঁগুলিই দেশ-শাসন ও জমীজমা-পদ্ধতির মূল ভিত্তি ছিল। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া 'প্রধান', একজন 'ভোই' ও একজন 'দণ্ডআসি' থাকিত। 'প্রধান' গ্রামশাসন ও সংরক্ষণের ভার-প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। গ্রামবাসিগণ রাজার প্রাপ্য কর তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিত। 'ভোই' হিসাব পরিদর্শন করিতেন এবং 'দণ্ডআসি'র কার্য্য অনেকটা বর্ত্তমান-কালের গ্রাম্য চৌকীদারের কার্য্যের অনুরূপ ছিল। প্রধানেরা খণ্ড-পতির নিকট রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন, খণ্ডপতিরা দেশাধিপতিগণকে দিতেন এবং দেশাধিপতিগণ আবার উহা রাজ-সরকারে দাখিল করিতেন। এই প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপাধিধারী কয়েকটি প্রাচীন বংশের বাস আছে। তাঁহাদের ঐ সকল উপাধি দর্শন মনে হয়,

জলেশ্বর দণ্ডপাঠ ও বিশি বিভাগ।

হিন্দু-রাজত্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ সকল পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে সেই সকল পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সেই কারণে তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণও ঐ উপাধিগুলিতে ভূষিত হইয়া গিয়াছেন।

ভঞ্জভূম-বারিপাদা দণ্ডপাঠটি বহুদূর বিস্তৃত থাকিলেও উহার অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলাবৃত ছিল। এখনও ঐ প্রদেশে অনেক স্থানেই জঙ্গল বিদ্যমান আছে। মহাভারতীয় কালের বক রাজার বগড়ী-রাজ্য বা সমুদ্রগুপ্তের সময়ের মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজের রাজ্য ঐ প্রদেশেরই অন্তর্ভূত। ঐ প্রদেশের পূর্ব্বাংশেই কৃষ্ণভূমী বিদ্যমান এবং দেশাধিপতিগণ ঐ অংশেই আধিপত্য করিতেন। পশ্চিমাংশের স্থানে স্থানে জঙ্গলের মধ্যে অনার্য্য দলপতিগণ বাস করিত। ক্রমে ক্রমে আর্য্যজাতীয় পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা তাহাদের এক একটিকে পরাজিত করিয়া ঐ জঙ্গলময় প্রদেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা উৎকলাধিপতির বশ্যতা স্বীকার করিতেন। সময় সময় ঐ সকল রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বা আবার ক্ষমতাবৃদ্ধি করত অন্য রাজাদের উপর আধিপত্য করিতে দেখা যাইত। যতদিন পারিতেন, তিনি বা তাঁহার বংশধরেরা ঐরূপ ভাবেই রাজত্ব করিতেন; দুর্ব্বল হইলে অন্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন অথবা রাজ্যভ্রষ্ট হইতেন। তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের রাজ্যাধিকারের পরিচয় দিতে প্রায়ই কিছু থাকিত না। বশ্যতা স্বীকার করিলে উৎকলের রাজচক্রবর্ত্তিগণ ঐরূপ ক্ষমতাশালী রাজগণের উচ্ছেদসাধন করিতেন না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ঐরূপ একটি রাজবংশ এই দণ্ডপাঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভঞ্জভূম দণ্ডপাঠের রাজবংশ।

বীরসিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শকাব্দার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্দ্ধমান প্রদেশে দামোদর নদ-তীরে হেমসিংহ নামে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা বীরসিংহ পরাক্রমবলে তাম্রলিপ্ত, কর্ণদুর্গ ও বরদাভূমি অধিকার করিয়াছিলেন।* মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণে কিশমৎ পরগণার মধ্যে চাঙ্গুয়াল গ্রামে বীরসিংহের রাজধানী ছিল। বীরসিংহের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, সিংহদ্বার, সেনানিবাস ও পরিখার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। যে মৃত্তিকা-স্তরে ঐ সকল গৃহ-মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কাল-সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া তিন চারি হস্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা বীরসিংহ।

বীরসিংহের বংশে অভয়াসিংহ, কুমারসিংহ, জামদারসিংহ ও সুরথসিংহ নামে আরও চারি জন রাজার নাম পাওয়া যায়। রাজা অভয়াসিংহ শালবনী থানার অন্তর্গত সাত-পাটী নামক গ্রামের আট মাইল পশ্চিমে 'অভয়া-গড়' নামে একটি গড় প্রস্তুত করিয়া তথায় অভয়া-নাম্নী এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই গড়টি এখন বিজন অরণ্যে পরিণত। দেবী-মূর্ত্তিটি কর্ণ-গড়ের মহামায়ার মন্দিরে সমানীতা হইয়াছেন। রাজা কুমারসিংহ গদাপিয়াশাল গ্রামের নিকট 'কুমারগড়' নামে একটি গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার ভগ্নাবশেষও অদ্যাপি বিদ্যমান। রাজা জাম-দারসিংহের প্রতিষ্ঠিত জামদার-গড়টিও গদাপিয়াশাল গ্রামের নিকটেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গড়টির ভগ্নাবশেষ লইয়াই উত্তরকালে 'মেদিনী-

রাজা অভয়াসিংহ, কুমারসিংহ ও জাম-দারসিংহ।

* গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪২।

পুর জমিদারী কোম্পানী' তাঁহাদের গোনাপিয়াশালের কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জামদারসিংহের প্রতিষ্ঠিত জামদাগ্নী-মূর্ত্তি আজিও বিগুমান। নাড়াজোলাধিপতির ব্যয়ে এক্ষণে তাঁহার সেব-পূজা যথা-রীতি সম্পন্ন হইতেছে।

রাজা সুরথসিংহ বীরসিংহের বংশের শেষ রাজা। জনশ্রুতি, লক্ষ্মণসিংহ ও ভীম মহাপাত্র নামক তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী ও নারায়ণগড়ের পূর্ব্বোক্ত গন্ধর্ব্ব পালের কোন অধস্তন পুরুষ ষড়্যন্ত্র করিয়া রাজা সুরথসিংহকে হত্যা করত তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ তিন জনে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসিংহ ও ভীম মহাপাত্রের অধিকৃত ভূভাগই উত্তরকালে যথাক্রমে কর্ণগড়-রাজ্য ও বলরামপুর-রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। ঐ দুই বংশের কুলাখ্যান-পত্র হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐ দুইটি রাজবংশ এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে মনে হয়, যে সময়ে উৎকলের শেষ হিন্দু রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, সেই সময়েই সুরথসিংহকে হত্যা করিয়া ইহাঁরা তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। বলরামপুর পরগণার অন্তর্গত টাঙ্গাশোল নামক যে গ্রামে রাজা সুরথসিংহের হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথিত আছে, সুরথসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার সপ্তসংখ্য রাণী জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মৃত্যুকালে এই অভিসম্পাত করিয়া যান যে, তাঁহাদিগের পতিহন্তৃগণের বংশ অধস্তন সপ্তম পুরুষ পরেই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। পতিব্রতা ভামিনীগণের অভিসম্পাত কর্ণগড় ও বলরামপুর রাজবংশে সম্পূর্ণরূপে ফলিয়াছিল।

রাজা সুরথসিংহ।

নারায়ণগড় রাজবংশ ঠিক সপ্তম পুরুষ পরেই নির্ম্মূল না হইলেও উহার অধস্তন আরও কয়েক পুরুষ পরেই নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণগড় রাজবংশ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু জনশ্রুতি ঐরূপ। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টর বেলী সাহেবও তাঁহার স্মারক পুস্তকে ঐ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেলী সাহেব রাজা সুরথসিংহকে খয়রা-জাতীয় রাজা বলিয়াছেন। * খয়রা এক প্রকার জঙ্গলা জাতি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। কিন্তু ঐ রাজবংশের প্রাসাদ ও মন্দিরাদির লুপ্তাবশেষ ও সভ্যতার অন্যান্য নিদর্শনগুলি সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহারা কোন শ্রেষ্ঠজাতীয় সুসভ্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে বীরসিংহকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কর্ণগড় ও বলরামপুর রাজবংশের এবং পূর্ব্বোক্ত তমলুক, নারায়ণগড় ও ময়না রাজবংশের বিবরণ যথাস্থানে বিস্তারিত উত্থাপিত হইবে।

বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজবংশ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমায় বক্‌ডিহি বা বকদ্বীপ প্রদেশে 'বগড়ী-রাজ্য' নামে একটি অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ অঞ্চলে যে সকল অনার্য্য দলপতি বাস করিত, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গজপতিসিংহ নামক জনৈক রাজপুত ঐ রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঐ রাজ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বগড়ী-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার অত্যল্পকাল পরে এই জেলার উত্তরাংশে বগড়ী-রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমান্তে পূর্ব্বোক্ত তানদেশের মধ্যে রাজা ইন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক চন্দ্রকোণা-রাজ্য নামে আর একটি রাজ্যও স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয়

* Bayley's Memoranda on Midnapore, p. 17.

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বগড়ী, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান অপারমান্দারের অধিপতি শূরবংশীয় লক্ষ্মীশূরের অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে লক্ষ্মীশূরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরকালে ঐ প্রদেশে এই সকল ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চন্দ্রকোণা ও বগড়ী রাজ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। যখন যে রাজ্যের অধিপতি অধিকতর পরাক্রান্ত হইতেন, তখন তিনি অন্য রাজাকে স্বীয় অধীনতাস্বীকারে বাধ্য করিতেন, অথবা তাঁহার উচ্ছেদসাধন করিয়া ক্ষান্ত হইতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে চন্দ্রকোণা রাজবংশের লোপ হইয়াছে। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওমালী সাহেব তাঁহার গ্রন্থে বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজ্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। * যথাস্থানে এই দুই রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিব।

গঙ্গবংশীয়দিগের রাজত্বের পর উড়িষ্যায় সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের অধিকার আরম্ভ হয়। তাঁহারা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজিত হইবার পর হইতেই মুসলমানগণ অনেকবার উড়িষ্যা অধিকার করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। মুসলমানগণের ঐ সকল অভিযানের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহের উৎকল আক্রমণের সহিত মেদিনীপুর জেলার কিছু সম্বন্ধ আছে। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান-রাজগণের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন সাহ সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। রিয়াজ-উস-

হোসেন সাহের উড়িষ্যা আক্রমণ।

---

* District Gazetteer, pp. 164-166, 171-173.

সালাতীন অনুসারে তিনি গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। * উৎকলের ইতিহাস মাদলা পাঞ্জীতে দেখা যায় যে, ইস্মাইল গাজি নামক বাঙ্গালার নবাবের জনৈক সেনাপতি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পুরী-নগর ধ্বংস এবং বহু দেবদেবীর মন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ সময় উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যের দক্ষিণাংশে ছিলেন। তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে, মুসলমান সেনাপতি মান্দারণ-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপরুদ্রদেব মান্দারণ-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাহার জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী মুসলমান-সেনাপতির সহিত যোগদান করাতে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। † ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, হোসেন সাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ‡ কিন্তু তাহা না হইলেও মেদিনীপুর জেলার উত্তরদিকের কিয়দংশ যে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। হোসেন সাহ হাব্‌সী ও পাইকদিগকে কিছু কিছু ভূমি দিয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তরক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় ঐ পাইকদিগের বংশধরেরা পরবর্ত্তিকালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হইয়া কিছু গোলমাল করিয়াছিল।§ ইংরাজ রাজত্বের প্রসঙ্গে সে কথার পুনরুল্লেখ করিব। হোসেন সাহ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

---

* রিয়াজ-উস্-সালাতীনের ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ১৩২।

† J. A. S. B., Old Series. Vol. LXIX. 1900, pt. I. p. 186.

‡ গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১০৯।

§ Stewart's History of Bengal. রামপ্রাণ গুপ্ত-সম্পাদিত রিয়াজ-উস্-সালাতীনের বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২৪। গৌড়ের ইতিহাস—২য় ভাগ, পৃঃ ১০৩।

হোসেন সাহের সময়ে প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বঙ্গে ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস-বিরচিত কড়চায় ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রার বিবরণ বর্ণিত আছে। [illegible] নীলাচলে যাইবার সময় দামোদর নদ পার হইয়া কাশী মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। সেখান হইতে হাজিপুর হইয়া তিনি মেদিনীপুরের নিকট উপস্থিত হইলে তথায় কেশব সামন্ত নামক এক ধনী তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া সন্ন্যাসমার্গ হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে গিয়া শ্রীচৈতন্য ধলেশ্বর শিব দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে জলেশ্বরে গিয়া বিল্বেশ্বর শিব দর্শন করেন। * চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য দেবনদ পার হইয়া সেঁয়াখালা দিয়া তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে দাঁতন হইয়া জলেশ্বরে গমন করেন। † কড়চার লিখিত বিবরণের সহিত চৈতন্যমঙ্গলের বিবরণ মিলাইলে জানা যায়, শ্রীচৈতন্য হাজিপুর হইয়া তমলুকে আসিয়াছিলেন। তৎপরে তমলুক হইতে মেদিনীপুর, নারায়ণগড় ও দাঁতন হইয়া উড়িষ্যাভিমুখে গমন করেন। হাজিপুরের বর্ত্তমান নাম ডায়মণ্ড-হারবার। ডায়মণ্ড-হারবার হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তৎকালে পূর্ব্বোক্ত স্থানগুলির নিকট দিয়াই একটি প্রাচীন পথ ছিল। ওয়্যালী সাহেব অনুমান করেন, এখনকার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড নামক

মেদিনীপুরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

---

* জয়গোপাল গোস্বামী সম্পাদিত 'কড়চা', পৃঃ ৩০-৪০।

† চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৯২-৯৭।

রাজপথ দুইটি অনেকটা সেই প্রাচীন পথটির পাশ দিয়াই গিয়াছে। * শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মগতপ্রাণ শিষ্যগণ হরিনামের যে তরঙ্গ তুলিয়া সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন, সে প্রেম-তরঙ্গের কম্পন এই জেলাতেও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই জেলার বহু-সংখ্যক পরিবার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে সময় উড়িষ্যায় গমন করেন, সে সময় উৎকলের হিন্দু-রাজার সহিত বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের বিবাদ চলিতেছিল। এই কারণে বঙ্গ-উড়ি-ষ্যার সীমান্তে লোকের জীবন নিরাপদ্ ছিল না, শত্রুপক্ষীয় লোকের বধের জন্য উভয় রাজাই সীমান্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে বধশূল পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। নদী পার হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য ছিল। বঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্তপ্রদেশের নদী পারের কর্ত্তাকে 'দানী' বলিত। দানীর বড় দৌরাত্ম্য ছিল। জলপথ জল-দস্যু-সমাকুল ছিল। সে কালের অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই বঙ্গ উড়িষ্যার সীমান্তের সেই বিপদ্-সঙ্কুল পথের বিবরণ বিবরিত আছে।

উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪০ খৃঃ অব্দে পর-লোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর রাজপুত্রগণকে হত্যা করিয়া ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। উড়িষ্যার ইতিহাসে ঐ বংশ 'ভোই বংশ' নামে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাদিগকে রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। মাত্র পঁচিশ বৎসর পরেই রাজা মুকুন্দদেবকে গোবিন্দ বিদ্যাধরের কৃত পাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব

মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান অধিকার-প্রতিষ্ঠা।

* District Gazetteer, p. 25.

করিয়াছিলেন। মোগল-কুলতিলক আক্‌বর সাহ তখন দিল্লীর সম্রাট্‌ এবং সোলেমন্‌ কররাণী তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় পাঠানদিগের সহিত দিল্লীর মোগল-সম্রাটের বিরোধের সূত্রপাত হয়। মুকুন্দদেব আক্‌বর সাহের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি সে সময় ত্রিবেণী পর্য্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে আক্‌বর সাহ যখন মেওয়ারে শিশোদীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় সোলেমন কররাণী অবসর বুঝিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। মুকুন্দদেব কোট-সমা দুর্গে আশ্রয় লয়েন। ঐ সময় তাঁহার একজন সামন্ত বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিহত করেন। ঐ বিদ্রোহী সামন্ত ও রঘুভঞ্জ ছোট রায় উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়েই সোলেমনের সেনাপতি হিন্দু-বিদ্বেষী দুর্দান্ত কালাপাহাড় কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হইলে পর বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা সমেত সমস্ত উড়িষ্যাপ্রদেশ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে গৌড়-রাজ্য মুসলমানের হস্তগত হইবার প্রায় পঞ্চশত বৎসর পরে উৎকল-রাজ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুসলমান অধিকার—পাঠান-রাজত্ব।

সোলেমন্ কররাণী কর্ত্তৃক ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বতটে কশবা হিজলী নামে যে গ্রামটি বিদ্যমান, সেই স্থানেই উক্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। উত্তরকালে সেই স্থানের নামানুসারে উক্ত প্রদেশ হিজলী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিজলী প্রাচীন স্থান নয়। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই উহার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে উহা মনুষ্যবাসোপযোগী হয়। উড়িষ্যার প্রাচীন রাজস্ব-বিভাগে অথবা রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তে হিজলীর নাম নাই। সুলতান সুজার বন্দোবস্তের সময় হিজলীর নাম পাওয়া যায়।

হিজলীতে ক্ষুদ্র মুসলমান-রাজ্য।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নিম্ন-বঙ্গের ভাটি-নামক প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জোয়ারের জলে ডুবিয়া যাইত এবং ভাটার সময় জাগিয়া উঠিত বলিয়া উহার নাম 'ভাটি' হয়। ঐ প্রদেশের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে চারি শত ক্রোশ এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে প্রায়

হিজলী ও ভাটিদেশ।

হিজ্‌লীর মস্‌জিদ্‌

তিন শত ক্রোশ ছিল। বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এখনকার সুন্দরবন ও তন্নিকটবর্ত্তী ভূমি সকলকেই ভাটি বলিত। * গ্রাণ্ট, ব্লকম্যান-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে নবোত্থিতা হিজলী দ্বীপটিও ভাটির অন্তর্গত ছিল। † ক্রমশঃ ঐ সকল স্থান মনুষ্যবাসোপযোগী হইতে থাকায় সেগুলিকে নিকটবর্ত্তী রাজস্ব-বিভাগের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া হয়। সেই সময় হিজলী মালঝিটা বিভাগের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে হিজলী একটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় মালঝিটা নাম লুপ্ত হইয়া যায় এবং উক্ত প্রদেশ হিজলী নামে পরিচিত হয়। ওয়্যালী সাহেব অনুমান করেন, মালঝিটা বিভাগ হলদী নদী হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান কাঁথি থানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ‡

তাজ্ খাঁ মসনদ্-ই-আলী নামক জনৈক আফগান ঐ ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঠিক্ কোন সময়ে ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বলা যায় না। হিজলীর প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে, তাজ্খাঁ আমলী ৯৬২ সালে (১৫৫৫ খৃঃ অব্দে) প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রস্তর-লিপিতে তাঁহার জন্ম বা রাজ্য লাভের তারিখ নাই। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হিজলীর তদানীন্তন কালেক্টার ক্রোমেলীন সাহেব হিজলীর মসজিদের সেবকদিগের নিকট রক্ষিত পুরাতন

হিজলী-রাজ্য প্রতিষ্ঠার তারিখ।

* J. A. S. B., Vol. LXXII. Part I, No. I, 1904, p. 62.

† "The extension of the name of Sunderbans to the whole coast is evedently modern. The Mahamedian historians do not use the term, but give the coast-strip from Hijli to the Meghna the name of "Bhati" which signifies 'lowlands overflooded by the tides'.—Blochman's notes in Hunter's S. A. B., Vol. I., p, 380.

‡ District Gazetteer, p. 183.

কাগজপত্রাদি দেখিয়া তাজ্ খাঁর বংশ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তিকালে বেলী, হাণ্টার, প্রাইস, ওম্যালী প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ সেই বিবরণই গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রোমেলীন সাহেবের সিদ্ধান্তমতে ১৫০৫ হইতে ১৫৫৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাজ্ খাঁ ঐ রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * আমরা ঐ সময় হইতেও আরও কিছু বাদ দিতে পারি। চৈতন্যচরিতামৃতে গোপীনাথ পট্টনায়েক নামক মালঝিটা দণ্ডপাঠের দেশাধিপতির নাম পাওয়া যায়। প্রতাপরুদ্রদেব তখন উড়িষ্যার রাজা। তিনি ১৪৯৭ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। † প্রতাপরুদ্র দেব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন; তাঁহার সময়েই হোসেন সাহর ন্যায় শক্তিশালী মুসলমান নরপতিও উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে পারেন নাই। প্রতাপরুদ্র দেব মুসলমানদিগকে মান্দারণ-দুর্গ পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিজলীতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া তদীয় মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর উড়িষ্যার রাজা হন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের সহিত মুসলমানদিগের ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা অনুমান করি, সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই তাজ্খাঁ এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের ভক্ত রামানন্দ-পরিবার চৈতন্যদেবের অনুরক্ত প্রতাপরুদ্র দেবের যে বিশেষ অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের নানা স্থানে তাহার পরিচয় আছে। এই কারণে

* Crommelin's letter dated the 13th October, 1812.

† বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ৩১৯।

প্রতাপরুদ্র দেবের পুত্রগণকে হত্যা করিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রতাপরুদ্রদেবের অনুগত মালঝিটার রাজবংশকে উৎখাত করাও গোবিন্দবিদ্যাধরের আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাজ্ খাঁর দ্বারাই তিনি তাঁহার সে কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। উৎকলের রাজশক্তির আনুকূল্য না থাকিলে অজ্ঞাত-কুলশীল তাজ্ খাঁর পক্ষে উৎকলের একটি প্রধান দণ্ডপাঠে স্বীয় বাহুবলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। *

হিজলীর তাজ খাঁ মস্নদ্-ই-আলীর পূর্ব্ব-পরিচয়।

তাজ্ খাঁর পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। সে সম্বন্ধে দুই রকম জনশ্রুতি আছে। কেহ বলেন, তিনি বঙ্গের কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কারণে ভ্রাতা সিকন্দর আলী-সহ স্বীয় বংশ ও সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া হিজলী প্রদেশের তদানীন্তন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরে সিকন্দর কর্ত্তৃক রাজহত্যা সম্পাদিত হইলে পর তাজ্ খাঁ সেই প্রদেশের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। আবার কেহ বলেন যে, তাঁহারা মুসলমান পিতার ঔরসজাত সন্তান হইলেও এক অতি নীচজাতীয়া হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত ছিলেন; উভয় ভ্রাতাই প্রথম-বয়সে ঐ প্রদেশের কোন হিন্দু গৃহস্থের গো-পালকের কার্য্য করিতেন, উত্তরকালে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিজলী এক সময় ভাটি দেশের অন্তর্ভূত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খাঁ জাহান্ আলী নামক জনৈক মুসলমান ভাটি দেশের গভীর অরণ্যানী পরিষ্কার করিয়া তাহাতে

* "The mahal (Maljhita) was assessed in the Ain with the second highest revenue of the Sarkar." J. A. S. B, vol XII, 1916, No I., p. 54.

গ্রাম ও নগরাদি পত্তন ও সেই সেই স্থানে রাজপথ, অট্টালিকা ও মস্‌জিদাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে কোন কোনটি খুলনা জেলার বাগের-হাটের নিকট অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। * খাঁ জাহানের পরে ঐ প্রদেশের অধিকাংশ ভূভাগ এক বিস্তৃত জায়গীরে পরিণত হইয়া চাঁদ খাঁ মস্‌নদ্‌-ই-আলী নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন, খাঁ জাহান্‌ আলীর সহিত চাঁদ খাঁর সম্বন্ধ ছিল। † চাঁদ খাঁ নিঃসন্তান; তাঁহার প্রাণত্যাগের পর উক্ত জায়গীর কিছুদিন অস্বামিক অবস্থায় থাকে; পরে যশোহরের খ্যাতনামা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য গৌড়ের সুলতান দাউদ্‌ সাহের নিকট হইতে উক্ত জায়গীর লাভ করিয়া তাহাতে যশোহর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু বিক্রমাদিত্য যখন উক্ত জায়গীর লাভ করেন, তখন উহার চারিদিক্‌ বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে সেই সকল জঙ্গল কাটাইয়া পুনরায় নূতন নগর পত্তন করিতে হয়। ‡ সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহার অন্ততঃ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদ খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল।

দেখা যায়, চাঁদ খাঁর মৃত্যু ও তাজ্‌ খাঁর হিজলীতে অভ্যুদয় প্রায় একই সময়ে ঘটে। আমাদের অনুমান, তাজ্‌ খাঁ চাঁদ খাঁর বংশ-সম্ভূত ছিলেন। জনশ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, তাজ্‌ খাঁ কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত সন্তান

* J. A. S. B., Old Series, Vol. XXXVI, 1867, pt. I., p. 135.

† History of Backergunge. pp. 176-177.

‡ প্রতাপাদিত্য, নিখিলনাথ রায়, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৮০-৮৫।

বলিয়া উক্ত জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাটি-প্রদেশেরই এক প্রান্তে হিজলী দ্বীপে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত নিখিল-নাথ রায় মহাশয়ও অনুমান করেন, হিজলীর মসূনদ্-ই-আলী বংশের সহিত চাঁদ খাঁর সম্বন্ধ ছিল। *

তাজ্ খাঁ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে রাজকার্য্যাদি কিছুই দেখিতেন না; সর্ব্বদাই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার ভ্রাতা সিকন্দর আলী রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেন। সিকন্দর রাজকার্য্যে নিপুণ এবং বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বীরত্বের ও শারীরিক বলের অনেক কাহিনী অদ্যাপি শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহারই বীরত্বে ও কৌশলে এই রাজ্যটি স্থাপিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একদল সৈন্য আসিয়া হিজলী আক্রমণ করে। তাজ্ খাঁ তাহাদের হস্তে অপ-মানিত ও নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ক্রোমে-লীন সাহেব ঐ সৈন্যদলকে বাদসাহী সৈন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় বাদসাহী সৈন্যের পক্ষে হিজলীর মুসলমান রাজ্য অধি-কার করিবার কোন আবশ্যকতা বা সম্ভাবনাই ছিল না। ঐ সৈন্য উড়িষ্যার হিন্দু-রাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত। গোবিন্দ বিদ্যাধরের তখন মৃত্যু হইয়াছিল—শকা প্রতাপদেব তখন উড়িষ্যার রাজা। তিনি ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তখনও পরাক্রান্ত সিকন্দর আলী জীবিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, এতদিন হিজলীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই; এক্ষণে সিকন্দরের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাজ্ খাঁর পুত্র-সন্তান না থাকায়

তাজ্ খাঁর ভ্রাতা সিকন্দর আলী।

* প্রতাপাদিত্য—উপক্রমণিকা—পৃঃ ৮৫।

সিকন্দর আলীর পুত্র বাহাদুর খাঁ উড়িষ্যার রাজার সহিত সন্ধি করিয়া হিজলী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

বাহাদুর খাঁ ও জইল্ খাঁ।

বাহাদুর খাঁ ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাজ্ খাঁর জামাতা জইল্ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। বাহাদুর খাঁ রাজ-সরকার কর্ত্তৃক বন্দী হন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য জইল্ খাঁর অধিকারে থাকে। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ রাজ-সরকার কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং জইল্ খাঁকে কারারুদ্ধ হইতে হয়। হিজলীর মস্‌জীদের সেবাইৎগণ পূর্ব্বোক্ত দুইটি রাজ-সরকারকে মুসলমান-রাজ-সরকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ক্রোমেলীন সাহেবও তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা প্রথমটি উড়িষ্যার হিন্দু-রাজ-সরকার ও দ্বিতীয়টি মুসলমান-রাজ-সরকার বলিয়া অনুমান করি। উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব ১৫৬০ হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আফগানদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। তিনি পূর্ব্বোক্ত ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দেই অর্থাৎ যে বৎসর বাহাদুর খাঁ কারারুদ্ধ হন, সেই বৎসরেই আফগানদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্বীয় রাজ্য-সীমা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ঐ সূত্রেই জইল্ খাঁর ষড়্‌যন্ত্রে বাহাদুর খাঁও রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন। অতঃপর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, তখন মুকুন্দদেব পরলোকে; সে সময় হিন্দু-রাজত্বের লোপ হইয়া গিয়াছে; বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বাহাদুর খাঁ যে মুসলমান-রাজ-সরকার কর্ত্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বাহাদুর খাঁ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশা খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলী নাম গ্রহণ করেন। ক্রোমেলীন সাহেব এ কথার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু জনশ্রুতি ঐরূপ। ঈশা খাঁ এবার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি-কামনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। সে সময় তাঁহার অসংখ্য পদাতিক, অপরিমেয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ হিজলী প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যৎকালে ঈশা খাঁর অভ্যুদয় হয়, সে সময়টি বাঙ্গালার ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ। ঐ যুগে বাঙ্গালায় দ্বাদশ ভৌমিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের বীরত্বের কথা সুপরিচিত। সেই দ্বাদশ ভৌমিকের সকলের নাম অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন, হিজলীর মস্‌নদ্-ই-আলীগণও অন্যতম ভৌমিক ছিলেন। *

ঈশা খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলী।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত, মহারাজা বসন্ত রায়ের সহিত ঈশা খাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্গের স্বাধীনতা লইয়া পিতৃব্যের সহিত প্রতাপের মতদ্বৈধ ঘটিলে, প্রতাপ কতিপয় পুত্রসহ বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচু রায়) কোন প্রকারে যশোহর-রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া পিতৃবন্ধু ঈশা খাঁর শরণাপন্ন হন। প্রতাপ হিজলী আক্রমণ করেন। কয়েক দিবস ভীষণ যুদ্ধের পর ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। † যুদ্ধের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ইতিপূর্ব্বেই রাঘব রায় আকবর সাহের

প্রতাপাদিত্যের হিজলী অধিকার।

---

* প্রতাপাদিত্য—নিখিলনাথ রায়—উপক্রমণিকা—পৃঃ ৫০।

† প্রতাপাদিত্য (পরিষদ গ্রন্থাবলী) রামরাম বসু প্রণীত, পৃঃ ৫৯ ও হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রণীত, পৃঃ ২৪৪—২৫৫। প্রতাপাদিত্য-চরিত—সত্যচরণ শাস্ত্রী।

শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে ধৃত করিতে পারেন নাই। ভীমসেন মহাপাত্র নামক ঈশা খাঁর একজন দেওয়ান ছিলেন; তাঁহারই সাহায্যে রাঘব রায় পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, অনুমান করিয়া প্রতাপ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। দেওয়ান মহাপাত্র মহাশয় প্রতাপের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে স্বীয় গ্রামস্থ বাহিরীমুঠার ভীমসাগর নামক পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। হিজলী বিজিত হইলে পর প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন।

ঈশা খাঁর ঐতিহাসিকত্ব।

ঈশা খাঁকে লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিসংবাদ আছে। প্রতাপাদিত্যের সময় তিন জন ঈশা খাঁ ক্ষমতাশালী ছিলেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, হিজলীর ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলী ও উড়িষ্যার ঈশা খাঁ লোহানী। খিজিরপুরের ঈশা খাঁর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মতে উড়িষ্যার ঈশা খাঁর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং রাঘব রায় তাঁহার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হিজলীর ঈশা খাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে (Statistical Account of Bengal, vol. III, Midnapore) হিজলীর মসনদ্-ই-আলী-বংশের যে বিবরণ আছে, উহাতে ঈশা খাঁর নাম বা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক তাঁহাদের কাহারও পরাভবের কোন কথাই নাই। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হাণ্টার সাহেব ক্রোমেলীন সাহেবের পূর্ব্বোক্ত চিঠি হইতে হিজলীর বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিও আবার হিজলীর মসজীদের সেবাইৎদিগের নিকট

হইতে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত সেবাইৎদিগের মতে মস্‌নদ্-ই-আলীর বংশ ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিল। তাঁহারা তাজ্ খাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কোন হিন্দু কর্ত্তৃক যে ঈদৃশ পরিবারের উচ্ছেদসাধন হইয়াছিল, সে কথা বলিলে তাঁহাদের আর সে অলৌকিকত্ব থাকে না। এই কারণে তাঁহারা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক ঐ বংশের উচ্ছেদের কাহিনী স্বীকার করেন না। এমন কি, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে রাজসৈন্যের ভয়ে তাজ্ খাঁ আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন, বাহাদুর খাঁ বা ঈশা খাঁ রাজ্যচ্যুত হন, যথেষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও সে রাজসৈন্যকে তাঁহারা হিন্দু রাজার সৈন্য বলিয়াও স্বীকার করেন না। এই জন্যই ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে প্রতাপাদিত্যের হিজলী-জয়ের কোন কথা নাই। কিন্তু ঐ সময়ের আরও দশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত (১৮০২ খৃষ্টাব্দ) রামরাম বসু মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্য' নামক গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। তখনও ঐ কথা প্রচলিত ছিল বলিয়াই তিনি স্বীয় গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' নামক গ্রন্থে হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের জীবনী-লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় ও কলিকাতার ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ লেখকগণও স্বীকার করেন যে, হিজলীর ঈশা খাঁই প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং তাঁহার নিকটেই রাঘব রায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতিও ঐরূপ। কশবা হিজলীর পার্শ্ববর্ত্তী রসুলপুর নদীর পরপারে যে স্থানে প্রতাপাদিত্যের রণতরী-সমূহ সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি 'প্রতাপপুর-ঘাট' নামে পরিচিত। ঐ স্থানে প্রতাপ-

পুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামও বিদ্যমান। প্রতাপাদিত্যের হিজলী-যুদ্ধের সাপক্ষে ইহাও একটি বিশেষ প্রমাণ।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় হিজলীর ঈশা খাঁর বিষয় অবগত ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্যার ঈশা খাঁ লোহানীর সঙ্গেই বসন্ত রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং রাঘব রায় তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার ঈশা খাঁ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে কোন দিন পরাজিত হন নাই, আর তাঁহার রাজ্যও কোন দিন প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। পরন্তু বহুকাল হইতে প্রবল জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত ঈশা খাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতাপ হিজলী রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। নিখিল বাবুও এ কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছে। তিনি একবার বলিতেছেন, "ঈশা খাঁ লোহানী উড়িষ্যা ও দক্ষিণবঙ্গে আধিপত্য করায় হিজলী যে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে এবং প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঈশা খাঁর নিকট হইতে হিজলী বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেও পারেন।" আবার বলিতেছেন, "প্রতাপাদিত্য কর্তৃক হিজলী অধিকারের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হইয়া থাকি। তবে ঈশা খাঁর সহিত বিবাদ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যের নিকটস্থ হিজলীকে কিছু দিন নিজ অধিকারেও রাখিতে পারেন।"

ঈশা খাঁ লোহানীর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কারণস্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন—"বিক্রমাদিত্য (বসন্ত রায়ের ভ্রাতা) কতলু খাঁর সহিত দায়ু-

প্রতাপাদিত্য (পরিষদ্ গ্রন্থাবলী) পৃঃ ১২৪-১২৬।

দের পার্শ্বচররূপে অবস্থিতি করিতেন। এইজন্য কতলু খাঁর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ঈশা খাঁ (লোহানী) কতলুর স্ববংশীয় এবং তাঁহার অনুচর ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত যে বসন্ত রায়ের বিশেষরূপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।" * নিখিল বাবু ইহা 'অনায়াসে' অনুমান করিলেও আমরা উহা 'অনায়াসে' গ্রহণ করিতে পারি না। কতলুর সহিত বিক্রমাদিত্যের 'প্রগাঢ়' হউক বা না হউক, বন্ধুত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু ঈশা খাঁ কতলুর 'স্ববংশীয়' এবং তাঁহার 'অনুচর' ছিলেন, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতার সহিত যে তাঁহার 'বিশেষরূপ বন্ধুত্ব' স্থাপিত হইবে, এমন কি কারণ আছে? বরঞ্চ বসন্ত রায়ের রাজ্যের পার্শ্বেই হিজলীর মস্‌নদ্-ই-আলী-বংশের অধিকার ছিল এবং গৌড়েশ্বর দায়ুদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় যে বৎসর (১৫৭৪ খৃঃ) যশোহর-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, সেই বৎসরই হিজলীর ঈশা খাঁকেও স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহাই মনে হয় না কি যে, ঐ সময়েই কোন কারণে এই দুই বংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল? নিখিল বাবুর গ্রন্থেই দেখা যায় যে, যশোহর-রাজ্য প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের মধ্যে দশ আনা ও ছয় আনা ভাগে বিভক্ত হইলে রাজ্যের পূর্ব্বদিক্ প্রতাপের এবং পশ্চিমদিক্ বসন্ত রায়ের অংশে পড়িয়াছিল। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী কালীঘাট, বঁড়িশা, বেহালা, ডায়মণ্ড-হারবার, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থান বসন্ত রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। ঐ স্থানের নিকটেই, নদীর অপর পারেই হিজলী-রাজ্য। পার্শ্ববর্ত্তী এই দুইটি রাজার পরস্পরের বিশেষ বন্ধুত্ব থাকাই সম্ভব।

আর একটি কথা। হিজলীর মস্‌জীদের সেবকদিগের নিকট

* প্রতাপাদিত্য (পরিষদ্ গ্রন্থাবলী), পৃঃ ১২৪।

হইতে অবগত হইয়া ক্রোমেলীন সাহেব লিখিয়াছেন এবং নিখিল বাবুও তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পর দুইজন হিন্দু কর্ম্মচারী হিজলী-রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। হিজলীর মসনদ্-ই-আলী-বংশের সহিত যদি ঈশা খাঁর কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে কি সূত্রে মুসলমান-রাজ্যের অধিকার সামান্য হিন্দু কর্ম্মচারী দুই জন পাইলেন? বঙ্গের কি উড়িষ্যার পাঠান অথবা মোগল শাসনকর্ত্তাগণই কি স্বেচ্ছায় ঐ রাজ্যটি তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন? মসনদ্-ই-আলী-বংশ ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যটি বিনা কারণে হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের হস্তে চলিয়া গেল, আর বঙ্গ-উড়িষ্যার মুসলমান-সমাজ তাহা নীরবে সহ্য করিলেন? অধিকন্তু নিখিল বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, হিজলীর মসনদ্-ই-আলী-বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি অনুমান করেন যে, উহাঁরাও তৎকালীন দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম হইতে পারেন। * যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পরেই তাদৃশ ক্ষমতাশালী রাজবংশের হঠাৎ এরূপ কি কারণ ঘটিল যে, দুই জন হিন্দু কর্ম্মচারী সে রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইল, আর উহার কোন প্রতিবিধান হইল না? নিশ্চয়ই এমন কিছু কারণ ঘটিয়াছিল—যাহার প্রতিবিধান করা তখন মুসলমানদিগের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। এই সকল কারণে আমরা সিদ্ধান্ত করি, হিজলীর ঈশা খাঁর সঙ্গেই প্রতাপের যুদ্ধ বাধে। নিখিল বাবু হিজলীর ঈশা খাঁর অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্যার ঈশা খাঁ লোহানীর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন। হিজলীর ঈশা খাঁর বিষয় অবগত থাকিলে, তিনি বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপের বন্ধুত্ব, রাঘব

* প্রতাপাদিত্য—উপক্রমণিকা—পৃঃ ৫০।

রায়ের বয়স, বসন্ত রায়ের মৃত্যুকাল প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, সে সকলের মীমাংসার জন্য ওরূপ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না।

হিজলীর অধিকারী বলভদ্র দাস।

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্য কত দিন প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা সঠিক বলা যায় না। তৎপরে উহা মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্যামানন্দ দেবের প্রধান শিষ্য ভক্তাবতার রসিকানন্দদেবের গোপীজনবল্লভ দাস রচিত একখানি প্রাচীন জীবনী-গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রসিকানন্দ হিজলী-মণ্ডলের অধিকারী বলভদ্র দাসের কন্যা ইচ্ছাদেবীকে বিবাহ করেন। রসিকানন্দ এই জেলার অন্তর্গত রোহিণীর রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ। মাতার নাম রাণী ভবানী। হিজলীর মণ্ডল-অধিকারী বলভদ্র দাস তথায় রাজার ন্যায় বাস করিতেন। রসিক-মঙ্গল গ্রন্থে বলভদ্র দাসের নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় আছে ঃ—

"হেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী।
সদাশিব ভ্রাতা বলভদ্র নামধারী॥
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার।
রাজ-পরিচ্ছদে তথা থাকে সর্ব্বকাল॥
রাজ্য-অধিকারী আর বহু ধনবান্।
হিজলী-মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান্॥
পাণিদ্রব্য নানা রত্ন হীরা মতিমালা।
সুবর্ণ জিনিয়া বস্ত্র টাকা অসংখ্যালা॥

তমলুক হইতে সারদাচরণ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত রসিক-মঙ্গল—পৃঃ ৪৩।

গণনা না হয় গরু ধান্য অপ্রমিত।
সম্পত্তি দেখিয়া মহারাজা চমকিত ॥
হেনমতে বৈসে তথা বলভদ্র দাস।
হিজলী-মণ্ডলে শোভে করিয়া নিবাস ॥"

এতদ্ভিন্ন রসিকানন্দের সহিত ইচ্ছাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে হিজলীর যেরূপ বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়,তাহাতে উক্ত বংশের ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বলভদ্র দাসকে মেদিনীপুরে অবস্থিত বাদসাহের কর্ম্মচারীর নিকট হিজলীর রাজস্ব দাখিল করিতে হইত। এক সময় তাঁহার নিকট লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব বাকী পড়াতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। অতঃপর রসিকানন্দের পিতা রাজা অচ্যুতানন্দ বলভদ্রের টাকার জামীন হওয়ায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। *

গোপীজনবল্লভ দাস রসিকানন্দের সমসাময়িক ভক্ত বৈষ্ণব কবি। তিনি রসিকানন্দের বাল্য-সুহৃদ্ও ছিলেন। এই কারণে তাঁহার লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। রসিকানন্দ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। কোন্ বৎসর রসিকানন্দের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলিতে না পারিলেও, রসিকমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বলভদ্র দাস হিজলীতে রাজত্ব করিতেন এবং সে সময় হিজলী মুসলমান বাদসাহের অধিকারভুক্ত ছিল।

রসিকমঙ্গল গ্রন্থে বলভদ্র দাসের খুল্লতাত বিভীষণ মহাপাত্র নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। বিভীষণ দাস নামক এক ব্যক্তির নাম স্থানান্তরেও আবিস্কৃত হইয়াছে। হিজলী প্রদেশের অন্তর্গত বাহিরী

* রসিকমঙ্গল—সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত—পৃঃ ৪২-৪৩।

গ্রামের একটি পুরাতন মন্দিরে তিনখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি হইতে জানা যায় যে, কাশীদাসের কুলে পদ্মনাভ দাসের পুত্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। * দ্বিতীয় লিপিটিতে আছে যে, শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন মিশ্র নামক আচার্য্য-চূড়ামণির পৌত্র ভগবান্ নামক কোন ব্যক্তির পুত্র শ্রীধরণীসুত নামক এক ব্যক্তি এবং উক্ত আচার্য্য-চূড়ামণির চক্রধর নামক এক পুত্র ইহাঁরা উভয়েই উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবিধি যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া পরলোকগমন করেন। † মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ উক্ত দুইখানি লিপি ব্যতীত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখস্থিত তৃতীয় লিপিখানি হইতে জানা যায় যে, ১৫০৬ শকাব্দায় (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) বৈশাখ মাসের ১৭ই তারিখে বুধবার শুক্লপক্ষের যুগাদ্যাদিনে শ্রীযুক্ত গদাধর নামক গুরুর হস্তে ঐ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সমর্পণ করা হয় এবং তাঁহাদের প্রীতিকামনায় উক্ত গুরুকে দেউল-বাড় নামক গ্রাম দান করা হইয়াছিল। ‡ মন্দিরটি এক্ষণে জঙ্গলা-

---

* "কাশীদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাভাত্মজঃ।
শ্রীমান্ ধর-ভূদচিকরদশৌ প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্॥
গোপালপ্রতিমাং চ সদ্ভিঃ প্রতিষ্ঠাং দ্বিজৌ।
রামং চেহ সুভদ্রয়া সহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি॥"

† "পৌত্র শ্রীধরণীধরসুতো ভগবতঃ সুনুর্দ্বিজন্মশ্রেণী।
শ্রীমানর্জ্জুনমিশ্র ইত্যবিহিতস্তাচার্য্যচূড়ামণেঃ॥
পুত্রশ্চক্রধরঃ কবীন্দ্র ইতি যত্যাংসি প্রতিষ্ঠাবিধিম্।
প্রসাদাস্ত বিভীষণস্ত বিধিনা কৃত্যা বিরামং গতঃ॥"

‡ "শকাব্দে রসশূন্যবাণধরণীমানে তৃতীয়াতিথৌ।
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ সিতে॥
শ্রীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে।
দত্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়াখ্যাকম্॥"

কীর্ণ। উহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রার কোন মূর্ত্তিই নাই। তাঁহাদিগকে কত দিন হইল কোথায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি—ঐ মন্দির ও বাহিরীর অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ স্থানীয় এক প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তিনিদর্শন। ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলীর দেওয়ান পূর্ব্বোক্ত ভীমসেন মহাপাত্র ঐ বংশেই জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ দাসের পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করেন। মহাপাত্র রাজদত্ত উপাধি। এতদ্ব্যতীত ঐ বংশ সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা আর বিশেষ কিছু বলিতে পারে না।

আমাদের অনুমান, বাহিরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ দাস ও রসিকমঙ্গলের উল্লিখিত বিভীষণ মহাপাত্র একই ব্যক্তি। মালঝিটা প্রদেশের মধ্যে বাহিরীই বর্দ্ধিষ্ঠ ও প্রাচীন গ্রাম। ঐ প্রদেশের মধ্যে ঐ গ্রামে যত প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আছে, অন্য কোন গ্রামেই সেরূপ নাই। হিজলী গ্রামে মসনদ্-ই-আলী-বংশের বাসের পূর্ব্বে যখন হিজলী সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, তখন মালঝিটা দণ্ডপাঠের অধিপতিগণ ঐ বাহিরী গ্রামেই বাস করিতেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি এবং বাহিরীর গ্রামবাসিগণ যে সকল কীর্ত্তি প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সে সকল মালঝিঠার পূর্ব্বোক্ত দেশাধিপতিগণেরই কীর্ত্তি। রসিকমঙ্গলে দেখা যায়, রসিকানন্দ জাতিতে করণ ছিলেন, রামানন্দ রায়ও জাতিতে করণ; * সুতরাং রসিকানন্দের শ্বশুর বলভদ্র দাস ও রামানন্দের সহোদর গোপীনাথ পট্টনায়কও যে করণজাতীয় ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এই সকল কারণে আমরা অনুমান করি, বিভীষণ মহাপাত্র, বলভদ্র

* গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ১৩৪।

ও তাঁহার ভ্রাতা সদাশিব ইহাঁরা সকলেই সেই প্রাচীন দেশাধিপতি-বংশসম্ভূত ছিলেন। বাহিরীর প্রস্তর-লিপিতে যে কাশীদাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনিই ঐ দেশাধিপতি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোপীনাথ পট্টনায়কও সেই বংশসম্ভূত।

হিজলীর প্রাচীন রাজবংশ।

বহু দিবস হইতে এ প্রদেশে একটি জনশ্রুতি আছে যে, হিজলীর প্রাচীন রাজবংশকে উৎখাত করিয়া মসনদ্-ই-আলা-বংশ এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর পরবর্ত্তিকালে সেই বংশীয় কেহ মসনদ্-ই-আলীদিগের অধীনে উক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; উত্তরকালে মসনদ্-ই-আলী-বংশের অধিকার লুপ্ত হইলে, সেই বংশীয় কেহই আবার এই প্রদেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উত্তরকালে স্থাপিত ক্ষুদ্র সুজামুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্দ্ধন রঞ্জা উক্ত কর্ম্মচারী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণই ঐ প্রদেশের প্রাচীন রাজা ছিলেন। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে আমারও ঐরূপ ধারণা ছিল এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই 'নীহার' পত্রে "হিজলী-কাঁথি"-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি সেই কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমার লেখার পরে অন্য দু'একজন লেখকও উহা গ্রহণ করিয়াছেন। সে সময় বাহিরীর খোদিত লিপির বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, রসিকমঙ্গল গ্রন্থও আমার হস্তগত হয় নাই। এক্ষণে আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বোক্ত কাশীদাসের বংশই হিজলীর সেই প্রাচীন রাজবংশ বা দেশাধিপতি-বংশ এবং সেই বংশীয় ভীমসেন মহাপাত্রই মসনদ্-ই-আলী-বংশের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্যের অধিকার পুনরায় সেই বংশীয়ের হস্তেই আসিয়াছিল। সুজামুঠার রাজগণের পূর্ব্বপুরুষেরা

যে হিজলীর প্রাচীন রাজা হইতে পারেন না—সে সম্বন্ধেও প্রমাণ আছে; উক্ত রাজবংশের বিবরণপ্রসঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

হিজলীর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র।

জনশ্রুতি—ভীমসেন মহাপাত্র বিভীষণের পুত্র। রসিকমঙ্গল গ্রন্থে ভীমসেনের নাম নাই, বলভদ্রের খুল্লতাত বিভীষণের নাম আছে; কিন্তু বলভদ্রের পিতার নাম নাই। ইচ্ছাদেবীর বিবাহের সময় তাঁহারা কেহ জীবিত ছিলেন না, বিভীষণই জীবিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। সে সময় পর্য্যন্ত ভীমসেনের পিতার পক্ষে জীবিত থাকাও কিছু অসম্ভব নহে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভীমসেন পরলোকগমন করেন। তাঁহার অকালমৃত্যু হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার বয়স ত্রিশ ও তাঁহার পিতার বয়স পঞ্চাশ ধরিলেও ইচ্ছাদেবীর বিবাহের সময় বিভীষণ মহাপাত্রের বয়স ৭০।৭৫ হইয়া থাকিবে; কিংবা কিছু বেশীও হইতে পারে। তবে রসিকমঙ্গলে দেখা যায় যে, রসিকানন্দের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বাহিরীর মন্দিরের সম্মুখস্থ খিলানের উপরে যে খোদিত লিপিটি আছে, উহাতে জানা যায় যে, ১৫০৬ শকাব্দায় (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) অর্থাৎ যে বৎসর ভীমসেনের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর উক্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গদাধর-নামক গুরুর হস্তে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অন্য প্রস্তরলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে দুইজন ব্রাহ্মণ (ধরণী ও চক্রধর) ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহারা পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিলেন। সুতরাং মন্দির-প্রতিষ্ঠার অনেক পরে যে উহা গদাধরকে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। এই কারণে আমরা অনুমান করি, ভীমসেনের অকাল-

মৃত্যুর পরই পুত্রের পারলৌকিক মঙ্গলকামনা করিয়া মন্দির-স্থাপয়িতা বিভীষণ মহাপাত্র দেউলবাড় গ্রামস্থ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গুরুর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

হিজলীর অধিকারী সদাশিব দাস।

বলভদ্রের পরে তাঁহার ভ্রাতা সদাশিব হিজলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। রসিকানন্দের বিবাহের সমসময়েই বলভদ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। রসিকমঙ্গলে দেখা যায়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলভদ্র দাস হিজলীর 'মণ্ডল অধিকারী' নামে পরিচিত থাকিলেও, তাঁহার জীবিতকালে উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়াই হিজলী শাসন করিতেন। দুই ভ্রাতায় বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। সদাশিব কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইঁহার পরেই যিনি হিজলীর রাজ্যাধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহার সময়েই হিজলী-রাজ্য ঐ বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। তৎপরে হিজলী-রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটিই বৃহৎ। ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে অনুরূপ কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পরেই হিজলী-রাজ্য যে দুই জন হিন্দু কর্ম্মচারীর হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহারাই পরবর্ত্তিকালের মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুই হিন্দু কর্ম্মচারীর পরিচয়স্থলে তিনি দুই স্থানে দুই রকম কথার উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালের ইংরাজ লেখকগণের বিবরণেও সেই অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে।

ওম্যালী সাহেব হিজলীর বিবরণে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা ঐ দুই কর্ম্মচারীর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের একজন বাহাদুর খাঁর দেওয়ান ও অন্যজন তাঁহার সর্দ্দার

ছিলেন। * আবার সুজামুঠা জমিদারীর বিবরণ লিখিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, মাজনামুঠা ও জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয় বাহাদুর খাঁর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রের যথাক্রমে সরকার (Clerk) ও পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুজামুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও তাঁহার শরীর-রক্ষক (Personal attendant and man-at-arms) ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে হিজলী ভীমসেনের অধিকারে ছিল। তিনিই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণকে ঐ সকল স্থানের অধিকার প্রদান করেন। † ইহা হইতে মনে হয়, বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পর ভীমসেন হিজলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপরে ঐ রাজ্য মাজনামুঠা, জলামুঠা প্রভৃতি জমিদারীতে বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পরে ভীমসেনও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। হিজলীর মসৃজিদে রক্ষিত কাগজপত্রে বাহাদুর খাঁর দেওয়ান ভীমসেনের নামই আছে; উহাতে মাজনামুঠার প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরী পট্টনায়েক বা জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপণ্ডা নামক অন্য কোন কর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায় নাই। মাজনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারীর কোন কথাই নাই; কেবল দেখা যায় যে, বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্য দুই জন হিন্দু কর্ম্মচারীর হস্তগত হইয়াছিল। মাজনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারগণ অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের যে বংশ-বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, ঐ জমিদারী দুইটির প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয় ভীমসেন মহাপাত্রের কর্ম্মচারী ছিলেন; বাহাদুর খাঁর নহে।

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী।

* District Gazetteer—Midnapore—p. 183.
† District Gazetteer—Midnapore—p. 219.

এই কারণে মনে হয়, বাহাদুর খাঁর পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিদ্বয়ই মাজনামুঠা ও জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা নহেন। আমাদের অনুমান, পূর্ব্বোক্ত বলভদ্র দাস বাহাদুর খাঁর অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। ভীমসেন তাঁহার দেওয়ান ও বলভদ্রই পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দার। সম্ভবতঃ বাহাদুর খাঁর মৃত্যুর পর ইঁহারা দুইজনেই রাজ্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ভয়ে ভীমসেন আত্মহত্যা করিলে বলভদ্র ও সদাশিবের হস্তে হিজলীর ভার ন্যস্ত হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তিকালে হিজলী-রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে বলভদ্রই হিজলীর মণ্ডল অধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ভীমসেনের পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদিগের ষড়যন্ত্রে সদাশিবের পরবর্ত্তী হিজলীর কোন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন। মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী এখনও আছে এবং মসনদ্-ই-আলী-বংশের পরিচয় দিতে হিজলীর মসজিদের সেবাইতগণও বিদ্যমান; কিন্তু হিজলীর সেই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় দিতে এক্ষণে কেহই না থাকায় বহুদিবস হইল লোকে তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। সেইজন্য লোকে মসনদ্-ই-আলী-বংশের দেওয়ান এবং মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রভু ভীমসেন মহাপাত্রের শূন্য নামটির ছিন্ন সূত্রে মসনদ্-ই-আলীর হিজলী-রাজ্য-লোপের সঙ্গে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতার কথা জুড়িয়া দিয়াছে। ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে এবং ওম্যালী-প্রমুখ লেখক-গণের গ্রন্থে এ দুই হিন্দু কর্ম্মচারীর পরিচয়স্থলে সেইজন্য ঐরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, 'প্রবাসী' পত্রে, স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় 'প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছুতনন

সংবাদ'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে হিজলীর সলিম খাঁ নামক জনৈক জমিদারের নাম পাওয়া যায়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে ইসলাম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে

হিজলীর জমিদার সলিম খাঁ।

আবুল হসন্ (পরে আসাব খাঁ উপাধিতে ভূষিত সাম্রাজ্যের উজীর ও সম্রাট্ সাজাহানের শ্বশুর) বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া নূতন সুবাদারের সহিত আগ্রা হইতে বঙ্গে আসেন। আহাম্মদাবাদের অধিবাসী আবছুল আব্বাসের পুত্র আবছুল লতিফ তাঁহার অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। তিনি ফার্সীতে তাঁহার একটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মজুমদার মহাশয় তদীয় প্রবন্ধে সেই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে যে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে মার্চ্চ তারিখে সপারিষদ্ নবাব ইস্‌লাম খাঁ ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া তাণ্ডাপুর পৌঁছেন। সেখানে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলিম খাঁ, পঁচেটের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা, মান্দারণের রাজার পিতৃব্য-পুত্র (একুনে) ১০৯টি ছোট বড় হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নবাবের বিশ্বাসী প্রিয় কর্ম্মচারী সেখ কমাল তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। *

হিজলীর জমিদার এই সলিম খাঁর আর অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় কৃষকগণ হিজলীর মস্‌নদ-ই-আলীদের মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে একটি ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টক-স্তূপ দেখাইয়া এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিল যে, ঐ স্থানে সিম্‌লী সাহ বা সলিম সাহ নামক জনৈক মুসলমানের নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ্ ছিল। উক্ত সিম্‌লী বা সলিম সাহ সম্বন্ধেও আর অধিক কিছু জানা

* প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩।

যায় নাই। এই সলিম সাহ ও পূর্ব্বোক্ত সলিম খাঁ একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু সঠিক বলা যায় না।

আবদুল লতিফের লিখিত বিবরণ অনুসারে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সলিম খাঁ হিজলীর জমিদার ছিলেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, সে সময় বাহিরীর করণ-বংশ হিজলীর মণ্ডল অধিকারীর পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহারাই হিজলীর রাজস্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত বাদসাহের প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিতেন। তাহা হইলে সে সময় হিজলীর জমিদার এই সলিম খাঁ কোথা হইতে আসিলেন? পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে দেখা যায়, এক সময় হিজলীর মণ্ডল অধিকারী বলভদ্র দাস রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিল্য করায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, সেই সময় সলিম খাঁ কিছু দিনের জন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক হিজলীর জমিদাররূপে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। পরে বলভদ্রের ভাবী বৈবাহিক রাজা অচ্যুতানন্দ তাঁহার জামীন হইলে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর বলভদ্রের কন্যার সহিত অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দের বিবাহ হয়। কোন্ বৎসর রসিকানন্দের বিবাহ হয়, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু রসিকমঙ্গল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তদনুসারে দেখা যায় যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে যখন সলিম খাঁ হিজলীর জমিদার, সে সময় রসিকানন্দের বয়স প্রায় ঊনবিংশ বৎসর। বিবাহের পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত বয়স নহে। এ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে ভ্যান-ডেন-ব্রুকের অঙ্কিত মানচিত্র সম্বন্ধে ভ্যালেন্‌টীনের স্মারক লিপিতেও তৎকালীন হিজলী-রাজ্যের কিঞ্চিৎ

বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আছে, 'উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ কটক নগরে অবস্থিত ছিল এবং তাঁহার অধিকার হিজলীদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিজলী বহুকাল যাবৎ নিজের রাজার দ্বারাই শাসিত হইতেছিল, পরে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে উহা প্রসিদ্ধ মোগল (Great Moghul) কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে হিজলী-রাজ্যের জনৈক ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, যিনি বাল্যকাল হইতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি কোন প্রকারে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় লোকজনের সাহায্যে হিজলী-রাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশী দিন উহা ভোগ করিতে হয় নাই। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হল্যাণ্ডদেশীয় বণিক্‌দিগের সাহায্যে তিনি পরাজিত ও ধৃত হইয়া অধিকতর সতর্কতার সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুনরায় কারারুদ্ধ হন। হুগলীর (Oegli) শাসনকর্ত্তা যিনি এই যুদ্ধে মোগল-সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি 'Zeevoogd' নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় হিজলীর শাসনভারও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার অধীনে জনৈক ক্ষুদ্রতর রাজা (Lesser chief) এ প্রদেশ শাসন করিতেন। অতঃপর সুলতান সুজা হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। হিজলী এক সময় পর্টুগিজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের প্রধান আড্ডা ছিল।' * ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, হিজলীর পূর্ব্বোক্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারীটি বাহাদুর খাঁ কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন হিন্দু রাজা, তাহা সঠিক বলা যায় না। †

ভ্যালেন্‌টীনের পুস্তকে হিজলী-রাজ্যের কথা।

* Valentijn's Memoirs to Van-den-Brocke's Map, p. 158.

† Blochman's Notes in the Hunter's Statistical Account of Bengal, part I. p. 387.

ভ্যালেন্‌টীনের উল্লিখিত হিজলীর অধিকারীটি যে কে, তাহা সঠিক বলা না গেলেও বাহাদুর খাঁ যে নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বাহাদুর খাঁ বা ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলীর ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছিল। সে কথা স্বীকার না করিলেও ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জীবিত থাকা সম্ভব নহে। তাজ্-খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলীর মৃত্যুর পর ১৫৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ হিজলীর রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময় ন্যূনকল্পে তাঁহার বয়স পনর বৎসর ধরিলেও ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় প্রায় একশত আঠার বৎসর। এইজন্য আমরা অনুমান করি যে, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশের কেহই হিজলী-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই হিজলীর প্রকৃত 'ন্যায়সঙ্গত অধিকারী' এবং 'বহুকাল যাবৎ' তাঁহাদের দ্বারাই হিজলী 'শাসিত হইয়াছিল।' হিজলী বা মালঝিটা প্রদেশ তৎকালে উড়িষ্যার অন্তর্ভূত থাকায় উহা উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দেই হিজলীর প্রাচীন রাজবংশ উন্মূলিত হয় এবং সেই বংশীয় কেহ কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনার পরেই মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সেই জন্য রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তে মাজনামুঠা ও জলামুঠা মহালের নাম নাই; কিন্তু সুলতান সুজার বন্দোবস্তে ঐ দুই মহালের নাম পাওয়া যায়।

আমাদের অনুমান, পর্টুগিজদিগের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের শত্রুতাচরণ করাই হিজলীর প্রাচীন রাজবংশের রাজ্যচ্যুতির প্রধান কারণ। ঐ সময় হিজলীতে পর্টুগিজদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল; তাহারা মোগল-রাজসরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। উত্তরকালে সাজাহান নামে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ভারতসম্রাট্ দিল্লীর

সিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে যখন পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বঙ্গদেশে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে-ছিলেন, সেই সময় তিনি পর্টুগিজদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা বিশেষরূপে অবগত হইয়া যান। পরে তিনি ভারত-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রথমেই পর্টুগিজদিগকে দমন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তাহারই ফলে দক্ষিণ-বঙ্গে 'নওয়ার মহালের' সৃষ্টি হয়, বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজলী ফৌজদারীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। * সম্ভবতঃ ঐ সময়েই হিজলীর অধিপতিও কারারুদ্ধ হইয়া-ছিলেন। ভ্যালেন্‌টীন যাঁহাকে প্রসিদ্ধ মোগল (Great Moghul) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্রাট্ সাজাহান। ইহার পরে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিজলীর উক্ত অধিপতিটি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় যে হিজলী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও ঐ পর্টুগিজ ও মগদিগের সহায়তায় করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নতুবা তাঁহার ন্যায় আবাল্য-কারারুদ্ধ হৃত-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে প্রবল-প্রতাপান্বিত মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভবপর ছিল না।

হিজলীতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পর্টুগিজদিগের সহিত ওলন্দাজ বণিক্-দিগের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। ব্যবসা উপলক্ষে পর্টুগিজরাই প্রথমে হিজলীতে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করে; তৎপরে ওলন্দাজ-গণ আসে; তাহাদেরও হিজলীতে প্রধান আড্ডা ছিল। হিজলীর বিদ্রোহী অধিপতিকে ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের সাহায্যে ধৃত ও কারা-রুদ্ধ হইতে দেখিয়াও মনে হয় যে, ঐ বিদ্রোহের মূলে পর্টুগিজরাও

* Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. III. p. 199.

ছিল। ঐ সময় হিজলীকে হুগলীর নওয়ার মহালের অন্তর্ভূত করায় উহা হুগলীর 'Zeevoogd' (প্রধান নৌসেনাপতি) উপাধিধারী শাসনকর্ত্তার অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। ভ্যালেন্টীন মাজনামুঠার রাজাকেই ক্ষুদ্রতর রাজা (Lesser chief) বলিয়া থাকিবেন। হিজলীতে পর্টুগিজ ও মগদিগের বিদ্রোহকাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

পাঠান-রাজত্বের বিবরণ লিখিতে গিয়া হিজলী-রাজ্যের প্রসঙ্গে আমরা মোগল-রাজত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। উৎকল-রাজ্যে আফ্গানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইবার পর মেদিনীপুর-জেলার অন্য অংশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, এখনও বলা হয় নাই। সোলেমন কররাণী কর্ত্তৃক উড়িষ্যায় আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও আফগানগণ বেশী দিন নির্ব্বিবাদে উড়িষ্যা ভোগ করিতে পারেন নাই। সোলেমনের সময়ে দিল্লীশ্বর মোগলকুলতিলক আক্বর শাহের প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সোলেমন তাহা বুঝিতে পারিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে তৎসমীপে উপহার প্রেরণ করিতেন; কিন্তু তৎপুত্র দাউদ্ শাহ পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া স্বীয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, সাড়ে তিন হাজার রণহস্তী ও বিশ হাজার কামান ও কয়েক শত রণতরী দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহার দ্বারা তিনি মোগলদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। * সে সংবাদ মোগল-বাদশাহের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। আক্বর আফগানদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার সেনাপতি মুনিম খাঁ ও রাজা তোডরমল্লকে প্রেরণ

মোগল-পাঠানে সজ্ঘর্ষ।

* রিয়াজ-উস-সালেতীন (ইংরাজী অনুবাদ) পৃঃ ১৫৪-১৫৫।

করিলেন। * বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় মোগল-পাঠানে বালেশ্বর, কটক, মেদিনীপুর, হাজিপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর যুদ্ধ ঘটে। ঐ সকল যুদ্ধের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী মোগলমারীর যুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ।

মোগলমারীর যুদ্ধ।

পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ্ শাহ পলায়ন করিলে রাজা তোডরমল্ল দাউদের অন্বেষণ করিতে করিতে মান্দারণের নিকট উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, দাউদ্ খাঁ বীন কেশরী বা দীন কেশরীতে (এই জেলার অন্তর্গত কেশিয়াড়ি গ্রাম; ইহার নিকটবর্ত্তী গগনেশ্বর গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে) থাকিয়া আপনার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্র করিতেছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ মুনিম খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। মুনিম খাঁ মহম্মদ কুলী খাঁ বরলাসের অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করেন এবং নিজেও রাজা তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন। ঐ সময় দাউদ্ শাহের সাহসী ভ্রাতুষ্পুত্র জুনায়দ্‌ও বহুসংখ্যক সেনা সহ দায়ুদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মোগলবাহিনী ঐ সম্মিলিত সেনাদলকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যৎকালে কেশিয়াড়ির দশ ক্রোশ অন্তরে গোয়ালপাড়া (পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত) নামক স্থানে উপস্থিত হয়, সে সময় আফগানসৈন্য দাউদ্ শাহের নেতৃত্বে ধরপুরে (দিগ্‌পারই পরগণার অন্তর্ভূত) অবস্থান করিতেছিল। † প্রথমে মোগল-সৈন্য দাউদের হস্তে দুইবার পরাজিত হইয়াছিল। পরে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ মেদিনীপুর জেলার তুরকাচোর পরগণার অন্তর্গত মোগলমারী নামক স্থানের ভীষণ যুদ্ধে দাউদ্ পরাজিত

* গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ১৭৮।

† District Gazetteer—Midnapore—p. 23.

হন।* ঐ ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক মোগল হত হইয়াছিল। সেই কারণে ঐ স্থান মোগলমারী নামে প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কয়েক দিবসের জ্বরে মহম্মদ কুলী খাঁ বর্‌লাস প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। † অদ্যাপি তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়।

মোগলমারীর যুদ্ধে দাউদ্ শাহ পরাজিত হইয়া জঙ্গল মহালের পথে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। রাজা তোডরমল্ল তাঁহার অনুসরণ করিলে দাউদ্ উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিলের সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে সমগ্র বঙ্গ-বিহারে আক্‌বরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; দাউদের হস্তে কেবল উড়িষ্যার অধিকার থাকে। ‡ ঐ সময় উড়িষ্যার উত্তরাংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মুরাদ খাঁ জলেশ্বরের শাসনকর্ত্তা নামে এই প্রদেশের প্রথম মোগল শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ¶

আফগান-বিদ্রোহ।

গৌড়ের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর দাউদ্ শাহ পুনরায় গৌড়-রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কটক হইতে অগ্রসর হইয়া ভদ্রকের মোগল শাসনকর্ত্তাকে হত্যা করিয়া জলেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলে, মুরাদ খাঁ জলেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া তাঁড়ায় পলায়ন করেন। আবার মেদিনীপুর জেলা পাঠানদিগের অধিকৃত হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই রাজমহলের নিকট হোসেন কুলী খাঁ তুর্কমান ও রাজা তোডর-মল্ল দাউদ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করেন। দাউদের ছিন্ন মস্তক

---

* আইন-ই আক্‌বরী (ইংরাজী-অনুবাদ) তৃতীয় ভাগ—পৃঃ ৩৭৬।

† District Gazetteer—Midnapore p. 23.

‡ আক্‌বর নামা (ইংরাজী অনুবাদ) তৃতীয় ভাগ ১৮৪—১৮৫।

¶ J. A. S. B., New Series—Vol. XII. 1916. No 1. p. 46.

দিল্লীতে আক্‌বর শাহের নিকট প্রেরিত হয়। * দাউদের পতনের পরও পাঠানগণ কয়েকবার বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাহারা সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বনামখ্যাত বীর রাজা মানসিংহ জলেশ্বরের যুদ্ধে আফ্‌গানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত উড়িষ্যা-রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে বাঙ্গালার সুবাদার প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার আখ্যা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দে ওস্‌মান্ খাঁর নেতৃত্বে আফ্‌-গানগণ বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর-সমেত একপ্রকার সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। রাজা মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তিস্থাপন করেন। ইহার দশ বৎসর পরে আফগানগণ ওস্‌মান্ খাঁর নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হয়। এই সময় (১৬১১ খৃষ্টাব্দ) সুবর্ণরেখার যুদ্ধে তাহারা মোগল-বাহিনী কর্ত্তৃক সাংঘাতিক-রূপে পরাজিত হইয়া ভবিষ্যতে আর বিশেষ কোন গোলযোগ করিতে পারে নাই। †

পাঠান-রাজত্বে মেদিনীপুর জেলা।

পাঠান-রাজত্বে মেদিনীপুরের দুঃখের অন্ত ছিল না। পাঠান-মোগ-লের নিয়ত বিবাদে, জমিদারদের অত্যাচারে মেদিনীপুরের প্রজা-সাধারণ নিতান্ত অশান্তিতে দিন কাটাইত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দু-রাজত্বের শেষ অবস্থায় তাহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ক্ষমতাশালী দেশাধিপতিগণ একপ্রকার অর্দ্ধ-স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠান-রাজত্বেও তাঁহারা কতকটা করদ-মিত্র রাজার ন্যায় ছিলেন। সাধারণ

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৩৮১।

† District Gazetteer—Midnapore—p. 24-25.

প্রজা কিংবা দেশ-রক্ষণের ভার তাহাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। সেই জন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিস্তর সৈন্য ও সৈন্য-দিগের গমনোপযোগী যান থাকিত। নির্দ্দিষ্ট রাজকর দিলেই তাঁহারা স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজেদের এলাকায় চলিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ছিল না। তাঁহাদের কর্ম্মচারীরাও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। পাঠানরাজ সহজে তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সুযোগে প্রজা-সাধারণের উপর তাঁহারা যথেচ্ছাচার করিতেন, অথচ কোন প্রতীকার হইত না। সে সময় প্রজাগণের ধন-প্রাণ একবারেই নিরাপদ্ ছিল না। বেদেরা ছেলে চুরি করিত, পথ বিপৎ-সঙ্কুল ছিল, প্রজাদিগকে নানাবিধ কর দিতে হইত; দিতে না পারিলে দুষ্ট জমিদারগণ প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দিত, কুলবধূগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অবমাননা করিত। পাছে তাহারা এই সকল অত্যা-চারের ফলে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়, এই জন্য তাহাদের উপর পাহারা নিযুক্ত করা হইত। দরিদ্র উৎপীড়িত প্রজাগণ অগত্যা গরু, বাছুর, হাল, বলদ, গৃহ-সামগ্রী যাহা কিছু থাকিত, তাহাই বিক্রয় করিয়া কর দিত। কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই অনেক বেশী হওয়ায় এক টাকার জিনিস দশ আনায় বিক্রয় হইত। পোদ্দার বা মহাজনগণ প্রজাদিগের নিকট সাক্ষাৎ যমের ন্যায় পরিলক্ষিত হইত। টাকায় দশ পয়সা করিয়া বাটা দিতে হইত এবং এক টাকায় দৈনিক সুদ এক পাই হিসাবে নির্দ্ধারিত ছিল। * এইরূপে কত প্রকারে যে প্রজা-সাধারণ নির্য্যাতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। তৎকালীন অনেক বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

---

* A Glimpse of Bengal in the 16th. century. Calcutta Review, 1891, pp. 352—58. District Gazetteer, Midnapore, p. 22-23.

চক্রবর্ত্তীর চণ্ডী-কাব্যের ভূমিকায়ও উহার পরিচয় পাওয়া যায়। হোসেন সাহ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের পর হইতেই এক প্রকার এই অশান্তির সূচনা হইয়াছিল এবং যত দিন পর্য্যন্ত না মোগল-রাজত্ব এ-দেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়,তত দিন পর্য্যন্ত এই অশান্তি স্থায়ী হইয়াছিল। অবশেষে মোগলকুলতিলক আকবর সাহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইলে দেশের শান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে।

নরমপুরের মস্‌জিদ্

সপ্তম অধ্যায়।

মুসলমান-অধিকার—মোগল-রাজত্ব।

উড়িষ্যায় মোগলদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে মেদিনীপুর-খণ্ডও মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর সাহের বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব রাজা তোডরমল্ল সেই সময় উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে উড়িষ্যা-প্রদেশ পাঁচটি 'সরকার' ও নিরানব্বইটি 'মহালে' বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ ভূভাগই সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। তৎকালের সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভূত নিম্নলিখিত কুড়িটি মহাল এই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আছে।—(১) বগড়ী, (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর, (৪) মেদিনীপুর, (৫) খড়কপুর, (৬) কেদারকুণ্ড, (৭) কাশিজোড়া, (৮) সবঙ্গ, (৯) তমলুক, (১০) নারায়ণপুর, (১১) তরকোল, (১২) মালঝিটা, (১৩) বালিশাহী, (১৪) ভোগরাই, (১৫) দ্বারশরভূম, (১৬) জলেশ্বর, (১৭) গাগনাপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই বা কেরৌলী ও (২০) বাজার। এতদ্‌ব্যতীত তৎকালের বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তর্গত চিতুয়া, সাহাপুর, মহিষাদল ও হাভেলী মান্দারণ নামে আর চারিটি মহালও ইদানীন্তন কালের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগ।

প্রত্যেক মহালের শাসন-সংরক্ষণ ও রাজস্ব-আদায় প্রভৃতি কার্য্যের ভার এক এক জন জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা তোডরমল্ল প্রাচীন দন্তপাঠ বিভাগগুলির ভাঙ্গা-গড়া করিয়াই মহালগুলি গঠিত করিয়াছিলেন। এই কারণে দেখা যায়, কোন কোন মহালে পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ-স্বাধীন প্রাচীন দেশাধিপতিগণের বংশধরগণই নবগঠিত মহালগুলির জমিদাররূপে স্বীয় স্বীয় অধিকারমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যে সকল দেশাধিপতিগণ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয় বিতাড়িত করা হইয়াছিল। মোগল-শাসনে পাঠান-রাজত্বের দুর্ব্বলতা ছিল না। এই জন্য জমিদার-গণ বুঝিয়াছিলেন যে, এখন আর তাঁহাদের পূর্ব্বের মত যথেচ্ছাচার চলিবে না। তাই তাঁহারা ঐ সময় হইতে বিশেষ সংযত হইয়া চলিতে আরম্ভ করেন।

মোগল-রাজত্বে জমিদার।

জমিদারী সনন্দ-দানের প্রথা মোগল-রাজত্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন জমিদারী পত্তন হইলে জমিদারকে সনন্দের নিয়ম-পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হইত। যথেচ্ছ জমিদারীর উচ্ছেদে মোগল-বাদ্-সাহের আইন-সঙ্গত ক্ষমতা থাকিলেও দেশাচার অনুসারে কোন জমিদারের লোকান্তর হইলে পর প্রায়ই তাঁহার উত্তরাধিকারীরাই জমিদারী পাইতেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে নূতন সনন্দ লইতে হইত। বিদ্রোহ বা রাজস্বদানে চির-শৈথিল্যই উৎখাতের সর্ব্বপ্রধান কারণ ছিল। তবে সুবাদার প্রসন্ন না থাকিলে সময় সময়ও জমিদারী অন্যের হস্তে চলিয়া যাইত। প্রজাপালন করিয়া ও মহালের সরহদ্দ বজায় রাখিয়া, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া যাহাতে প্রাপ্য রাজকর রীতিমত আদায় ও সরকারে দাখিল হয়, তাহাই জমিদারের প্রধান

কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথ সংস্কার ও দুষ্টের দমনও জমিদারের অন্যতম কার্য্য ছিল। তাঁহাদের দরবার, দুর্গ ও সেনাদলও থাকিত। পূর্ব্বোক্ত কুড়িটি মহালে পনরটি দুর্গ ছিল এবং আবশ্যক হইলেই সাড়ে তিন হাজার তীরন্দাজ ও মশালবাহক সৈন্য এবং দুই শত অশ্বারোহী রাজসরকারে সরবরাহ করিতে হইত। * মহালের ঐ সকল জমিদারদিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিবার জন্য আমীল (Chief Executive Officer) ও কাননগো (Chief Revenue Officer) নামে অভিহিত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ছিলেন।

বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত চারিটি মহাল ও উড়িষ্যার সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত প্রথমোক্ত চতুর্দ্দশটি মহাল যে সকল জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল, তাঁহাদের কাহারও কাহারও বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, আর কাহারও বংশ বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা সেই অষ্টাদশটি জমিদার-বংশের যে সকল বিবরণ বা জমিদার-গণের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পরবর্ত্তী 'জমিদার-বংশ'-শীর্ষক অধ্যায়ে সে কথা বিস্তারিত আলোচনা করিব। দ্বারশরভুম, জলেশ্বর, গাগনাপুর, রাইন, করোই ও বাজার নামক অবশিষ্ট ছয়টি মহালের জমিদারগণের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদার-বংশ।

হিন্দু-রাজত্বের ভঞ্জভুম বারিপাদা নামক দণ্ডপাঠ বিভাগটি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানা হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জরাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি ভঞ্জভুম বারি-

* J. A. S. B. Vol. XII. 1916. No. I. pp 46-56.

পাদার অন্তর্গত ছিল। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগের সময় এই দণ্ডপাঠটি বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, দ্বারশরভূম ও বারিপাদা নামে ছয়টি মহালে বিভক্ত হইয়াছিল, দেখা যায়। বর্ত্তমান কেশিয়াড়ী নামক পরগণাটি দ্বারশরভূম মহালের অন্তর্ভূত। ঐ স্থানের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরগাত্রে ও মন্দির-অভ্যন্তরস্থ 'বিজয়-মঙ্গলা' মূর্ত্তির পাদপীঠে সংলগ্ন উড়িয়া ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ঐ ভূভাগে রঘুনাথ ভূঞা নামক জনৈক জমিদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র চক্রধর ভূঞা ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ মানসিংহের তিন অঙ্কে সোমবারে দেবীমন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বহুকাল হইতে এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জনশ্রুতি, মহারাজ মানসিংহ যখন উড়িষ্যা-বিজয়ে আসিয়া ঐ প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি ঐ প্রাচীন দেবী-মূর্ত্তির সুগঠিত ভক্তিভাবোদ্দীপক সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালীন জমিদার চক্রধর ভূঞাকে মন্দির প্রস্তুত করিবার আদেশ দেন এবং কতকাংশ ভূভাগ দেবীর সেবা-পূজার ব্যয়ের জন্য প্রদান করেন। এই ভূঞাবংশ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। ইহাঁদের সহিত দ্বারশরভূম মহালের প্রাচীন জমিদার-বংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, সাঁতরা গ্রামের বর্ত্তমান জমিদারবংশ পূর্ব্বোক্ত চক্রধর ভূঞার অধস্তন পুরুষ।

জলেশ্বর, গাগনাপুর, রাইন, করোই বা কেরৌলী মহালের কোন জমিদারের নাম পাওয়া যায় নাই। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, বাজার মহালটির পরিমাণ-ফল অতি সামান্যই ছিল, কিন্তু সেই তুলনায়

* কেশিয়াড়ী—শ্রীযুক্ত রাধানাথ পতি বি,এল প্রণীত।

উহার রাজস্ব অনেক বেশীই ধার্য্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, সম্ভবতঃ ঐ স্থানে একটি সুবৃহৎ বাজার থাকায় ঐ স্থানের আয়ও ঐরূপ বেশী ছিল। আমরা অনুমান করি, সেই জন্যই উহাকে একটি পৃথক্ মহাল বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু তথায় কোন পৃথক্ জমিদার ছিলেন, কি অন্য উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত, তাহা বলা যায় না।

মেদিনীপুরে সাজাহান।

সম্রাট্ আক্‌বরের রাজত্বকালে একজন সুবাদারের দ্বারাই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা শাসিত হইতেছিল। কিন্তু সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-সময়ে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র, উত্তরকালে সম্রাট্ সাজাহান নামে পরিচিত সাহাজাদা খোরাম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আহম্মদ বেগ খাঁ পলাইয়া বর্দ্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান অধিকৃত ও নবাব ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত করিয়া সাহাজাদা বঙ্গবিজয় করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী ছিলেন। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সেনাদল এলাহাবাদের সন্নিকটে তাঁহাকে পরাজিত করিলে তিনি মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। * এই বিদ্রোহে পাঠান সামন্তরা এবং কয়েকজন হিন্দু রাজাও খোরামের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি যখন মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, সেই সময় নারায়ণগড়ের জমিদার রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যে তাঁহার গন্তব্যপথ প্রস্তুত করিয়া দেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি ভারতসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে

* District Gazetteer—Midnapore—p. 27.

রাজাকে "মাড়িসুলতান" বা পথের রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত বংশীয়গণ সেই উপাধিতে আখ্যাত হইতেন।

সম্রাট্ সাজাহানের পঞ্চাঙ্গুলীযুক্ত পারস্যভাষায় লিখিত উপাধিনামা নারায়ণগড় রাজভবনে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ছিল। যাঁহারা পত্রিকাখানি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, উহাতে রক্তচন্দনে সম্রাটের পঞ্চাঙ্গুলী-চিহ্ন সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নারায়ণগড়-রাজবাটীতে উক্ত উপাধিনামাটি নাই। সম্ভবতঃ নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের অবস্থান্তর হইলে বর্ত্তমান জমিদারগণ যে সময় রাজসরকার হইতে কাগজপত্র গ্রহণ করেন, সেই সময় অন্যান্য কাগজের সঙ্গে সম্রাট্-প্রদত্ত পত্রখানিও রাজসংসার হইতে বাহির হইয়া যায়। যে বংশীয়গণ সম্রাট্-প্রদত্ত সম্মানের নিকট অবনত ছিলেন, তাঁহাদের আর রাজত্ব নাই, বংশও লোপ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অপরের নিকট উহা একখানি সামান্য কাগজ ভিন্ন আর কি হইবে? পূর্ব্বোক্ত উপাধিনামাটি ব্যতীত সম্রাট্-প্রদত্ত পারস্যভাষায় লিখিত একখানি ফার্ম্মানও উক্ত বংশের নিকট ছিল। ঐ বংশের শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল মাড়ি সুলতান এক সময়ে বঙ্গের তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহার সহিত উক্ত ফার্ম্মানখানির একখানি ইংরাজী অনুবাদও দেওয়া হইয়াছিল। সম্রাট্ সাজাহান যে ঐ রাজবংশকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তাহা উক্ত ফার্ম্মানখানির নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধি হইবে :—

"রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ, জায়গীরদার, চৌধুরী, কাননগোগণ! এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে, যেহেতু, নারায়ণগড়-রাজাকে পূর্ব্ব-শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক জমিদারী, নানকর প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং

নারায়ণগড়-রাজবংশ—ত্রৈলোক্যনাথ পাল।

রাজা এক্ষণে আমাদিগের অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সহ সম্মুখে নীত হইয়াছেন; তাঁহার বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরতার বিষয় যাহা অবগত হওয়া গেল, তদ্দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত জমিদারী এবং নানকর প্রভৃতি প্রত্যর্পণ করা হইল। আপনাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে, রাজাকে উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী স্বীকার করিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহাকে রাজস্বাদি ভোগদখল করিতে দিবেন। তাঁহার স্বত্ব-লভ্যের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হয়। প্রাগুক্ত জমিদারের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি রাজকীয় পরিমিতব্যয় এবং প্রজাদিগের মঙ্গলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বস্ততা-রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। অপিচ, উক্ত স্থানের লোকসংখ্যা এবং প্রজাসমূহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন।" *

নরমপুরের মসজীদ।

মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত নরমপুর পল্লীতে একটি অসম্পূর্ণ মসজীদ্ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, যে সময় সাহাজাদা খোরাম দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে এক-দিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই দিবস মুসলমানদিগের ইদ্ পর্ব্ব থাকায় এক দিনের মধ্যেই সাহাজাদার উপাসনার জন্য ঐ মসজীদটি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু এত অল্পসময়ের মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সমভিব্যাহারী ওমরাহগণ সহ সেই অসম্পূর্ণ মসজীদে নামাজ করিয়াছিলেন। সাজাহানের মেদিনী-পুর আগমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অদ্যাবধি ঐ মসজীদটিকে সেইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রাখা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ মসজীদটি সাজাহানের নয়, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের উপাসনার জন্য এক রাত্রির মধ্যে

* নারায়ণগড়-রাজবংশ—ত্রৈলোক্যনাথ পাল—পৃঃ ১৯।

প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মেদিনীপুর আগমনের কোন প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

মোগল-রাজত্বের প্রারম্ভে হিজলী এ প্রদেশের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঐ সময় তমলুকের বাণিজ্যখ্যাতি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে হিজলী ধীরে ধীরে পূর্ব্বপ্রদেশের একটি বিরাট্ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইতেছিল। ঐ প্রদেশে তখন অপর্য্যাপ্ত ধান্য ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং নানাপ্রকার সূতার কাপড়, চিনি, ঘৃত ও মাখনাদিও পাওয়া যাইত। দেশ-বিদেশের ব্যবসায়িগণ বাণিজ্যার্থে জাহাজ বোঝাই করিয়া সেই সকল দ্রব্য লইয়া যাইতেন। হিজলীর ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রালফ্‌ফিচ্ লিখিয়াছিলেন, "এই এঙ্গেলী বন্দরে প্রতিবৎসর ভারত (?), নাগাপট্টম্, সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি বিবিধ স্থান হইতে বহু তরী সমাগত হইত এবং তথা হইতে চাউল, কার্পাস, সূতার কাপড়, পশম, চিনি, লঙ্কা, মাখন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইত।" †

হিজলী বন্দরে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ।

হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণ একে একে আসিয়া ধীরে ধীরে হিজলীতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে পর্টুগিজরাই প্রথমে আসে, তৎপরে যথাক্রমে হলণ্ড দেশের অধিবাসী ওলন্দাজগণ, ইংরাজগণ এবং সর্ব্বশেষে ফরাসীগণ আসিয়াছিল। হিজলীতে পর্টুগিজদিগের একটি কুঠী ও একটি গির্জ্জা ছিল। ভ্যালেণ্টাইন ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে হিজলীতে ওলন্দাজদিগের অন্যতম প্রধান

* District Gazetteer—Midnapore—p. 210.

† District Gazetteer—Midnapore—p. 184.

কুঠী ছিল, পর্টুগিজরাও ঐ স্থানে কুঠী ও গির্জ্জা নির্ম্মিত করিয়াছিল। ঐ স্থানে এবং কেন্দুয়া, কণিকা ও ভদ্রকে চাউল প্রভৃতি বিক্রয় হইত। শেষে আমরা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করি। এখনও তাম্বূলী ও বাঁজিয়া নামক স্থানে পর্টুগিজদিগের গির্জ্জা আছে এবং ঐ সকল স্থানে তাহাদের ব্যবসাও আছে। এই স্থানের মোমের ব্যবসা প্রসিদ্ধ।" * এই বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, তখনও তাম্বূলী বা তমলুক একবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। গামেলী কারেরী ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, "পর্টুগিজগণ বাঙ্গালার তাম্বূলীন জয় করিয়াছিল।" † তমলুক ও হিজলীর সহিত পর্টুগিজদিগের নাম অবিচ্ছেদ্য। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্দ্দান্ত বর্গীদিগের দ্বারা বঙ্গভাগ্যে যেরূপ অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার শতবর্ষ পূর্ব্বেও একদল দস্যুর অত্যাচারে পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সেইরূপ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। ইতিহাসে তাহারাই মগ ও পর্টুগিজ দস্যু নামে পরিচিত।

পর্টুগিজরা ইউরোপের পর্ত্তুগাল দেশের অধিবাসী। পর্ত্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের শাসনসময়ে বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডি-গামার উদ্যোগে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হইলে পর পর্টুগিজগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। তাহারা প্রথম

হিজলীতে মগ ও পর্টুগিজ দস্যু।

রাজ্যলাভাশায়েই এ দেশে আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও ভারতের সে দিন আসে নাই দেখিয়া তাহারা অগত্যা সৈনিক-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বণিক্-

* District Gazetteer—Midnapore—p. 26.

† Dr. John Francis Gemeli Careri—A Voyage Round the World in Churchhill's Collections of Voyages and Travels, vol IV., p. 109., District Gazetteer—Midnapore—p. 27.

বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সে সময় তাহারা এ দেশে সাধারণতঃ ফিরিঙ্গী নামেই পরিচিত ছিল।

আরাকানরাজ মোগলদিগের আক্রমণ হইতে সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত পর্টুগিজদিগকে চাটগাঁ বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে চাটগাঁ 'পোর্ট গ্র্যাণ্ডো' নামে অভিহিত হইত এবং উহা আরাকানরাজের অধিকারভুক্ত ছিল। পর্টুগিজরা আরাকান দেশের মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনার মোহানায় সন্নিহিত সন্দ্বীপ ও দক্ষিণ-সাহাবাজ-পুর অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপনাদিগের মধ্য হইতে গঞ্জেলো নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করে। তাহারা প্রথম প্রথম অসাধারণ বিনয়, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক বলে ভারত-বর্ষে যথেষ্ট সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা ও নানাপ্রকার পাপস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে তাহাদের পতনও আরম্ভ হয়। * ইহার পর হইতে তাহারা কখনও বণিক্‌বৃত্তি, কখনও বা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

* There prevailed every where in their manners a mixture of avarice, debauchery, cruelty and devotion. They had most of them 7 or 8 concubines whom they kept to work with utmost rigour and forced from them the money they gained by their labour. Such treatment of woman was very repugnant to the spirit of chivalry * * * Effiiminacy introduced itself into their houses and armies. The officers marched to meet their enemies in palamquins. That brilliant courage. which had snbdued so many nations, existed no longer in them."

Abbe Raynels' History of Settlement and Trade in the East and West Indies. vol. I. Book I. p. 141.

হুগলী নগরীতে পর্টুগিজদিগের একটি সুরক্ষিত কুঠী ছিল। তাহারা বঙ্গোপসাগর দিয়া গঙ্গার মোহানায় প্রবেশ করত হুগলী যাতায়াত করিত। ঐ গঙ্গার মোহানাতেই হিজলী প্রদেশ অবস্থিত থাকায় তাহারা প্রায়ই এই প্রদেশকে আক্রমণ করিত এবং প্রজাবৃন্দের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। তাহারা জোর করিয়া লোককে খৃষ্টান করিত; একদেশের লোককে অন্যদেশে লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ঘর জ্বালানো, নরহত্যা, সতীত্বনাশ প্রভৃতি মহাপাপে কি ফিরিঙ্গী, কি মগ বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। তাহাদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন একদিকে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তেমনই অন্যদিকে অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদও জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। মেজর রেনেলের সপ্তদশ শতাব্দীর মানচিত্রে অনেক স্থান মগদিগের অত্যাচারে জনশূন্য বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

সিহাব উদ্দীন তালিশের ফার্সীতে লিখিত বিবরণে দেখা যায়, সম্রাট্ আক্‌বরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পর হইতে এবং সায়েস্তা খাঁর নবাবী আমলে চট্টগ্রাম-বিজয় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুরা বাঙ্গালার নানা স্থানে দস্যুবৃত্তি করিত। তাহারা হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা যাহাকে পাইত, তাহাকে ধরিয়াই নৌকায় তুলিত; তাহাদের কর ছিদ্র করিয়া দিত; ছিদ্রমধ্যে পিষ্ট বেত্র দিয়া স্তূপাকারে নৌকার পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মুর্গীকে ধান দিবার মত কিছু ভাত ছড়াইয়া দিত। অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য সময় সময় তাহারা ঐ সকল হতভাগ্যকে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরে আনিত। তাহাদের আগমনের সংবাদ পাইলেই, পাছে তাহারা কূলে নামিয়া উপদ্রব করে,

এই আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ লোকজন লইয়া কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং টাকা দিয়া নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দরে বনিলে দস্যুরা টাকা লইয়া প্রেরিত লোকের সঙ্গে বন্দীদিগকে পাঠাইয়া দিত। * ঐ সকল দস্যুদল অতীব দক্ষতার সহিত নৌকা চালাইত। তাহারা দ্রুতগামী তরী বাহিয়া, হাটের দিনে, বিবাহদিবসে বা অন্য কোন ঘটনা উপলক্ষে যেখানে লোক-সমাগম হইবার সংবাদ পাইত, সেখানে নিঃশব্দে উপস্থিত হইত এবং প্রচণ্ড-বিক্রমে সমবেত জনসঙ্ঘের উপর পতিত হইয়া ধনজন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। তাহাদের নির্ম্মম অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের নিরীহ প্রজাবৃন্দ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িত। তাহাদের অত্যাচারেই 'ফিরিঙ্গী' ও 'মগের মুল্লুক' বাঙ্গালা ভাষায় ঘৃণিত শব্দে পরিণত হইয়াছে।

সাহাজাদা খোরাম যখন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পর্টুগিজদিগের অত্যাচারের কথা বিশেষভাবে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি ভারত-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া তাহাদের অত্যাচার দমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার আদেশে বাঙ্গালার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা কাশীম খাঁ ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্টুগিজ ব্যবসায়ীদিগের প্রধান আড্ডা হুগলী অধিকার করেন। হুগলী অধিকৃত হওয়ায় তাহাদের ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা হিজলীর কুঠী হইতেও বিতাড়িত হয়। † ঐ সময় হইতে পর্টুগিজদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিকাংশ পর্টুগিজ বালক-বালিকারাই ক্রীতদাসরূপে নীত হয় এবং সুন্দরী যুবতারা বাদসাহ ও ওমরাহদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করে। পুরুষদিগের কেহ কেহ জমিদারদিগের

---

* J. A. S. B, The Ferenghee Pirates of Chitagaon, 1907. p. 422,

† W. Hedge's Diary, Yule, vol. II, p. 240.

অধীনে গোলন্দাজী কার্য্য গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

সাজাহান মগদিগকে দমন করিবার জন্য 'নওয়ার মহাল' গঠিত করিবার আদেশ দেন এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত করেন। * ঐ সকল 'নৌয়ারা' অর্থাৎ নৌসৈন্যের জন্য ঢাকা প্রদেশে ৭৬৮টি রণতরী রক্ষিত হইয়াছিল এবং উহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে ৭৮,৯৫৪ টাকা আয়ের ৫৫টি মহাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সময় হিজলীতেও একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। হিজলীর ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, প্রধানতঃ জলদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গোপসাগরকূলকে রক্ষা করিবার জন্যই হিজলীতে একটি ফৌজদারী স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। এতদ্‌ব্যতীত হুগলী বন্দরকে সুরক্ষিত করাও হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। † সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্টুগিজ প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিকেরা বাণিজ্যের জন্য হুগলীতে আগমন করায় হুগলী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল। হুগলীতেও একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত থাকে। হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানেই হিজলী অবস্থিত। সুতরাং উহা সুরক্ষিত হইলে হুগলী বন্দর এবং হুগলী নদীর পশ্চিমতীরস্থ অনেক স্থানই শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ্‌ হইবে, এই উদ্দেশ্যেই হিজলী ফৌজদারী

হিজলীতে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠা।

* Fifth Report—Firminger—pt. II. p. 182.

† Hunter's Statistical Account, vol. III., p. 199.

প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখিতে গেলে, বর্ত্তমান সময়ে ডায়মণ্ড-হারবার দুর্গ যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনেরও সেই একই উদ্দেশ্য ছিল।

কসবা-হিজলী গ্রামে হিজলীর ফৌজদারের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে ফৌজদারদিগের ক্ষমতা অসীম ছিল। বাঙ্গালার নবাব ও প্রধান সেনাপতির পরেই ফৌজদারদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট হইত। তাঁহাদিগের হস্তে দেশের শাসন ও বিচার-ভারের সহিত সৈনিকবলও ন্যস্ত থাকিত। তাঁহারা সেই সকল সৈন্যের সাহায্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা এবং দেশীয় দস্যুদলকে দমন করিতেন। হিজলীতে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সর্ব্বদাই হিজলীর উপকূলে নওয়ার রণতরী-সমূহ সজ্জিত থাকায় মগদিগের অত্যাচার নিবারিত হয়। তাহারা তখন এ প্রদেশে লুণ্ঠনের আশা ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বঙ্গকে উৎসন্ন দিতে থাকে। পরে সায়েস্তা খাঁ সুবাদার হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া চাটিগাঁ মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

জলদস্যুদিগের অত্যাচারে যে সকল নৌকাদি লুণ্ঠিত হইত, তাহাদের নষ্টাবশেষ রক্ষা ও উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিবার জন্য হিজলীর ফৌজদার সমুদ্রোপকূলে স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সরকারী কাগজপত্রে তাহারা 'সরবোলা' নামে অভিহিত হইত। তাহারা সমুদ্রোপকূলে পাহারাস্বরূপ নিযুক্ত থাকিত; নৌকা বা জাহাজডুবি দ্রব্যাদি পাইলে সরকারে দাখিল করাও তাহাদের কার্য্যমধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে জন্য তাহারা বার্ষিক বৃত্তি পাইত। কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভেও এই প্রদেশে সরবোলাদিগের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু শেষে

হিজলীর সরবোলা।

তাহারাই রক্ষক থাকিয়া ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিমজ্জিত বা শত্রুর অত্যাচারে উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাহারা তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়া তাহাদের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিত। অধিকন্তু, তাহারা মিথ্যা সঙ্কেত দ্বারা নৌকার লোকজনকে বিপৎসঙ্কুল স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। * এই কারণে উত্তরকালে তাহাদের কার্য্য রহিত করিয়া দেওয়া হয়।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লী হইতে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। সাজাহানের শাসনসময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলে, সে সময় উড়িষ্যাও তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন করা হয়। সুজা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার রাজস্বের এক নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; সে কথা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ঐ বন্দোবস্তে তোডরমল্লের সময়ের সরকার ও মহালগুলির ভাঙ্গাগড়া করিয়া তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্রতর সরকার ও মহালের সৃষ্টি করেন। ইহার ফলে এ দেশের জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবার কোন কোন জমিদারের অধিকারে একাধিক মহালও ছিল, দেখা যায়। সে সময় সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালের অধিকারিগণ চৌধুরী বা তালুকদার আখ্যায় এবং বড় বড় মহালের অধিকারিগণ রাজা বা জমিদার নামে অভিহিত হইতেন। সুজার এই নূতন রাজস্ব-বন্দোবস্তে যে সকল জমিদার-বংশের অভ্যুদয়

সুলতান সুজার সুবাদারী।

* Selections from the Records of the Board of Revenue L. P. Bengal. "Report on the Settlement of the Jallamutha Estate in the District of Midnapore by Messers Mill and Bayley" p. 280.

হইয়াছিল, তাঁহাদেরও কাহারও কাহারও বংশ এখনও আছে। আমরা উহাঁদের বংশবিবরণ ও সেই সময়ের অন্য যে সকল বংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের যাহার যাহার সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পরবর্ত্তী 'জমিদার-বংশ'-শীর্ষক অধ্যায়ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিব।

সুলতান সুজা প্রায় ২০ বৎসর বাঙ্গালায় সুবাদারী করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের উৎপাত এক প্রকার নিবারিত হইয়াছিল। সঙ্গীতপ্রিয়, উদারহৃদয়, সাহসী সুজার শাসনে বাঙ্গালায় আবার কিছুদিনের জন্য সম্পদ্ ও আমোদ ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সুখের কাল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বৃদ্ধ সাজাহান পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহার তৃতীয় পুত্র কূটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেবের ষড়্‌যন্ত্রে তিনি কারাগারে নীত হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা প্রাণ হারাইলেন, ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সুজা দুই বৎসর যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন। সেখানে বিশ্বাসঘাতক মগ-রাজার হস্তে বন্ধুহীন, ভাগ্যহীন সুজা সবংশ নিহত হইলেন। সুজার সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ লইতে তাঁহার কেহই রহিল না, কিন্তু তিনি যে মহান্ জাতিকে বাঙ্গালায় আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই মহান্ ইংরাজ জাতি ইহার ন্যূনাধিক একশত বৎসর পরে পলাশী-ক্ষেত্রে মোগলদিগকে সুজার মৃত্যুর প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় ইংরাজ কোম্পানী

সুজার শাসনকালেই সুবিখ্যাত স্বদেশ-হিতৈষী ডাক্তার বৌটনের কল্যাণে ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকামাত্র পেস্কস দিয়া বিনা মাশুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। যে উদ্যমশীল প্রবল জাতির ভাগ্যসূত্রে সম্প্রতি সমগ্র ভারত গ্রথিত, তাঁহাদের

ভারতে আগমনের প্রথম কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইউরোপীয় বণিক্‌গণের মধ্যে পর্টুগিজরাই প্রথমে বাঙ্গালায় আসেন, তৎপরে ওলন্দাজগণ ও তাঁহাদের পরে ইংরাজগণ আসিয়াছিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের ইংরাজগণ মছলিপত্তন হইতে প্রথমে উড়িষ্যার উপকূলভাগে হরিহরপুরে ও পরবৎসরে বালেশ্বরে প্রবেশ করিয়া শুভ-দিনে, শুভক্ষণে মোগল শাসনকর্ত্তাকে পূজোপচারে বশীভূত করিয়া তাঁহারা এ দেশে বাণিজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তার পর যেরূপে তাঁহারা বঙ্গে আসিয়া 'শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াছেন,' তাহার ইতিহাস একদিকে যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনই অন্যদিকে জগতের ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইংরাজ জাতির সেই প্রথম কালের ইতিহাসের সহিত হিজলার সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। *

মোগলের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ ও হিজলী অধিকার।

ইংরাজী ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও কিয়ৎপরিমাণে স্বীয় কর্ম্মচারিগণের অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথম প্রথম এ দেশে ইংরাজ কোম্পানী বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ইংরাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ জব চার্ণকের সহিত দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। ঐ সময় নানা কারণে মোগলের সহিত ইংরাজের আদৌ বনিবনাও ছিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টার-গণ তাহা অবগত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে, মোগলের সহিত যুদ্ধ-ঘোষ-ণাই সমীচীন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মান্দ্রাজের ফোর্ট জর্জ্জের শাসনকর্ত্তাকে

* C. R Wilson's Early Annals of the English in Bengal Volume II.

ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফার্ম্মান্ গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্ম্মাণ এবং ভবিষ্যতে নবাব বা তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজ কোম্পানীর উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার আদেশ-প্রদানের ব্যবস্থা করিতেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন। আদেশ-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সৈন্য-প্রেরণেরও বন্দোবস্ত করিলেন; কাপ্তেন নিকল্সনের অধীনে দশখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইল। প্রত্যেক জাহাজে দশ বারটি করিয়া কামান ও ছয়শত করিয়া সৈনিক ছিল।

ইতিমধ্যে চার্ণক নবাবের আদেশে ইংরাজগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইবে সংবাদ পাইয়া এবং কোম্পানীর ডিরেক্টারগণও মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন অবগত হইয়া সমাগত রণপোত ও ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর নবাবের তিন সহস্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহীকে বিতাড়িত করিয়া হুগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করিলেন। ফৌজদার এই ব্যাপারে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন এবং চার্ণকও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ইহার পরেই বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইংরাজের বিপদ্-নাটকের এক অঙ্ক মেদিনীপুরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। হুগলী-যুদ্ধের পর হুগলী নদীর উপর ইংরাজদিগের কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া যায়; ইংরাজদিগের রণপোত সমূহ একপ্রকার সমগ্র হুগলী নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু নদীর পার্শ্ববর্ত্তী যুদ্ধোপযোগী তেমন কোন স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ প্রথমে ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; চার্ণক সেই আশাতেই সূতানুটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার

কিছুকাল পরেই ইংরাজদিগের জনৈক বন্ধুর সহিত নবাবের মনো-মালিন্য ঘটে; ইংরাজেরা প্রকারন্তরে তাহার সহায়তাকারী বিবেচনা করিয়া নবাব পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে তাহাদের শত্রুতা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন গত্যান্তর রহিল না। কাপ্তেন নিকলসন্ নবারের হুগলীর কুঠী ভস্মসাৎ করিয়া হিজলী অধিকার করিলেন। হিজলীর মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক কাশিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার রসদ, কামান, দুর্গ ইত্যাদি সমস্তই ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২০ জন সৈন্যসহ চার্ণক হিজলীতে উপনীত হইয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। কোম্পানীর দুই একখানি ব্যতীত যাবতীয় যুদ্ধ-জাহাজ ও রনতরী (Sloops) হিজলীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিল। মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত দুর্গ চার্ণক অধিকার করিয়া রাখিলেন।

হিজলী অধিকারের পর চার্ণক ১৭০ জন ইংরাজ সৈন্যকে বালেশ্বর অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল।

হিজলীর যুদ্ধ।

বিলাতের ডিরেক্টর সভা, কয়েক দিনের মধ্যে হুগলী লুণ্ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু ভারত-সম্রাট ঔরঙ্গজেব এ সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি এই মাত্র খবর লইয়াছিলেন, 'হুগলী, হিজলী, বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?' নবাব শায়েস্তা খাঁ ইহার পর অবিচলিতচিত্তে হিজলী পুনরাধিকারের জন্য যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ রশুলপুর নদীর পরপারে দারিয়াপুর গ্রামে আসিয়া ছাউনী ফেলিল; ইংরাজদিগের সমুদয় পোত একদিনেই রশুলপুর নদীর মধ্যে বিতাড়িত

হইল এবং গ্রামের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। হিজলী অধিকার মোগল সেনাপতির পক্ষে সহজ-সাধ্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজের উদীয়মান সুখ-সূর্য্য অস্তমিত মোগল-চন্দ্রিমার নিকট জ্যোতি-হীন হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চার্ণকও দুর্গ ও ঘাটের মধ্যবর্ত্তী এক অট্টালিকায় কামান সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

২৮ শে মে শত্রুপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্য রসুলপুর নদী উত্তীর্ণ হইয়া হিজলীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক অরণ্য মধ্যে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। নবাব-সৈন্যের ঈদৃশ উদ্যোগ দেখিয়া ইংরাজদিগের মনে সাতিশয় আতঙ্কের উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে বুঝিতে পারিয়া চার্ণক কিছুতেই হতাশ হইলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত দুর্গ অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া মুসলমান সেনাপতি আব্‌দস সামদ সৈন্য হটাইয়া লইয়া গেলেন। এইরূপে মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণ বিফল হইলেও চারিদিবস ধরিয়া ছোটখাট যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং প্রতিদিবসই ইংরাজদিগের সেই অল্পসংখ্যক সৈন্যের কিছু কিছু ক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের অনুকম্পায়, ঠিক ঐ সময়ে ১লা জুন তারিখে, ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন গোরা সৈন্য লইয়া ডেনহাম সাহেব উপস্থিত হইলেন। মুসলমান সেনাপতি নূতন সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন। চার্ণকও মুসলমান সেনাপতির মনে তাঁহাদের সৈন্যবল সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; ৪০।৫০ জন সৈন্য জাহাজ ঘাটে একত্রিত হইয়া সাজসজ্জাসহ কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া এক একবার দুর্গে প্রবেশ করে, আবার তাহারাই সামান্যভাবে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন পথ দিয়া জাহাজঘাটে মিলিত হয় এবং পুনরায়

রণসজ্জাসহ দুর্গে প্রবেশ করিতে থাকে। এইপ্রকারে কয়েকবার ধূমধামের সহিত সৈন্যগণকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিপক্ষপক্ষের ধারণা হইয়া যায় যে, বহুসংখ্যক সৈন্য জাহাজে আসিয়াছে, এমতাবস্থায় তাহাদের হিজলী অধিকার সুদূরপরাহত। মোগল সেনাপতি এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা সমিচীন হইবে না মনে করিয়া, ৪ঠা জুন তারিখে চার্ণকের নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে তখন ইংরাজদিগের দুর্দ্দশারও একশেষ হইয়া আসিয়াছিল। তিন মাসে দুই শত সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর একশত পীড়িত; অবশিষ্ট এক শতের মধ্যেও অনেকেই জরাজীর্ণ, খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল; চল্লিশজন কর্ম্মচারীর মধ্যে চার্ণক ব্যতীত আর পাঁচজন মাত্র কার্য্যক্ষম ছিলেন। প্রধান জাহাজেও ছিদ্র হইয়াছিল। সর্ব্বনাশের সময় সমাগত, এমন সময়েই মোগল সেনাপতির পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব পাওয়াতে চার্ণক উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ১০ই জুন সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইলে চার্ণক বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া ডঙ্কাবাদ্য সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া সেই মৃত্যুগহ্বর হইতে বাহির হইলেন। ইংরাজ-বাহিনী* অতঃপর ধূমধামের সহিত হিজলী পরিত্যাগ করিয়া উলুবেড়িয়ায় চলিয়া আসিলেন।

পরিশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সুরাটবাসী ইংরাজদল ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হইলে, প্রবীণ বাদসাহ ইউরোপীয়-বাণিজ্যে দেশের প্রভূত উপকার স্মরণ করিয়া দেড়লক্ষ টাকার পূজোপকরণে বশীভূত হইয়া এবং সম্ভবতঃ মক্কাযাত্রী মুসলমানগণের প্রতি ইংরাজের উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়াও, তিনি আবার তাঁহাদিগকে

---

* C. R. Wilson, Early Annals of the English in Bengal, Volume II.

পূর্ব্ববৎ অবাধে বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরওয়ানা আসিল। তখন আর শায়েস্তা খাঁ ছিলেন না—নিরীহ নবাব ইব্রাহিম খাঁ কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।* জব চার্ণক পুনরায় সদলে উপনীত হইলেন। এবার আর হুগলী বা হিজলী নিরাপদ নহে ভাবিয়া অদূরে সুতানুটী কলিকাতায় কুঠী নির্ম্মিত হইল; ভাবী ভারত-সাম্রাজ্যের বীজ বপন করা হইল। স্বর্ণপ্রসূ ভারতে বাণিজ্য ও সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়জন ইংরাজের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে জব চার্ণকও তাহাদেব মধ্যে একজন। ভারতের বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান 'রাজপ্রাসাদ-নগরী' কলিকাতার এই জব চার্ণকই প্রতিষ্ঠাতা। ইংলণ্ডের তৎসাময়িক মন্ত্রী-সভা চার্ণকের বুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই হিজলী যুদ্ধেরও উল্লেখ ছিল। হিজলী যুদ্ধে জব চার্ণক ব্যতীত অন্য যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রিচার্ড ট্রেঞ্চফিল্ড, ম্যাকরিথ ও জোলাণ্ডের নামও উল্লেখযোগ্য।

শোভা সিংহের বিদ্রোহ।

শায়েস্তা খাঁর পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁর শাসন বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সহিত সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যক্তিগত থাকায় শায়েস্তা খাঁর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। এ দিকে সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শীরা পর্য্যন্ত শোষণ করিতে-

* বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,—পৃঃ ১৬।

ছিলেন ; সুতরাং বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকে ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইতেছিল। বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তঃর্গত চিতুয়া, বরদা পরগণার এক সামান্য ভূম্যাধিকারী শোভা সিংহ। বর্দ্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। শোভা সিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান-দলপতি রহিম খাঁকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। রহিম সানন্দে অনুচরবর্গসহ বিদ্রোহে যোগ দিলেন। * ইহার পর উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার মোগল অধিকার উচ্ছেদে অগ্রসর হইলেন।

রহিম ও শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে, দুঃসাহসিক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার সামান্য সৈন্যদল সহ অসংখ্য বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইলেন। কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল। রাজপরিবারবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠপুত্র জগতরাম রায় কোনপ্রকারে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহিগণের এই প্রথম বিজয়-ঘোষণা প্রচারিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে দুষ্ট ও বিপ্লবপ্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী জনগণ তাহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আস্ফালন ও উপদ্রবে চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার বিদ্রোহ সামান্য ঘটনা মনে করিয়া নুরউল্লা খাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের জন্য এক পরওয়ানা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন। নুরউল্লা খাঁ তৎকালে যশোহর,

* বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী-আমল—পৃঃ ২২।

হুগলী, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত-ফৌজদার থাকিলেও বহুদিনাবধি কৃষি, বাণিজ্যাদি অর্থকর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় নামে মাত্র ফৌজদার হইয়া রহিয়াছিলেন। তিনি সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইলেও কস্মিন্‌কালে সৈন্য চালনার কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হয় নাই; সুবাদারের হুকুম পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তিনি এই বিদ্রোহিগণকে নিপাত করিবার জন্য যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিপক্ষের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক চুঁচুড়ানিবাসী ওলন্দাজ বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; দুর্গমধ্যে থাকাও নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি একরাত্রে কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। হুগলী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল।

ইব্রাহিম খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহায্যে হুগলী পুনরাধিকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে গিয়া আড্ডা করিল। শোভা সিংহ সপ্তগ্রাম হইতে রহিম খাঁকে অধিকাংশ সৈন্যসহ নদিয়া, মুরস্থদাবাদ অঞ্চল অধিকারের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বৰ্দ্ধমানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে ইন্দ্রিয় বিকার শোভাসিংহের কাল হইল। বৰ্দ্ধমানের যে সকল রাজপরিবার বিদ্রোহীর হস্তগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যাও বন্দিনী হইয়াছিলেন। শোভা সিংহ তাঁহাকে আপনার অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অনুনয় বিনয়ে সে কার্য্য সম্পন্ন হইল না দেখিয়া, পাশব বলে তাহাই পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, কামাতুর নর-পিশাচ যেমন উন্মত্তবৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি সেই

বীরাঙ্গনা তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত শানিত ছুরিকা সবলে সেই নরপিশাচের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বিকট চিৎকারে শোভা সিংহ ভূপতিত হইল। ছুরিকা তাহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছিল—কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। দুর্ম্মতি শোভা-সিংহের পতনের পরে, রাজকুমারী, "পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহভার বহন করিব না" প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই ছুরিকা নিজ বক্ষ মধ্যে বিদ্ধ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। *

শোভা সিংহের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিদ্রোহী শিবিরে পৌঁছিলে বিদ্রোহিগণ রহিম খাঁকে অধিনায়ক মনোনীত করিল। রহিম খাঁ ও শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ উভয়ে মিলিয়া লোকের উপর অত্যাচার ও লুটপাট পূর্ব্ববৎ অবাধে চালাইতে লাগিল। প্রতিদিন চারিদিক হইতে বিখ্যাত দস্যুগন, অবসর প্রাপ্ত সৈন্য ও দেশের অন্যান্য অসচ্চরিত্র লোকে তাহাদের দলপুষ্টী করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গ বিদ্রোহিগণের অধিকৃত হইল। এ যাবৎ কোন প্রকার বাধা না পাইয়া রহিম খাঁ সর্ব্বত্র লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই সকল ঘটনার সংবাদ ঔরঙ্গজেব সংবাদ পত্র দ্বারা অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় পৌত্র আজিম ওসমানকে বাঙ্গালার সুবাদার এবং ইব্রা-হিমের সাহসিক পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। সেনাপতি নবাবের বিচ্ছিন্ন সেনাদলকে একত্রিত করতঃ বিদ্রোহীদিগের অনুসরণ করিয়া ভগবানগোলাতে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে তিনি প্রথম দিনেই সমীপবর্ত্তী শত্রুদিগের কামান সকল অকর্ম্মণ্য করিয়া

* তারিখ বাঙ্গালা।

দিলেন এবং পরদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। রহিম খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে না পারিয়া উড়িষ্যায় পলায়ণ করিল। অনন্তর অন্যান্য বিদ্রোহি জমিদারেরা সকলেই সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বাঙ্গালার বিষম বিদ্রোহ বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

এই বিদ্রোহের সময়ও মেদিনীপুর জেলার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। নিরবিচ্ছিন্ন অরাজকতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। এই বিদ্রোহের ফলে নিরপরাধি কত ব্যক্তিকে যে কত প্রকরে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। শিবায়ণ কাব্যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কাব্যরচয়িতা কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য নিজেও এই সময় বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহের সময়েই কবি স্বীয় জন্মভূমি বরদা পরগনার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়া মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরদা পরগনায় শোভা সিংহের গড়বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

আজিম ওসমান যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সেই সময় ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন। তৎকালে দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও খরচে সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ পরবর্ত্তিকালে বাঙ্গালার নাজিম বা সমগ্র প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করিয়া বঙ্গদেশকে কয়েকটি চাকলায় বিভক্ত করেন। সা সুজার সময়ের কয়েকটি সরকার বিভাগ লইয়া এক একটি চাকলা গঠিত হইয়াছিল; প্রথম অধ্যায়ে সে

বাঙ্গালার জমিদার।

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল—পৃঃ ২৫—২৭।

কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মুর্শিদকুলীর সময়ে বাঙ্গালার জমিদারদিগের বড়ই দুর্দ্দিন গিয়াছিল। খাজনা আদায়ই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তজ্জন্য তিনি নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। যে জমিদার খাজনা দিতে দেরী করিত, সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে খাজনার জন্য তত পীড়াপীড়ি করা হইত না—অন্যথায় তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। হিন্দুর ছেলে হইলেও মুর্শিদকুলী খাঁ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি হিন্দুর অনেক দেব-মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জমিদারদিগের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছিল এবং জমিদারী বন্দোবস্তের কয়েকটি নূতন ব্যবস্থাও হইয়াছিল। "জমিদার-বংশ" শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা সে কথার বিস্তারিত আলোচনা করিব। মুর্শিদকুলী খাঁ শাসন ও বিচার প্রথারও নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মোগল শাসনের পূর্ব্বে প্রধান প্রধান স্থানে কাজিগণ শাসন ও বিচার উভয়বিধ কার্য্য করিতেন। কিন্তু মোগল শাসনকালে ফৌজদারী প্রথার সুচারুরূপ বন্দোবস্ত হওয়ায় ফৌজদারগণ তখন সাধারণতঃ শাসনকার্য্য ও কাজিগণ বিচার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বঙ্গ রাজ্যকে যে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন, তাহার প্রত্যেক চাকলায় এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ফৌজদারের সংখ্যা কিছু কম ছিল। ফৌজদারগণের হস্তেই শাসনকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। তাঁহাদের অধীনে নগরে নগরে কোতোয়ালগণ ও প্রধান প্রধান গ্রামে থানাদারগণ শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত হ'ন। তদ্ভিন্ন জমিদারগণও আপন আপন জমিদারীতে শান্তিরক্ষার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কোতোয়াল,

মোগল রাজত্বে শাসন ও বিচার প্রথা।

থানাদার এবং জমিদারগণও কতক পরিমাণে, বর্ত্তমান সময়ের পুলিশের ন্যায় কার্য্য করিতেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ফৌজদারী আদালত, কাজী আদালত, দেওয়ানী আদালত ও নিজামত আদালত নামে চারি প্রকার বিচার আদালতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারই বিচার করিতেন। চৌর্য্য, শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি সামান্য সামান্য ফৌজদারী মোকদ্দমা ফৌজদারদিগকেই করিতে হইত এবং নরহত্যা প্রভৃতির গুরুতর অভিযোগ তাহারা প্রথমে শ্রবণ করিয়া পরে নিজামত আদালতে সোপর্দ্দ করিতেন। কখনও কখনও নিজামত আদালতের আদেশে তাহারা উহার বিচারও করিতে পারিতেন। নিজামত আদালতের আদেশে অভিযুক্ত অপরাধীর প্রাণদণ্ডাদির বিধান ফৌজদারকেই কার্য্যে পরিণত করিতে হইত। ফৌজদারী আদালত এক প্রকার নিজামত আদালতেরই অধীন ছিল এবং প্রত্যেক চাকলায় একটি করিয়া ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজী আদালতে প্রধান কাজী বিচার করিতেন। মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানগণের উত্তরাধিকার, উইল, ন্যাস, হেবা বা দান, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির বিচার কাজীর আদালতে হইত। প্রধান কাজির অধীনে মফস্বলের স্থানে স্থানেও কাজীর আদালত ছিল। দেওয়ানী আদালতে জমিদারগণের সীমা সরহদ্দ ও প্রজাদিগের বাকী খাজনা প্রভৃতির বিচার হইত। তদ্ভিন্ন হিন্দু প্রজার দায়ভাগ ও উত্তরাধিকারের নিষ্পত্তি ও জমিদারগণ যে সকল সামান্য সামান্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতেন তাহার আপীল এই আদালত হইতে নিষ্পত্তি হইত। দেওয়ানী আদালতের বিচারভার খালসার দেওয়ানের উপর নির্ভর করিত। তাঁহার অধীনে দারোগা

* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড—পৃষ্ঠা ৪৫৩।

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দারোগা অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া দেওয়ানের নিকট মন্তব্য জানাইতেন; দেওয়ান শেষ আদেশ দিতেন। দায় ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া দারোগা কার্য্য করিতেন। নিজামত আদালত রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তথায় স্বয়ং নাজিম বিচারকার্য্য করিতেন। তাঁহাকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া পরিশেষে নিজামত আদালতেও একজন দারোগা নিযুক্ত হন এবং ঢাকা ও উড়িষ্যায় নায়েব নাজিমী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। দারোগা নাজিমের প্রতিনিধিরূপে অভিযোগ শ্রবণ করিয়া আপনার মন্তব্যসহ সেই সমস্ত নাজিমের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁ স্বয়ং সপ্তাহে দুই দিন নিজামত আদালতে উপবেশন করিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ, জমিদার ও প্রজার বিবাদ, হিন্দু মুসলমানের ফৌজদারী বিচার ও নরহত্যা, ডাকাইতি, রাহাজানী প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগের বিচার নিজামত আদালতে হইত। এতদ্ভিন্ন জমিদারেরা সামান্য সামান্য যে সকল ফৌজদারী বিচার করিতেন এবং ফৌজদারী ও কাজী আদালতে যে সকল বিচার হইত তাহার শেষ নিষ্পত্তি বা আপীল নিজামত আদালতে হইত। মুর্শিদকুলী খাঁর এইরূপ বিচার প্রথা মুসলমান রাজত্বের শেষ এমন কি কোম্পানীর সময়ও কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, দেখা যায়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয়।

আলীবর্দ্দী খাঁ ও বর্গীর হাঙ্গামা।

মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন এবং তৎপরে সুজার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁকে আক্রমণ ও নিহত করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার

মুসলমান কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিল না; যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অনেক রক্তারক্তি কাটাকাটি হইল। সেই রক্তে মেদিনীপুরের মৃত্তিকাও রঞ্জিত হইল। অবশেষে উড়িষ্যা আলীবর্দ্দীর পদানত হইল। কিন্তু উড়িষ্যার যুদ্ধ থামিতে না থামিতে নাগপুর অঞ্চল হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বাঙ্গালার লোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। আলীবর্দ্দী খাঁ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মারহাট্টাদিগের উপদ্রব বা "বর্গীর হাঙ্গামা" আলীবর্দ্দী খাঁর শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা। বর্গীর অত্যাচার উৎপাতের কাহিনী এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শুনিতে পাওয়া যায়।

যে বর্গীর নামে একদিন ভারতের আবাল বৃদ্ধ বণিতা থরহরি কম্পমান হইত, আজিও যাহাদের ভয় দেখাইয়া বঙ্গীয় জননী দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইয়া থাকেন, মেদিনীপুরও একদিন তাহাদের ভীষণ উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহারা এক একবার "হর হর মহাদেও" শব্দে এ প্রদেশের উপর আসিয়া পড়িত আর সমস্ত দেশকে ধ্বস্ত, বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যাইত। বর্গীদিগের সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। যখন প্রায় সমগ্র বঙ্গে ইংরাজ শাসন বদ্ধমূল হইয়া দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে ছিল, উহার ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর পর পর্য্যন্তও মেদিনীপুরের কোনও কোনও স্থান বর্গীদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের বক্ষের উপর বর্গীতে মোগলে ও বর্গীতে ইংরাজে অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্ত্তী এক পৃথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইল তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহন করিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে নূতন নাটকের অভিনয়

আরব্ধ হইল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ।

আলীবর্দ্দী ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়া ছিলেন, সেই জন্য বাণিজ্য লইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত কোন-প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ করেন নাই। কিন্তু সিরাজ সিংহাসনারোহণ করিবার পর হইতেই ইংরাজ-দিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার ফলেই মোগলের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের সূত্রপাত। পরিণামে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেই স্মরণীয় ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজ রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব ভারতে ব্রিটীশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশেম বা নজমুউদ্দৌলা প্রভৃতি যে কয়জন বাঙ্গালার মসনদে বসিয়াছিলেন তাহা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহের ফলে বলিতে হইবে। পলাশীর যুদ্ধের পরে কার্য্যতঃ ইংরাজরাই একপ্রকার বাঙ্গালার হর্ত্তা-কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

বিজয়ী ক্লাইব মুর্শিদাবাদে আসিয়া সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনা-পতি মীরজাফরকে বাঙ্গালার গদিতে বসাইলেন। মীরজাফরের

মেদিনীপুরের ফৌজ-দার রাজারাম সিংহ।

শাসনকালে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজারাম সিংহ মেদিনী-পুরের ফৌজদার ছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব্ব নবাব সিরাজদ্দৌলার সংবাদ বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম-চারী ছিলেন; সেকালের কাগজপত্রে তিনি সিরাজের গুপ্তচর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। রাজারাম সিরাজের বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্ম্মচারী ছিলেন, এইজন্য তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়া নবাব মীরজাফর খাঁ তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আসিয়া হিসাব নিকাশ দিবার আদেশ করেন। রাজারাম বুঝিয়াছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে গেলে তিনি

নবাবের অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবেন না; সেই জন্য তিনি স্বয়ং না গিয়া স্বীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। নবাবের প্রধান মন্ত্রী রাজা দুর্লভরামের সহিত রাজারামের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, মীরজাফর একথা জানিতেন। রাজারাম নবাব দরবারে উপস্থিত না হওয়ায় নবাব ভাবিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর চক্রান্তে রাজারাম সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়াই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন নাই। উহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি রাজারামের আত্মীয় দু'জনকে কারারুদ্ধ করিলেন। ক্লাইব মীরজাফরকে ঐরূপ কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"রাজারাম ইংরাজদিগের শত্রুতা সাধন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তনি সিরাজের সঙ্গে ফরাসী বুঁসির সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।" * মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বোক্তরূপ সংবাদ পাইয়া রাজারাম দুই সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"মীরজাফর খাঁকে লক্ষ টাকা নজর দিতে প্রস্তুত আছি এবং স্বয়ং ক্লাইব যদি প্রতিভূ হ'ন তাহা হইলে নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতেও স্বীকৃত আছি; কিন্তু আমাকে আক্রমণ করিলে আমার দেশে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় স্থানের অভাব নাই—আমি সেইখানে থাকিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে পারিব।" সে সময় দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার করাই কূট রাজনীতিক ক্লাইবের উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি নবাবকে ফৌজদার রাজারামের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অনুরোধ করিলেন। ঐ সময় রাজারাম ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবার

---

* Bengal in 1756-57, Vol. I. pp. 100, 120; Vol. II. pp. 22, 137, 149, 313, 314.

জন্য পিপ্‌লী বন্দর পর্য্যন্ত একদল ইউরোপীয় সৈনিক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাক্ষাতের সময় ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে, নবাব তাঁহার প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপীয় সেনাদল পরিবৃত হইয়া রাজারাম মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং ক্লাইবের মধ্যস্থতায় নবাবের সহিত তাহার মিলন হয়। *

মেদিনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

ইংরাজ কোম্পানীর অনুগ্রহে মীরজাফর খাঁ বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গালা শাসন করিতে পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার জামাতা মীরকাশেমকে বাঙ্গালার সিংহাসন প্রদান করেন। মীরকাশেম বঙ্গের মস্‌নদে বসিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজ কোম্পানীকে চাকলা মেদিনীপুর, চাকলা বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম (থানা ইস্‌লামাবাদ) প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দেন। † ঐ সময় হইতে ঐ তিন স্থানে কোম্পানীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বঙ্গের অন্যান্য স্থান তখনও নবাবের অধিকারভুক্ত থাকে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নবাব তখন নামে মাত্রই নবাব ছিলেন; ইংরাজ কোম্পানীই সেই সময় বাঙ্গালার সর্ব্বেসর্ব্বা। মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশেমকে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছিল, আবার পরবর্ত্তিকালে মীরকাশেম ইংরাজদ্বেষী হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসান হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীরজাফরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র নজম উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া

* Broome's History of the Bengal Army, pp, 183, 186, 187.

† Aitchison, Vol. I., pp. 216-217.

ইংরাজকে বঙ্গরাজ্য রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলেন। নজম-উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। এদিকে ঐ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীর বাদসাহও ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করিলেন। * ঐ দেওয়ানী সনন্দই বাঙ্গালার ইংরাজ রাজত্বের প্রধান দলীল। তদবধি ইংরাজ-গণই বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পুরাতন মুসলমানী ইমারত খসিতে ভাঙ্গিতে লাগিল, ইংরাজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে বাঙ্গালার নূতন যুগ দেখা দিল। যে বিপ্লবাগ্নি দুই শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতে প্রধূমিত হইতে ছিল, সেই বিপ্লবাগ্নি এতদিনে নির্ব্বাপিত হইল। কিছুকালের জন্য দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া বণিক ইংরাজ ক্রমে শাসক ইংরাজে পরিণত হইলেন। মুসলমান শাসনের শেষ সময়ে বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন, আলীবর্দ্দীর শাসনসময়ে সেই দুর্দ্দশার চরমাবস্থা; তাহার পরে এ দেশে ইংরাজের শৃঙ্খলাস্থাপন প্রয়াস। সে প্রয়াস যে সাফল্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে সে জন্য বাঙ্গালী ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ।

---

* H. Verelst's A View of the English Government in Bengal (1772) Vol. I., pp. 225-226.

পুরাতন জেল বা মেদিনীপুর দুর্গের একাংশ

অষ্টম অধ্যায়।

—*—

মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব বা বর্গীর হাঙ্গামা।

ইতিহাসে বর্গীরাই মহারাষ্ট্রীয় বা মারহাট্টা নামে পরিচিত। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ মহম্মদ সাহ মারহাট্টাদিগের প্রথম পেশ্‌ওয়া বালাজী বিশ্বনাথকে 'সারদশ্‌মুখী' ও 'শওরাজী'-সহ দাক্ষিণাত্যের চৌথের (রাজস্বের চতুর্থাংশ) স্বত্ব প্রদান করেন। তদনুসারে তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই চৌথ্ দাবী করে। এক সময়ে তাহাদের এরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইয়াছিল যে, লোকে ভাবিয়াছিল, তাহারাই একদিন ভারতের অধীশ্বর হইবে। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভাগ্যলক্ষ্মীও বৈচিত্রময়ী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐ উন্নতিশীল জাতির পতন আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন দস্যুবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া চৌথ্ আদায়ের জন্য দেশের চারি, দিকে দুর্দ্দান্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মার্-মার্, কাট্-কাট্ শব্দে ছুটা-ছুটি আরম্ভ করে। পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া গ্রাম ও নগরের উপর পতিত হয় এবং যাহা কিছু পায় তাহাই লইয়া প্রস্থান করে। তাহাদের করাল গ্রাস হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা তখন লোকের দায় হইয়াছিল। কত বিগ্রহ, কত ধন-রত্নাদি যে তাহাদের উপদ্রবে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। এক্ষণে বাপী-কূপ-তড়াগাদি খনন কালে যে সকল ধন-রত্নাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোক-লোচনের বিস্ময় বিস্ফারিত করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই যে ঐ

মারহাট্টা-অভ্যুদয়।

মারহাট্টাদিগের লুণ্ঠন ভয়ে মৃত্তিকা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গে বর্গী।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর যখন বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, সেই সময়েই মহারাষ্ট্রীয়গণ সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র লুঠপাট আরম্ভ করে। তাহারা ভোঁশলা রাজার দেওয়ান ভাস্কর রাওর নেতৃত্বে চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত পঞ্চকোটের পার্ব্বত্য-পথ দিয়া মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিম্ন-বঙ্গের অন্যান্য জেলা সমূহে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী এবং পথ সকলও প্রায়ই কর্দ্দমাকীর্ণ থাকায়, অশ্বারোহী সৈন্যের যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া, তাহারা এই পার্ব্বত্য-জেলা কয়টিতেই স্থায়ী 'ছাউনি' নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

মেদিনীপুরে মোগল ও বর্গীর প্রথম যুদ্ধ।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পাইবার পর, উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিতে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পথে তিনি মেদিনীপুরের যে সকল জমিদার তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে খেলাৎ ও উপঢৌকন প্রদান করিয়া যৎকালে বালেশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, সেই সময়, ময়ূরভঞ্জের রাজা সুবর্ণরেখার তীরে রাজঘাটে তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন। * নবাব ময়ূরভঞ্জের রাজার সেনাদল পরাভূত করিয়া সুবর্ণরেখা নদী পার হ'ন এবং ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহানদী তীরের শেষ যুদ্ধে বিদ্রোহিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। তখন শত্রু পরাজিত

---

* Riyazus Salateen (translation), p. 327.
বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী-আমল—পাদটীকা, পৃঃ ১৫১।

সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই মনে করিয়া, বিজয় গর্ব্বোৎফুল্ল নবাব অধিকাংশ সৈন্যকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রার আদেশ দিয়া, মাত্র পাঁচ ছয় সহস্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া যখন কানন-কুন্তলা-মহীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে রাজধানীর দিকে ফিরিতেছিলেন, সেই সময় মেদিনীপুরে অবস্থান কালে, নির্মেঘ গগনে চন্দ্রনাদের ন্যায় সংবাদ পাইলেন, চল্লিশ হাজার মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার প্রান্তে আবির্ভূত হইয়াছেন। নবাব তখন মধ্যাহ্ন নমাজ করিতেছিলেন; তিনি এই সংবাদে ভীত ভাব না দেখাইয়া সদর্পে বলিলেন, "সেই কাফেরগণ কোথায়? জগতে কোথায় না আমি তাহা-দিগকে দণ্ডিত করিতে পারি?" কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই বুঝিয়াছিলেন, এ বিপদে দর্পের অবকাশ নাই। ঐ সৈন্যগণ সে সময় মাত্র বিংশ ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। পার্ব্বত্য বন্যার মত তাহারা প্রবলবেগে ময়ূরভঞ্জ ও পঞ্চকোট ভেদ করিয়া নবাবের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়-বাহিনী কর্তৃক তাড়িত হইয়া নবাব প্রথমে কাটোয়ায় ও পরে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিয়া নিরাপদ হ'ন। ঐ সময় আষাঢ়ের ঘন বরিষণ আরম্ভ হওয়ায় নবাব বর্ষাকালে বল সঞ্চয় ও মুর্শিদাবাদ রক্ষার উপায় বিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন। কিন্তু ঐ অবসরে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পশ্চিম-বঙ্গের অনেক স্থানই অধিকার করিয়া লইল। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর বহু চেষ্টার পর দুর্গ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু জেলার অধিকাংশ স্থানই মারহাট্টাদিগের করগত হইল। শেষে শরতের অবসানে দেশে গমনাগমন সুসাধ্য হইলে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবাব বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন; মহারাষ্ট্রীয়গণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া যে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে

বাধ্য হইল। ভাস্কর পণ্ডিত পঞ্চকোটের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বনের মধ্যে পথ হারাইলেন। তখন ঐ সকল সৈন্য লইয়া নাগপুর প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব বুঝিয়া তিনি স্বপক্ষাবলম্বী মীর হবিবের উপর সৈন্য চালন ভার দিয়া স্বয়ং স্বদেশে গমন করিলেন।* হবিব সেনাদলকে বিষ্ণুপুরের বন-মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া চন্দ্রকোণার প্রান্তর পার হইয়া মেদিনীপুরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু নবাব তখনও তাহাদের অনুসরণে নিবৃত্ত হ'ন নাই জানিয়া তাহারা মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া আশ্রয় লইল।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁশলা পুনরায় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সদলে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গ ত্রস্ত হইল।

মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত।

আলীবর্দ্দী খাঁ মেদিনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বল প্রয়োগে মহারাষ্ট্রীয়-গণকে প্রতিহত করিবার আশা নাই দেখিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনের উদ্যোগ করিলেন। অতঃপর তিনি যে পন্থাবলম্বন করিয়া কূট রাজনীতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বড়ই ঘৃণিত। তিনি সন্ধির ভাণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়-সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে স্বীয় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তথায় মনুষ্য সমাজের চরম পাপের অভিনয় করিয়া সেবারের মত মারহাট্টাদিগের বঙ্গের লীলা ও ভাস্কর পণ্ডিতের মানব লীলা সমাপ্ত করিয়া দেন। সেনাপতির মৃত্যুর পর মারহাট্টা সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়।†

ইহার পর ঐ ঘটনায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দলে দলে আসিয়া বাঙ্গালার উপর পতিত হয়। রঘুজী ভোঁশলা ভাস্কর

---

* রিয়াজ-উস্-সালাতীন,—বাঙ্গালা অনুবাদ,—রামপ্রাণ গুপ্ত।

† রিয়াজ-উস্-সালাতীন—(অনুবাদ)—পৃঃ ৩৩৩।

পণ্ডিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অধিকতর আয়োজন করিয়া বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন। মারহাট্টাগণ এইবার নবাবের দুষ্কৃতির জন্য বাঙ্গালার হতভাগ্য অধিবাসিগণের প্রতি অমানুষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ব্বরোচিত নির্দ্দয়তা ও ভয়াবহ অত্যাচারের যাহা কিছু নিদর্শন আছে, বর্গীর অত্যাচার তুলনায় তাহার কোনটি অপেক্ষা অল্প ভীষণ নহে।" * বর্গীদিগের শাণিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, হিন্দু, মুসলমান কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা গ্রাম, নগর পুড়াইয়া, শস্যের ভাণ্ডারে আগুন লাগাইয়া এবং শেষে মানুষের নাক, কান ও পুরস্ত্রীর স্তন কাটিয়া দিয়া নির্দ্দয়রূপে বাঙ্গালার সেনা ও প্রজাকুলকে সংহার করিতে আরম্ভ করে। † বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ মহাশয় মেদিনীপুরে বর্গীর অত্যাচারের একটি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া "গৌরী পূজা" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ‡ সুপবিত্র হিন্দু-খ্যাতি-বিশিষ্ট শিবাজী, বাজিরাও, ফার্ণাবিস্ প্রভৃতি মহামহিমাময় ব্যক্তিগণের স্বজাতিবর্গের শেষ এইরূপ অধঃপতন হইয়াছিল। এই অধঃপতনই বোধ হয় সেই বিপুল অধ্যবসায়শীল মহারাষ্ট্রীয় শক্তির অবসানের একমাত্র কারণ।

বর্গীর অত্যাচার।

মেদিনীপুর জেলা বঙ্গ উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত থাকায়

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী আমল।

† Holwell's—Interesting Historical Events, p. 153.
রিয়াজ-উস্-সালাতীন (অনুবাদ), পৃঃ ৩৩৩।

‡ নব্যভারত, দ্বাত্রিংশ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—১৩২১, আশ্বিন—পৃঃ ৩৭৭—৩৮১।

এই প্রদেশটিই বিশেষরূপে বর্গীদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল। নবাব আলীবর্দ্দী এই কারণে এই সীমান্ত প্রদেশটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য স্বীয় জামাতা মীরজাফর খাঁকে পূর্ব্বপদ সামরিক বিভাগের দেওয়ানী ব্যতীত উড়িষ্যার নায়েবী এবং মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদারী অর্পণ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মীরজাফরের অধীনে সাত হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতিক ছিল। তিনি মেদিনীপুরে উপনীত হইয়া প্রথমে এক দল মারহাট্টা ও বিদ্রোহী আফ্‌গানকে পরাভূত করিলেন; তাহারা বালেশ্বরে পলায়ন করিল। কিন্তু জানোজী বহু মারহাট্টা সৈন্য লইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া মীরজাফর আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না; পরন্তু বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গেলেন। মারহাট্টারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। অতঃপর বর্ষাকালে জানোজী মেদিনীপুরে ফিরিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত দুর্গ তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইল। পর বৎসর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দেও তিনি মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে মীর হবিবের অধীনে এক দল সৈন্য রাখিয়া তিনি তথা হইতে নাগপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময় মারহাট্টাগণ হিজলীর অন্তর্গত সাহবন্দর, ভোগরাই, জলামুঠা, পটাশপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের জমিদারগণের জমিদারী অধিকার করিয়া লইয়াছিল। হিজলী ও মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী মারহাট্টাদিগের অধিকৃত স্থান সমূহ বালেশ্বরের মহারাষ্ট্রীয় ফৌজদারের অধীন ছিল; উক্ত ফৌজদার কটকের সুবাদারের এবং সুবাদার বেরারের রাজার অধীন ছিলেন।

মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফর খাঁ।

বর্ত্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ‘রায়বনিয়া গড়’ নামক প্রাচীন

দুর্গটি তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঐ প্রদেশের একটি প্রধান সেনা-নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাঁতনের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া প্রায় চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই রায়বনিয়া দুর্গটি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দুর্গের পূর্ব্বতন পরিখার চিহ্ন বর্ত্তমান গড়ের এক ক্রোশ অন্তর হইতে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকল গড়খাই প্রায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, উহাদের অভ্যন্তরে এক্ষণে ধান্যাদির চাষ হইতেছে। গড়ের ঐ সকল চিহ্ন অতিক্রম করিলে প্রথম দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। এই দ্বারের নিকটবর্ত্তী পরিখা ভয়ানক গভীর ও প্রশস্ত। ঐ দ্বিতীয় পরিখাটির উপরিভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ সিংহদ্বার। দ্বারের উভয় দিকে পাঁচ ছয় হস্ত প্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর। ঐ দ্বার অতিক্রম করিলে বহু সংখ্যক শালবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন এক ভূখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ ভূখণ্ডটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থ প্রায় অর্দ্ধ মাইল। গড়ের চারিপার্শ্বেই প্রস্তর নির্ম্মিত চারিটি সিংহদ্বার আছে। এই বিভাগের পরে আর একটি পরিখা দৃষ্ট হয়। পরিখার পার্শ্বে অত্যুচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ। ঐ স্থান এত উচ্চ যে, উহার উপরে অধিরোহণ করিলে দাঁতনের গৃহাদি দেখা যায়। এক্ষণে সে স্থানে উঠিবার ভাল পথ নাই, বৃক্ষ লতাদি আশ্রয় করিয়া উঠিতে হয়। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ; নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। ঐ স্থানটি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলে আর একটি পরিখা ও এক বৃহৎ ভূখণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। ঐ স্থানে রূপাদিঘী নামে একটী দীর্ঘিকা আছে। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল এবং বিস্তারও তদনুরূপ। দীর্ঘিকার পাহাড়ের উপর একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহে পাষাণময়ী এক কালী মূর্ত্তি আছেন। দেবীর হস্তে প্রস্তর খোদিত বৃহৎ নৃমুণ্ড,

রায়বনিয়া দুর্গ।

সম্মুখে প্রস্তর বিনির্ম্মিত বৃষ এবং প্রস্তর খোদিত মহাকাল ভৈরবের প্রতিমূর্ত্তি। ঐ প্রদেশের প্রাচীন লোকের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, দুর্গটি পরিত্যক্ত হইলে উহা দস্যু তস্করের আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহারা কালীপূজার রজনীতে ঐ পাষাণময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে নরবলি প্রদান করিত। পাষাণময়ী প্রতিমার কয়েকটি অঙ্গুলী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার ভোগ পূজাদিও এক্ষণে আর যথা-নিয়মে হয় না। তিনি এক্ষণে গভীর অরণ্যে জীর্ণ গৃহে বাস করিতেছেন। যাঁহারা এই দেবী-প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সুখ, সৌভাগ্য, পরাক্রম অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কালস্রোতে কত রাজা, কত সম্রাট্‌, কত সাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছে কিন্তু অতীত সাক্ষী পাষাণময়ী অদ্যাপি সেই প্রাচীন গৌরবের প্রদীপ্ত মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। *

রায়বনিয়া দুর্গটি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুর একটি প্রধান কীর্ত্তি-চিহ্ন। কিন্তু কত দিন হইল, কাহার দ্বারা যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। জনশ্রুতি মহাভারতোক্ত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজা উহার প্রতিষ্ঠাতা। জনশ্রুতি যাহাই থাকুক, মহাভারতীয় কালের মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের সহিত যে উহার কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমাদের অনুমান ঐ বিরাট রাজা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোটদেশাধিপতি বিরাট গুহ নামক জনৈক রাজার নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। † বিরাট কোট-

কোট দেশের বিরাট রাজা।

* নারায়ণগড় রাজবংশ—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল, পৃঃ ৪৪-৪৫।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড, প্রথম ভাগ—পৃঃ ৩১৪।

দেশ বা কোটটবী দেশের রাজা ছিলেন। উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চল এক সময় কোটটবী বা কোটদেশ নামে পরিচিত ছিল। আইন-ই-আকবরীর সময় কোটদেশ কটক সরকারের অন্তর্গত ছিল দেখা যায়। রামচরিতের টীকায় কোটটবী দেশের অধিপতি বিরাটের নাম আছে। নগেন্দ্র বাবু অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত রায়বনিয়া গড়েই এই বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। আমারাও তাহাই অনুমান করি। পরবর্ত্তি-কালে গঙ্গবংশীয়গণ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা তাঁহা-দের হস্তগত হয়। উৎকলাধিপতি নরসিংহ দেব উহার পুনঃ সংস্কার করিয়া উহাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গবংশীয়দিগের সময় উহা উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রধান দুর্গ ছিল।

মুসলমান ঐতিহাসিক মিনাহাজ উদ্দীনের গ্রন্থে কটাসিন নামক একটি দুর্গের নাম পাওয়া যায়। * বাঙ্গালার সুলতান ইজুদ্দীন তোগ্রল তোগান খাঁ ৬৪১ হিজিরায় (১২৪৩ খৃষ্টাব্দ) একবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে আসিয়া উৎকলাধিপতি প্রথম নরসিংহ দেবের হিন্দু সৈন্যের হস্তে ঐ স্থানে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বখ্ তিয়ারের সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ অধিকারকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে লজ্জার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে কটাসিনের যুদ্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে আড়াই শত হিন্দু সেনার দ্বারা পঞ্চাশ হাজার পাঠান সেনার পরাভব হইল। ইহা অসতর্ক রাজপুরী আক্রমণ নহে।" † কেহ কেহ বলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কটাসিন নামক যে দুর্গের নাম করিয়া-

কটাসিন দুর্গ।

* তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইংরাজী অনুবাদ—পৃঃ ৫৮৭।

† গৌড়ের ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ১১।

ছেন, উহারই বর্ত্তমান নাম রায়বনিয়া গড়। * আবার কেহ কেহ বলেন, কটাসিন দুর্গ এক্ষণে কটাসিংহ নামে পরিচিত এবং উহা কটক জেলার অন্তর্গত ও মহানদীর তীরে অবস্থিত। † তবকাৎ-ই নাসিরীর বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জাজনগর রাজ্যের সীমান্তেই কটসিন দুর্গটি অবস্থিত ছিল। কিন্তু কটাসিংহ জাজনগর-রাজ্য বা উড়িষ্যার মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরন্তু রায়বনিয়া গড়টিই উৎ-কলের সীমান্তে অবস্থিত দেখা যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবুও রায়বনিয়া গড়কেই কটাসিন দুর্গ বলিয়া মনে করেন। ‡

মীরজাফর খাঁ মারহাট্টাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না দেখিয়া ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলেন।

মেদিনীপুরে আলীবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দৌলা।

যাহাতে শত্রুরা ভবিষ্যতে আর এদিকে আসিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নবাব স্থির করিলেন যে, তিনি সেনা সন্নিবেশ করিয়া মেদিনীপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করিবেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া মারহাট্টাগণ এবার আর যুদ্ধ না করিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। সিরাজউদ্দৌলা একদল সৈনিকসহ মারহাট্টাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া নবাবও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনিও তাঁহার সেনাদল সহ সিরাজের পশ্চাতেই যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে নারায়ণগড়ে সিরাজের সেনাদলের সহিত নবাবের সেনাদলের সাক্ষাৎ হইল। সিরাজ স্নেহশীল

---

* নব্যভারত—পঞ্চবিংশ খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা।

† তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইংরাজী অনুবাদ—পৃঃ ৫৮৮।

‡ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৬শ ভাগ—পৃঃ ১০২।

মাতামহের চরণ বন্দনা করিলেন। বিজয়ী দৌহিত্রকে পাইয়া নবাবের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সম্মিলিত সেনাদল কিছুদিন মেদিনীপুরেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল। *

এদিকে মারহাট্টাগণ ভিন্ন পথে রাজধানী মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে অবগত হইয়া নবাবও মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মারহাট্টাদিগের আর কোন সংবাদ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন; সিরাজ মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। নবাব মেদিনীপুর দুর্গেই বর্ষা যাপনের সংকল্প করিয়া দুর্গের সংস্কারে ও পরিবর্দ্ধনে উদ্যোগী হইলেন এবং পুরস্ত্রীবর্গকে মুর্শিদাবাদ হইতে আনিতে পাঠাইলেন। এদিকে বর্ষাকালের জন্য আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিতে সেনাদলও আদিষ্ট হইল। সৈনিকগণ ও কর্ম্মচারীরা ভাবিয়াছিল যে, অভিযানের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া আবার পারিবারিক সুখসম্ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু এক্ষণে সে আশার অবসান হইল দেখিয়া তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া সকলেই বাসস্থান নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হইল। তবে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, বর্ষাকালের মধ্যে আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু ভিন্ন দিক হইতে বিপদের সংবাদ আসিল—সিরাজউদ্দৌলা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আলীবর্দ্দী খাঁ ব্যস্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন এবং তথা হইতে পাটনায় রওনা হইলেন। মীরজাফর খাঁ ও রাজা দুর্লভরাম সেনা পরিচালন ভার লইয়া রহিলেন।

এই সুযোগে মারহাট্টাগণ পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দ্দীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া-

* District Gazetteer—Midnapore—p. 31.

গিয়াছিল; তিনি অগত্যা যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া, পর বৎসর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে, মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। স্থির হইল, নবাব রঘুজী ভোঁশলার সেনাদলের বকয়া পাওনা বাবদে সুবর্ণরেখা নদীর অপরপার পর্য্যন্ত সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ মারহাট্টাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন এবং বাৎসরিক বার লক্ষ করিয়া টাকা তাহাদিগকে দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে মারহাট্টারা আর বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবেনা। * এই বন্দোবস্তে কয়েক বৎসর কাজও চলিল।

আলীবর্দ্দীর সন্ধি।

ইহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের শাসনকালে যখন বঙ্গে আবার নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরাজ করিতে ছিল, একদিকে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া মীরকাশেমের ষড়যন্ত্র ও অন্য দিকে বঙ্গের পুনরুদ্ধারের জন্য দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলমের বঙ্গ আগমনে যখন সকলে ব্যতিব্যস্ত ছিল, সেই সময় দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ শ্রীভট্ট নামক নায়কের অধীনে মেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়া দেশবাসীকে পুনরায় সন্ত্রস্থ করিয়া তুলে। তাহারা বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত অধিপতি বাদসাহ সাহ আলমের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, এই কথা প্রকাশ করিয়া নবাবের মেদিনীপুরের প্রতিনিধি খোসাল সিংহকে পরাজিত করিয়া মেদিনীপুর অধিকার করে। ঐ মহারাষ্ট্রীয় দলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নবাব-জামাতা মীরকাশেম একদল নবাবী সৈন্যসহ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হ'ন। কিন্তু তিনি তখন কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের সহিত ষড়যন্ত্র করতঃ বাঙ্গালার সিংহাসন লাভের জন্য ব্যস্ত থাকায় ঐ মহারাষ্ট্রীয়-দলন ব্যাপারে মনোযোগ দিতে

মারহাট্টার সন্ধিভঙ্গ ও মেদিনীপুর আক্রমণ।

* বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল—পৃঃ ১৬৯।

পারেন নাই। এই সুযোগে মারহাট্টারা মেদিনীপুরের উত্তর অঞ্চল পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করে এবং ক্ষীরপাই হইতে কলিকাতা ও হুগলীতে এবং বিষ্ণুপুর হইতে মুর্শিদাবাদাভিমুখে সৈন্য পাঠাইয়া কলিকাতা আক্রমণ এবং বাদসাহের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। ইহাতে কলিকাতার ইংরাজগণ ভয় পাইয়া সমরসজ্জা করেন। ঐ সময় কলিকাতার 'মারহাট্টা খাত' নামক গড়টি কাটা হয় এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারী নহেন এরূপ অস্ত্রধারী ভারত-বাসিদিগকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কারণ জনরব উঠিয়াছিল যে, রাজা দুর্লভরাম মারহাট্টাদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে কাজ করিতেছিলেন এবং দুর্লভরামও তখন কলিকাতাতেই ছিলেন। যাহা হউক, বাদসাহ সে সময় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এদিকে ইংরাজ সেনানায়ক কাপ্তেন হোয়াইট্‌ও একদল সৈন্য লইয়া গিয়া মেদিনীপুরে শৃঙ্খলাস্থাপন করেন। *

মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শ্রীভট্ট।

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই মীরকাশেমের সহিত সন্ধির সর্ত্তানু-সারে চাকলা মেদিনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয় দলপতি শ্রীভট্ট নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময় হইতে উড়িষ্যা প্রদেশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মেদিনীপুর চাকলায়ও চৌথের দাবী করিয়া কলিকাতায় ইংরাজ গবর্ণরের নিকট পত্র লিখিলেন। গভর্ণর উত্তর দিলেন, মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্ত-র্ভূত নহে, সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়গণের ঐরূপ দাবী ন্যায়সঙ্গত নহে। ইংরাজ গবর্ণরের পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর পাইয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী

* Broome's History of the Bengal Army, pp. 289-95, 319.

মাসে মারহাট্টারা দ্বিগুণ উৎসাহে মেদিনীপুর আক্রমণ করিলে, মেদিনীপুরের ইংরাজ কুঠীর রেসিডেণ্ট জন্‌ষ্টোন সাহেব বিপন্ন হইয়া কলিকাতায় সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। * কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজ সৈন্য আসিলে মারহাট্টাগণ সরিয়া পড়িল। এইরূপে উত্যক্ত হইয়া ইংরাজ কাউন্‌সিল্ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, কটক পর্য্যন্ত সৈন্য পাঠাইয়া মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে। কিন্তু পরে কাউন্‌সিলে বিষম মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় ঐ কল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মারহাট্টাগণ ইংরাজ রাজ্যের সীমার সন্নিহিত প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় আগমন করে। তন্নিবারণের জন্য বিস্তর ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। † সেনা-নায়কগণের মধ্যে মেজর চ্যাপ্‌মেনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মারহাট্টাদিগকে সেবার দমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় নারায়ণগড়ের জমিদার রাজা পরীক্ষিত পাল কোম্পানীর বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মেজর চ্যাপ্‌মেন সাহেব ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে রাজা পরীক্ষিতকে যে পত্র লেখেন তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ ;—আপনার বিশ্বস্ততা ও দক্ষতাগুণে আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অতি সত্বর মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব নিবারণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইতেছে ; উহাদিগকে দমনের জন্য অত্যল্প দিনের মধ্যেই একদল ইংরাজ সৈন্য সুবর্ণরেখা তীরে ছাউনি করিবে। অতএব আপনি উপযুক্তরূপ রসদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন। ‡

* Long's Records, pp. 263-264.

† Ferminger's Bengal District Records, Midnapore—1763-1767. Letter No 31, p. 27

‡ নারায়ণগড় রাজবংশ—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল।

ইহার পর পুনঃ পুনঃ কোম্পানীর সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেও মারহাট্টাগণও পুনঃ পুনঃ মেদিনীপুরে আসিয়া উপদ্রব করিতে ছাড়ে নাই। কোম্পানীর সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেই তাহারা নিবীড় বনপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত, আবার ঐ সকল সৈন্য পশ্চাদ্‌গমন করিলেই উহারা বাঙ্গালার সীমানায় উপস্থিত হইয়া লুটপাট ও ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিত। ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ এইরূপ কুটীল নীতি অবলম্বন করিয়া দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণও ঐরূপ আচরণে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ১৭৬৮ সালের সরকারী চিঠী হইতে জানা যায় যে, তৎপূর্ব্বে মারহাট্টাগণ অনেকবার মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট জন্‌ষ্টোন সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল।

ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাশপুর পরগণা লইয়াও কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজ ও মারহাট্টাদিগের অধিকারের স্বাভাবিক সীমা ছিল সুবর্ণরেখা নদী। ঐ নদীর বামদিকে কোম্পানীর ও দক্ষিণদিকে মারহাট্টাদিগের অধিকার ছিল। কিন্তু কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে পটাশপুর পরগণায় মারহাট্টাদিগের অধিকার ছিল। * সেইরূপ মারহাট্টাদিগের অধিকারের মধ্যে ভেলোরাচোর নামে এক পরগণা কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত ছিল। এই সূত্রে নানাকারণে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিত। মারহাট্টাদিগের অধিকারে বিস্তর লাঠিয়াল ও দস্যু তস্করের বাস ছিল এবং ইংরাজাধিকারের যত

পটাশপুরে বর্গী।

* "Pataspur—Alivardi Khan granted this pargana to Marhattas as security for the CHAUTH.—O'malley's Balasore Gazetteer, pp. 30-41."

Firminger's Midnapore Records 1763-1767, (foot note)-p. 142.

অপরাধী, দুষ্টলোক, জেল পলাতক,সঙ্গতীহীন অধমর্ণ ইত্যাদি অসচ্চরিত্র লোক মহারাষ্ট্রীয় অধিকারে আশ্রয় লইত। ন্যায়-বিচার করিয়া কাহাকেও দণ্ড দিবার উপায় ছিল না। এই কারণে ক্রমশঃই ইংরাজ রাজ্যের প্রজাসংখ্যা হ্রাস হইয়া মারহাট্টাধিকারে বৃদ্ধি পাইতে ছিল। *

এই সকল অসুবিধা ও অশান্তির প্রতিবিধান করিবার জন্য মেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেণ্ট ভান্সিটার্ট সাহেব অমর্শী হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে কোম্পানীর কাউন্সিলের সভাপতি ভেরেলেষ্ট্ সাহেবের নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, কোম্পানীর অধিকৃত সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবস্থিত ভেলোরা-চোর পরগণার সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত পটাশপুর পরগণার অদল-বদল করিলে ভবিষ্যতে আর উভয় পক্ষের বিবাদ-বিসম্বাদের বিশেষ কারণ থাকিবে না। † উত্তরে কাউন্সিলের সভাপতি ভেরেলেষ্ট সাহেব ২৭ শে মে তারিখে লিখেন, মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে সমগ্র উড়িষ্যা লইবার কথা চলিতেছে, তাহা হইলে পটাশপুর মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টের অধীন করা হইবে। ‡ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্লাইব এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ¶ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মারহাট্টারা পুনরায় মেদিনীপুর অঞ্চলে উপদ্রব করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শ্রীভট্টের অধীনে একদল মারহাট্টা সৈন্য সাতটী কামান লইয়া পটাশপুরে উপস্থিত হয় এবং কোম্পা-নীর দেশীয় সৈন্যকে হস্তগত করিয়া এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। §

---

* Price's Notes on the History of Midnapore, pp. 28-29.

† Ferminger's Midnapore Records, 1763-1767, p. 145.

‡ Ferminger's Midnapore Records 1763-1767, p. 150.

¶ Verelest's View, Appendix, p. 52.

§ Ferminger's Midnapore Records 1763-1767. p. 142.

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরে কটকের মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার সুম্ভাজী গনায়স্ এতদ্ অঞ্চলে চৌথ্ আদায়ের আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু তাহা আদায় না হওয়াতে তিনি তৎকালীন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে লিখিয়া পাঠান যে, বর্ষাকালে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিবেন। এই ভয়াবহ সংবাদ মেদিনীপুরে পৌঁছিলে মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গের প্রাণে ভয়ানক আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মেদিনীপুরের ইংরাজ রেসিডেন্ট এই সংবাদ পাইয়া ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণার জেনারেল ভেরেলেষ্ট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে লিখিত ছিল যে, মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার সুম্ভাজীর সেনাপতি নিলু পণ্ডিত বার হাজার অশ্বারোহী, ছয় হাজার পদাতিক ও এক হাজার বন্দুকধারী সৈন্যসহ অচিরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে। তাঁহার লিখিত ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রেও মারহাট্টা আক্রমণের কথা ছিল। *

মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি নিলু পণ্ডিত।

ঐ প্রকাণ্ড সৈন্যদল যথাসময়ে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া বঙ্গদেশের সীমায় উপস্থিত হয় এবং সমগ্র মেদিনীপুর প্রদেশকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া বৰ্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। ঐ সৈন্যদল কর্তৃক পশ্চিম বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানই আক্রান্ত হইলেও মেদিনীপুর জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে মেদিনীপুর শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। শস্যের অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায়, মনুষ্য কলাগাছের তেউড় এবং পশুরা খড় ও পোয়ালের অভাবে গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিল। যখন তাহাও জুটে নাই তখন লোকে গৃহ, গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটাইয়া যে যেদিকে

* Firminger's Midnapore Records, 1768-1770, pp. 84, 136.

পারিয়াছিল পলাইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ সদর রাস্তার ধারে যে সকল গ্রাম ছিল, তাহা প্রায় মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল। *

প্রজাদিগের যখন এইরূপ অবস্থা, মারহাট্টার অত্যাচারে যখন তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছিল, সেই সময় দেশের কয়েকজন রাজা, জমিদারও প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটী করেন নাই।

সাহবন্দরের ভূঞা।

ফলতঃ সে সময় দেশের এক ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। যাহার লোকবল ও ধনবল ছিল, সেই কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। ঐ সকল রাজা, জমিদারদিগের মধ্যে সাহবন্দরের ভূঞা ও ময়ূরভঞ্জের রাজার নাম উল্লেখ যোগ্য। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টা-ধিকারভুক্ত সাহবন্দর পরগণার জমিদার জলেশ্বর চাকলার অন্তর্গত কোম্পানীর অধিকৃত নাপোচোর পরগণার উৎপন্ন ধান্যের উপর কর ধার্য্য করিতে চাহেন। মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেণ্ট পিয়ার্স সাহেব উহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ভূঞা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত পরগণা আক্রমণ করে এবং প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ঐ বৎসরের ১৫ই জুন তারিখে মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট ফোর্ট উইলিয়মের কালেক্টর জেনারেল ক্লড্ রাসেল সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। †

ঐ সময় ময়ূরভঞ্জের রাজাও ইংরাজ-প্রজা ও ইংরাজ-কর্ম্মচারী-দিগকে নানাপ্রকারে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজা নামে মাত্র কটকের, মহারাষ্ট্রীয় সুবাদারের অধীন ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বাধীন রাজ্য ব্যতীত মেদিনী-

ময়ূরভঞ্জের রাজা।

---

* রিয়াজ-উস্-সালাতীন, রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ।

† Firminger's Midnapore Reco, rds—17681770.

পুরের জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত নয়াবসান নামক একটি পরগণাও কোম্পানীকে রাজস্ব দিয়া অধিকার করিতেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা উহার রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত কোম্পানীর অধিকৃত পূর্ব্বোক্ত ভেলোরাচোর পরগণায় মালিকী-স্বত্ব দাবী করিয়া বসেন। গবর্ণার জেনারেল এই দাবী অগ্রাহ্য করায় রাজা উড়িষ্যার গড়জাত-মহালের অন্য একজন বিদ্রোহী সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দেন। ঐ সময় মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার ও ময়ূরভঞ্জের রাজার মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটায় কোম্পানী মহারাষ্ট্রীয় সুবাদার রাজারাম পণ্ডিতের সহায়তায় ময়ূরভঞ্জের রাজাকে পরাজিত করেন। রাজা নয়াবসান পরগণার জন্য কোম্পানীকে বার্ষিক তিন হাজার দুই শত টাকা করিয়া রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন।*

পাইকারা ভূঞা।

ইহার পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পাইকারা ভূঞা নামক জনৈক মারহাট্টা জমিদার নয়শত অনুচর লইয়া নৌরঙ্গাচোর পরগণায় প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করে। ঐ বৎসরের মে মাসে উক্ত জমিদার এক হাজার ছয় শত অশ্বারোহী অনুচর সহ পুনরায় ঐ পরগণায় উপস্থিত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। এই সময় বলরামপুর পরগণার জমিদার বীর প্রসাদ চৌধুরীও স্বীয় তিন-শত অনুচর সহ পাইকারা ভূঞার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উভয় দল মিলিত হইয়া শুশুনিয়া ও নলপুরা গ্রামের কোম্পানীর সীপাহীদিগকে আক্রমণ করে। রাত্রি শেষ হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাদের আক্রমণ আরব্ধ হইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। দিবাবসানকালে গুলি, বারুদ ফুরাইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর সিপাহীরা পলাইতে বাধ্য হয়।

* O'malley s District Gazetteer, Midnapore, p. 38.

আক্রমণকারীরা পরিত্যক্ত গ্রাম লুঠিয়া গ্রামে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং রণহত শত্রুদিগের মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করে। মেদিনীপুরের ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সংবাদ কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, যেন মারহাট্টা সুবাদারকে ইহা জানাইয়া ক্ষতি পূরণ দাবী করা হয়। তিনি ঐ পত্রে মেদিনীপুরে আরও অধিক সৈন্য রাখিবার এবং ওলমারা হইতে মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্যও গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। *

ঐ সময় মারহাট্টারা যে কতপ্রকারে কোম্পানীর প্রজা ও কর্ম্মচারীদিগকে উৎপীড়িত করিতেছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্ট্রেচী সাহেব (H. S. Strachey) গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী টুকার সাহেবকে (H. St. G. Tucker) যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। † মারহাট্টাদিগের ও দুষ্ট জমিদারের উপদ্রব নিবারণের জন্য কোম্পানী মেদিনীপুরের দুর্গে ও জলেশ্বরের নক্স দুর্গে স্থায়ীভাবে দুই দল সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল না হইলেও অত্যাচার যে অনেকটা নিবারিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায়। ফলতঃ সমস্ত উপদ্রবই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের অবসানে প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ ও বর্গীর পরাজয়।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লী ভারতের গবর্ণার জেনারেল হইয়া আসেন। তাঁহার শাসনকালে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে বেরারের রাজা রঘুজী ভোঁশ্‌লা পরাজিত হওয়ায় মারহাট্টাদিগের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েলেস্‌লী বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া একই

* District Gazetteer—Midnapore—p. 36.

† Price's Notes on the History of Midnapore, pp. 28-29.

সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে আদেশ করেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণ বিব্রত হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। দাক্ষিণাত্যে যে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছিল সার আর্থার ওয়েলেস্‌লী তাহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে উড়িষ্যার কটক প্রদেশে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কর্ণেল হার্কট তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। কর্ণেল ফাগু‌র্শনের হস্তে জলেশ্বর ও বালেশ্বরের সৈন্য-দলের পরিচালনা ভার ন্যস্ত ছিল। ঐ সময় পৃথক একদল সৈন্য পটাশপুরও আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ইংরাজ জয়ী হইলেন। এই যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর, বেরারের রাজার সহিত কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, তাহার পরে মারহাট্টাদিগের অধিকৃত পটাশপুর, ভোগরাই ও কামার্দ্দাচোর পরগণা সমেত সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।* ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়গণ আর কোন দিন মেদিনীপুরের সীমায় পদার্পণ করিয়া কোনপ্রকার অত্যাচার করে নাই। বর্গীর অত্যাচার কাহিনী আলোচনা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; তাহাদের চিত্র ভারতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার বর্গী-কাহিনী ছেলে ঘুম পড়াইবার ছড়া মাত্র নহে—উহা বাঙ্গালীর রক্তরঞ্জিত বেদনার এক অশ্রুসিক্ত কাহিনী!

---

* Verelst's View—App. 57. Aitchison, Vol. I. p. 415.

নবম অধ্যায়।

ইংরাজ শাসনকাল।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বরের সন্ধির সর্ত্তানুসারে নবাব মীর কাসেম ইংরাজ কোম্পানীকে চাকলা বর্দ্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও থানা ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম) অধিকার ছাড়িয়া দিয়া ঐ বৎসরের ১৫ই অক্টোবর তারিখে এক সনন্দ প্রদান করেন। * এপ্রদেশে ইংরাজাধিকারের উহাই প্রথম দলীল। ঐ সময় ইদানীন্তনকালের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) ব্রাহ্মণভূম, (৩) বরদা, (৪) চন্দ্রকোনা, (৫) চিতুয়া, (৬) জাহানাবাদ, (৭) মণ্ডলঘাট, (৮) খারিজা মণ্ডলঘাট ও (৯) ভুরস্থট পরগণা চাকলা বর্দ্ধমানের অন্তর্ভূত ছিল এবং নিম্নলিখিত ৫৪টী পরগণা লইয়া চাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছিল ঃ—

চাকলা বর্দ্ধমান ও চাকলা মেদিনীপুরের পরগণা।

(১) কাশীজোড়া, (২) কিসমৎ কাশীজোড়া, (৩) সাহাপুর, (৪) মেদিনীপুর, (৫) সবঙ্গ, (৬) খান্দার, (৭) ময়নাচোর, (৮) কুতুবপুর, (৯) কেদারকুণ্ড, (১০) গাগনাপুর, (১১) পুরুষোত্তমপুর, (১২) খড়গপুর, (১৩) নাড়াজোল, (১৪) মাৎকদপুর, (১৫) গগনেশ্বর, (১৬) জাম্‌না, (১৭) নারায়ণগড়, (১৮) বলরামপুর, (১৯) কিসমৎ বলরামপুর, (২০) জুলকাপুর, (২১) ধারিন্দা, (২২) ছাতনা, (২৩) খটনগর, (২৪) শীপুর, (২৫) মীরগোদা, (২৬)

---

* Aitchison, Vol. I pp. 216-217.
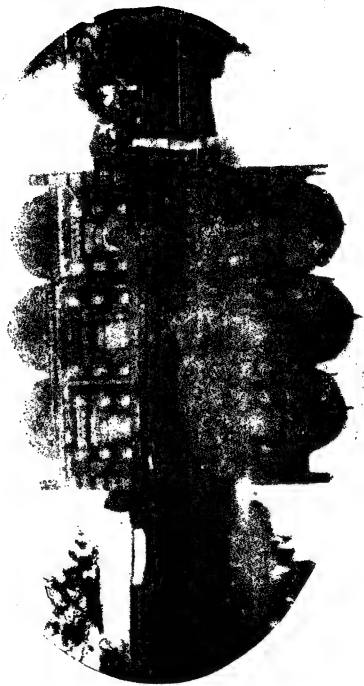
দেওয়ানখানার মস্‌জিদ্‌—মেদিনীপুর

তুরকাচোর, (২৭) কুড়ুলচোর, (২৮) লাঙ্গলেশ্বর, (২৯) দাঁতনচোর, (৩০) এগরাচোর, (৩১) নাপোচোর, (৩২) কাকরাচোর, (৩৩) হাভেলী জলেশ্বর, (৩৪) ভেলোরাচোর, (৩৫) রাজগড়, (৩৬) চক্ইস-মাইলপুর, (৩৭) কেশিয়াড়ী (৩৮) নারঙ্গাচোর, (৩৯) কাকরাজিত, (৪০) ফতেয়াবাদ, (৪১) জলেশ্বর, (৪২) অমর্শী, (৪৩) ভূঁঞামুঠা, (৪৪) প্রতাপভান, (৪৫) দেবমুঠা বা দত্তমুঠা, (৪৬) উত্তর বিহার, (৪৭) Chileapore (চিলিয়াপুর ?), (৪৮) বজরপুর, (৪৯) বীরকুল, (৫০) বালিসাই, (৫১) কামার্দ্দাচোর, (৫২) কিসমৎ কামার্দ্দাচোর, (৫৩) মাৎকদাবাদ ও (৫৪) ঔরঙ্গাবাদ (সম্ভবতঃ সাহাবন্দর)। * এই ৫৪টী পরগণার মধ্যে ছাতনা পরগণা এবং লাঙ্গলেশ্বর প্রভৃতি আটটি পরগণা পরবর্ত্তিকালে যথাক্রমে বাঁকুড়া ও বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুত হইয়াছে। কিসমৎ বলরামপুর ও Chileapore নামে এক্ষণে কোন পরগণা এই জেলায় বা নিকটবর্ত্তী কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না। কিসমৎ বলরামপুর পরগণাটি বলরামপুর পরগণার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু Chileapore পরগণার অবস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন।

অতঃপর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে পর চাকলা হিজলীতেও ইংরাজাধিকার

---

* গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণীতেও এই পরগণাগুলির নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিদেশীর নিকট বাঙ্গালা ভাষার নামের উচ্চারণের তারতম্যে ও মুদ্রাকরের দোষে কয়েকটি পরগণার নাম এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, এক্ষণে উহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুরূহ ব্যাপার।—যথা গাগনাপুর Gangapur, গগনেশ্বর Goabersa, আমনা—Ajib Gun, কাকরাচোর Akrajoor, কুড়ুলচোর Gozaljoor, লাঙ্গলেশ্বর—Lodenjoor, নাড়াজোল NaraJob, বলরামপুর—Bubrampur ইত্যাদি।
Grant's Analysis—Firminger— pp. 459-460.

প্রতিষ্ঠিত হয় *। সাজাহানের রাজত্বকালে ২৮টি মহাল লইয়া হিজলী ফৌজদারী প্রথম গঠিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে চাকলা হিজলীতে ৩৫টি পরগণা ছিল।

চাকলা হিজলীর পরগণা।

গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী হইতে জানা যায় যে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (আমলী ১১৩৫ সাল) হিজলী ৩৮টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে হিজলীর অন্তর্গত বীরকুল, আগ্রাচোর, মীরগোদা,দেবমুঠা, অমর্শী ও ভূঞামুঠা পরগণা চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্ভূত হওয়ায় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যে সময় হিজলীতে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় নিম্নলিখিত ৩২ টি পরগণা হিজলীর অন্তর্গত ছিল :—

(১) জলামুঠা, (২) কেওড়ামাল বিশ্‌ওয়ান, (৩) দক্ষিণমাল, (৪) বাহিরীমুঠা, (৫) পাহাড়পুর, (৬) গওমেশ, (৭) নয়াচক বাজার (বাইন্দা বাজার), (৮) ভাইট গড়, (৯) কালিন্দি বালিসাই, (১০) ভোগরাই, (১১) মাজনামুঠা, (১২) দোরো দুবনান, (১৩) নাড়ুয়ামুঠা, (১৪) কশবা হিজলী, (১৫) ইড়িঞ্চি, (১৬) হাঁসিয়াবাদ নয়াবাদ, (১৭) সরিফাবাদ, (১৮) আমিরাবাদ, (১৯) বালীজোড়া, (২০) পটাশপুর, (২১) কিসমৎ শীপুর (২২) মহিষাদল, (২৩) গুমগড়, (২৪) গুমাই, (২৫) অরঙ্গানগর, (২৬) কাশীমপুর, (২৭) তেরপাড়া, (২৮) শিলামনগর, (লাটশাল), (২৯) কেওড়ামাল নয়াবাদ, (৩০) সুজামুঠা, (৩১) মহম্মদপুর, (৩২) তমলুক। † এই বত্রিশটি পরগণার মধ্যে মহম্মদপুর নামে কোন পরগণা এমন দেখা যায় না।

---

* H. Verelst's View, Vol. I, pp. 225-226.

† গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণীতে চাকলা মেদিনীপুরের স্থায় চাকলা হিজলীর পরগণা কয়েকটীর নামেও সেইরূপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। যথা ইড়িঞ্চ—Gunhry গুমগড়—Koinguirah, তেরপাড়া—Tipra Carah ইত্যাদি।

Grant's Analysis—Firminger, pp. 365-366.

মেদনীপুর জেলার পরগণা-বিভাগ।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভে এই চাকলা বিভাগগুলিকে অবলম্বন করিয়াই এক একটি জেলা গঠিত করা হইয়াছিল। সুতরাং চাকলা বিভাগকেই জেলা বিভাগের মূল ভিত্তি বলা যাইতে পারে। তৎকালে হিজলী ও মেদিনীপুর দুইটি পৃথক জেলা ছিল। পরবর্ত্তিকালে এই দুইটি জেলা এক হইয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি জেলাই বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকায় নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলা দুইটির প্রান্তভাগ হইতে কোন কোন পরগণা নিকটবর্ত্তী অন্য জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন কোন পরগনা অন্য জেলা হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে। সেই কারণে তখনকার পরগণাগুলির নাম ও সংখ্যার সহিত এখনকার পরগণাগুলির নাম ও সংখ্যায় অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পরগণা আবার একাধিকবার আনীত ও স্থানান্তরিত হইয়াছেও দেখা যায়। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া নিম্নে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হইল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কামার্দ্দাচোর, কিসমৎ কামার্দ্দাচোর ও সাহাবন্দর পরগণা এবং চাকলা হিজলীর অন্তর্গত পটাশপুর ও ভোগরাই পরগণা উড়িষ্যার মারহাট্টাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৬৭ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত (১) বাহাদুরপুর, (২) বারাজিত, (৩) বেলাবেড়া, (৪) চিয়াড়া, (৫) দিগ্‌পারই, (৬) দ্বিপাকিয়ারচাঁদ, (৭) জামবনী, (৮) জামিরাপাল, (৯) ঝাড়গ্রাম, (১০) ঝাটিবনী (১১) কালরুই তপ্পা, (১২) খেলাড় ময়াগ্রাম, (১৩) মল্লভূম ঘাটশিলা, (১৪) রামগড়, (১৫) রোহিণী, (১৬) সাঁকাকুল্যা

লাঙ্গগড় ও (১৭) নয়াসান এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে (১) বরাহভূম, (২) মানভূম, (৩) শ্রীপুর, (৪) অম্বিকানগর, (৫) শিমলাপাল ও (৬) ভেলাই ডিহা, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বগড়ী ও ব্রাহ্মণভূম এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টাদিগের অধিকৃত পূর্ব্বোক্ত কামার্দ্দাচোর, সাহাবন্দর, পটাশপুর, ও ভোগরাই পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছাতনা ও উপরোক্ত বরাহভূম, মানভূম, শ্রীপুর, অম্বিকানগর, শিমলাপাল ও ভেলাইডিহা পরগণা এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কামার্দ্দাচোর, সাহাবন্দর ও লাঙ্গলেশ্বর পরগণা যথাক্রমে জঙ্গল-মহালের ও বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভূত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র হিজলী জেলা বা চাকলা হিজলীর অন্তর্গত পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩২টি পরগণার মধ্যে পটাশপুর, ভোগরাই ও মহম্মদপুর বাদে অবশিষ্ট ২৯টি পরগগা মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ, জলেশ্বর, নাপোচোর ও ভেলোরাচোর পরগণা বালেশ্বর জেলার সীমাভুক্ত হয় এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (প্রথমে বর্দ্ধমান চাকলার ও পরে হুগলী জেলার অন্তর্গত) পূর্ব্বোক্ত বরদা, চন্দ্রকোনা, চিতুয়া, জাহানাবাদ, মণ্ডলঘাট, খারিজা মণ্ডলঘাট ও ভুরসুট পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভূত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমরা মেদিনীপুর জেলার একশতটি পরগণার সন্ধান পাই। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে এই জেলায় একশত পনরটি পরগণা আছে। অবশিষ্ট পনরটি পরগণার মধ্যে (১) ওলমারা ময়ুরভঞ্জের গড়জাত মহাল; পরবর্ত্তীকালে কেবল ভৌগোলিক নিয়মেই উহা মেদিনীপুরের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছে। (২) কিসমৎ কেশিয়াড়ী, (৩) কিসমৎ খড়গপুর, (৪) কিসমৎ মেদিনীপুর, (৫) কিসমৎ নারায়ণগড়, (৬) কিসমৎ

সাহাপুর, (৭) কিসমৎ পটাশপুর ও (৮) খালিসা ভোগরাই পরগণা ঐ সকল নামের মূল পরগণাগুলিরই অংশ বা কিসমৎ। (৯) মনহরপুর ও (১০) ঢেকিয়া বাজার পরগণা আদিতে মেদিনীপুর পরগণার সহিত এবং (১১) বালিসীতা ও (১২) বাটিটাকী পরগণা যথাক্রমে সবঙ্গ ও নারায়ণগড় পরগণার সহিত সংযুক্ত ছিল জানা যায়। (১৩) বোড়ইচোর, (১৪) দণ্টখোড়ই ও (১৫) সেক পাটনাও ঐরূপ কোন এক বা একাধিক পরগণার অংশ হইবে।

কোম্পানীর রাজত্বে অশান্তি ও বিদ্রোহ।

এ প্রদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কয়েক বৎসর যাবৎ কোম্পানীকে নানাপ্রকার অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইতে হইয়াছিল। কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভকালে মেদিনীপুরে শান্তি ছিল না। ঐ সময়ের লিখিত সরকারী চিঠিপত্রগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তৎকালে মেদিনীপুরের চারিদিকেই অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় জমিদারগণ পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া সর্ব্বদাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেন। দেশে চোর ডাকাতের ভয় অত্যন্ত বেশী ছিল। খয়রা, মাঝি প্রভৃতি জঙ্গল-মহালের কয়েকটি অসভ্য জাতি ঐ সময় মেদিনীপুরের নিরীহ প্রজাবৃন্দকে নানাপ্রকারে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উহাদের দৌরাত্ম্যে কি ধনী কি নির্ধন সকলে সতত সশঙ্ক থাকিত। তীর ধনুকই তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোপনে বাস করিত। খয়রা ও মাঝিদিগের উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে চুয়াড়দিগের বিদ্রোহও মেদিনীপুরের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। এ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণের পর হইতেই কোম্পানীকে এই সকল বিদ্রোহ ও অশান্তি দূর করিয়া দেশে শান্তি রক্ষা করিতে বিস্তর চেষ্টা

করিতে হইয়াছিল। দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিতে তাঁহাদিগের প্রায় চল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আমরা প্রথমে কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম ভাগের সেই বিদ্রোহ ও অশান্তির ইতিহাস আলোচনা করিতেছি।

চুয়াড় ও পাইক সৈন্য।

বর্গীর হাঙ্গামার ন্যায় চুয়াড় উপদ্রবও মেদিনীপুরের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। যে সময় বহিঃশত্রু দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গ ধনে, প্রাণে উৎসন্ন যাইতেছিল, সেই সময় গৃহশত্রু চুয়াড়গণও কি ধনী কি নির্ধন মেদিনীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকেই দারুণ অশান্তি ও একটা হাহা-কারের রোল তুলিয়া দিয়াছিল। চুয়াড়গণ এই জেলার জঙ্গল-মহালে বাস করিত। এখন বাঙ্গালায় চুয়াড় বলিলে অসভ্য, গোঁয়াড় বুঝায়। তখন জঙ্গলে যে সকল বন্যজাতি বাস করিত তাহাদিগকেই চুয়াড় বলিত। চুয়াড়গণ কৃষিকার্য্য করিত না; পশু পক্ষী শীকার, জঙ্গল-মহালে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় এবং সুবিধা পাইলে দস্যুবৃত্তি করিয়াই তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তত্রস্থ জমিদারের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্য্য করিত। বেতনের পরিবর্ত্তে তাহা-দিগকে জায়গীর ভূমি প্রদত্ত হইত। ঐ সকল পাইক-সৈন্য যুদ্ধের সময় তীর, টাঙ্গী, বর্ষা, বাঁটুল প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইত। কোনও কোনও সৈন্যদলে বন্দুকও থাকিত। যখন সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিবার আবশ্যক হইত, তখন জমিদার-ভবনের তোরণ দ্বারে নাগরা-ধ্বনি করা হইত, তচ্ছ্রবণে দলে দলে সৈন্যগণ আসিয়া দুর্গ প্রাঙ্গণে সমবেত হইত। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের একখানি সরকারী চিঠিতে দেখা যায় যে, ঐ সকল জমিদারও দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। লোকের ধন-রত্ন লুণ্ঠন

করাই তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল এবং সে কার্য্যে ঐ সকল সৈন্যই তাঁহাদের সহায় ও সহচর ছিল। এই কারণে আত্মরক্ষা ও পরস্বাপহরণ উভয় কার্য্যেই অস্ত্র সজ্জার প্রয়োজন থাকায় পাইকগণ সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিত।

জঙ্গল মহালের চুয়াড় বিদ্রোহ।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ঐ দস্যুদলপতিদিগকে দণ্ডিত করিয়া দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপনের উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয় নাই। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী সাব্যস্ত করেন, জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল-মহালে সৈন্য পাঠাইয়া তত্তৎ স্থানের জমিদারগণকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে, আর তাহাদের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দুষ্টনীড় নষ্ট করিয়া দিতে হইবে।* কিন্তু সৈন্য সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় কার্য্যটি সত্বর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইতি মধ্যে ঐ কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই অন্যূন একশত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেণ্ট গ্রেহাম সাহেবের আদেশে লেপ্টেন্যাণ্ট ফার্গুশন সাহেব ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য এক দল সৈন্য লইয়া জঙ্গল-মহালে প্রবেশ করেন।

জঙ্গল-মহালের জমিদার।

ফার্গুশন সাহেব ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে সে স্থানের জমিদার বিনা আপত্তিতে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া বৰ্দ্ধিত রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী ঝাড়গ্রাম মহালের জমিদার বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হইলে ফার্গুশন সাহেব তাঁহার দুর্গ অধিকার করিয়া

* Firminger's Midnapore Records, 1763-67, Letter No. 60. p, 48.

লয়েন। অগত্যা উক্ত জমিদার অনন্যোপায় হইয়া বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত হইয়া জামীন দিলে তাঁহার দুর্গ তাঁহাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা প্রভৃতি মহালের জমিদারগণ একে একে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ফার্গুশন সাহেব আরও অগ্রসর হইয়া সিংহভূম, মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জমিদারদিগকেও পরাজিত করিয়া সেই সকল স্থানেও ইংরাজাধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। * মুসলমান রাজত্বের শেষাংশে জঙ্গল-মহালের জমিদারগণ কতকটা অর্দ্ধ স্বাধীন রাজার ন্যায় বাস করিতেন। ফার্গুশন সাহেবকে এক একটি মহালের প্রত্যেক জমিদারের সহিতই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই অভিযানে চুয়াড়দিগের বিষাক্ত তীরে ও ব্যাধিতে কোম্পানীর সৈন্য-ক্ষয়ও যথেষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যদিগকে সেজন্য বিশেষ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু পরিশেষে ইংরাজের বিজয় পতাকা একে একে সমস্ত অরণ্য দুর্গগুলিতেই উড্ডীন হইয়াছিল।

ঘাটশিলার বিদ্রোহী জমিদার।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে ঘাট-শিলার পার্ব্বত্য প্রদেশের চুয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জঙ্গল জমিদার-দিগের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যবলও অধিক ছিল এবং একটি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। ফার্গুশন এই দুর্গটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'উহা জঙ্গলের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি পরিমাণ ১১৫০ বর্গ ফিট এবং উহা সুবৃহৎ ও সুগভীর পরিখারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। চতুর্দ্দিকে কঙ্করময় গড় প্রাচীর। উত্তর দিকে প্রধান দরজা এবং দক্ষিণ পশ্চিম কোণে

* Firminger's Midnapore Records, 1763-67.

অন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বার। দুইটি দ্বারের সম্মুখেই দুইটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু বিদ্যমান। প্রথম পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার, তৎপরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখা। দুর্গের কেন্দ্রস্থলে জমিদারের বাটী। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৪০ ফিট। গড়টীর মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখাটির উত্তর পশ্চিম কোণে দুইটি তড়াগ আছে'। * ঘাটশিলার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য লেপ্টেনাণ্ট ফার্গুশন সাহেব পুনরায় একদল সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হয়েন। এই যুদ্ধে ঘাটশিলার বৃদ্ধ জমিদার যথেষ্ট সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের পক্ষপাতিনী ছিলেন। বৃদ্ধ রাজা পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হয়েন এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ইংরাজ কর্ত্তৃক ঘাটশিলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মেদিনীপুরে চুয়াড় হাঙ্গামা।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জঙ্গল-মহালের চুয়াড়গণ পুনর্ব্বার এক বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। তাহারা প্রথমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে শিলদা পরগণার অন্তর্গত দুইটি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া এই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পর মাসে তাহারা রায়পুরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে। জুলাই মাসে গোবর্দ্ধন দিক্‌পতি নামক এক বাগ্দী সর্দ্দারের অধীনে চারিশত দস্যু চন্দ্রকোণা থানার এলাকায় উপস্থিত হয়; পরে তাহারা কাশীজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, ময়না, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছা অত্যাচার করিয়া প্রজাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে। চুয়াড়গণ ক্রমশঃ অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠে এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতখানি বৃহৎ

* Firminger's Midnapore Records, 1763-67, Letter No. 167. p. 130-131.

গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী বলরামপুর, শালবনী প্রভৃতি স্থানেও তাহারা লুণ্ঠন ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর চুয়াড়গণ মেদিনীপুর পরগণাতে প্রবেশ করিলে আতঙ্কতাপিত প্রজাগণ মাঠের শস্য মাঠে রাখিয়া প্রাণভয়ে কোম্পানীর সৈন্য রক্ষিত মেদিনীপুর, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে থাকে। মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়ে চুয়াড়দিগের দুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই দুইটি কেন্দ্র হইতে তাহারা লুণ্ঠন কার্য্যে বাহির হইত এবং ফিরিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া লইত। ঐ সময় মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টার (Julius Mihoff) লিখিয়াছিলেন যে, অতি সামান্য চেষ্টাতেই চুয়াড়দিগকে দমন করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে দেশে শান্তিও স্থাপিত হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত তৎকালীন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেগরী সাহেবের মনোমালিন্য থাকার দরুণই হউক অথবা মেদিনীপুরের সৈন্য সংখ্যার অল্পতা বশতঃই হউক সে সময় চুয়াড়দিগকে দমন করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। তাহাদের অত্যাচার পূর্ব্ববৎই অবাধে চলিতে থাকে।

চুয়াড়দিগের অত্যাচার।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠস্থিত কয়েকখানি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ও জ্বালাইয়া দিয়া চুয়াড়গণ প্রচার করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনীতে তাহারা মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিবে। কালেক্টারেরও আশঙ্কা হইল, তাহারা তোষাখানা লুঠিয়া লইবে। কারণ তোষাখানায় তখন মাত্র সাতাইস জন প্রহরী ছিল, আর আক্রান্ত হইলে তাহারাও যে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধ করিবে তাহাও সম্ভবপর নহে।

* District Gazetteer—Midnapore—p. 42-43.

কালেক্টর নিরুপায় হইয়া ৭ই মার্চ্চ তারিখে বোর্ডে লিখিলেন, চুয়াড়-দিগকে দমন করিবার কোন চেষ্টাই হইল না, এদিকে তাহারা প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবৃন্দ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে; কিন্তু সেখানেও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না, তাহাদের অন্ন সংস্থানের উপায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যাহারা বনের কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারাও ভয়ে বনে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। *

১৬ই মার্চ্চ তারিখে চুয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণ করিয়া বহু প্রজা ও দুইজন সিপাহীর প্রাণনাশ করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মেদিনীপুরে পলাইয়া আসে। কিন্তু মেদিনীপুরও নিরাপদ ছিল না! ১৭ই মার্চ্চ তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব কর্ণেল ডন্‌কে লিখেন যে, ঐ দিন রাত্রিকালে চুয়াড়গণ কর্ত্তৃক মেদিনীপুর সহর লুণ্ঠনের সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য তিনি তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় রাখিতে ইচ্ছা করেন। তাহার পর তাঁহার লিখিত ২১শে তারিখের পত্র হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত রাত্রিতে চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দগ্ধ করিবে বলিয়াই স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাইয়া সহরবাসী অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয়ও লইয়াছিল; কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চতুরতায় তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, চুয়াড়দিগের সহর আক্রমণের সংবাদ পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ দুই দল দেশীয় সিপাহী ও পঞ্চাশ জন ইংরাজ সৈন্য সহরে আনিয়া রাখিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর লুণ্ঠন করিতে আর অগ্রসর হয়

* District Gazetteer, Midnapore—p 42-43.

নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক যায় নাই; তাহাদের অনেকেই রাত্রিকালে পুত্র, কন্যা ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া কালেক্টরের গৃহপ্রাঙ্গনে রাত্রি যাপন করিত। দিবাভাগেও সহরের বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের তদানীন্তন সদাশয় কালেক্টর দেশের এইরূপ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া বোর্ডে জানাইয়াছিলেন যে, মেদিনীপুর জেলার, বিশেষতঃ মেদিনীপুর পরগণার দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত; তথায় নিত্য লোকের উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা তিনি আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। কোম্পানী হয় ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করুন, নয় তাঁহাকেই স্থানান্তরিত করা হউক। এই সকল বিবরণ হইতে একদিকে যেমন মেদিনীপুরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায় তেমনই অপর দিকে আবার কোম্পানীর উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীদিগের নিশ্চেষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তখনও দেশ শাসন ইংরাজ আপন কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করেন নাই; পরিশেষে দেশের লোকের দুঃখে বিচলিত হইয়া তাঁহারা সে কৰ্ম্মভার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

কালেক্টরের বারম্বার রিপোর্টের পর কর্ত্তৃপক্ষ আর অধিক দিন এ ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কর্ণগড় ও আবাসগড় আক্রমণ করা হইল এবং চুয়াড়দিগের সহকারিতা সন্দেহ হেতু কর্ণগড়ের জমিদার রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে আনা হইল। ২০শে মে তারিখে আরও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি কেন্দ্রে সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়ক আখ্যাধারী ৩০৯ জন সৈনিক কৰ্ম্মচারী রক্ষিত হয়। ইহার পর চুয়াড়গণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া

চুয়াড় দমন।

এক পরগণা হইতে অন্য পরগণায় বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং প্রজারা ক্রমে ক্রমে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চাষ আবাদে মন দিল। জুন মাসের মধ্যে চুয়াড়দিগের সমস্ত আড্ডা দখল করিয়া লওয়া হয়। ইহার পর তাহারা আর দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া গ্রামবাসিকে দেশ ছাড়া করিতে পারে নাই; তবে ইহার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত তাহারা স্থানে স্থানে দু'একটি নরহত্যা করিয়া বা ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে ডাকাতী করিয়া কাটাইয়াছিল।

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার ও সেটেলমেণ্ট আফিসার জে, সি, প্রাইস সাহেব লিখিয়াছেন, মেদিনীপুরের চুয়াড়-বিদ্রোহ এক নৃশংস অত্যাচারের ইতিহাস। জায়গীর বাজেয়াপ্ত সরদার ও পাইকগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে; তাহারা মনে করিয়াছিল, এই সকল অত্যাচারের ফলে সরকার বাহাদুর শেষে বাধ্য হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল অঞ্চলের সকল দুর্দ্দান্ত জাতিই ঐ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত অত্যাচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিল। মেদিনীপুরের পুলিশ ও সৈন্যগণ তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই—বাহির হইতে সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল। দেশে অত্যাচারের অবধি ছিল না।

জঙ্গল-মহালের পাইকান জমি।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে জেলার কালেক্টর বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও দেখা যায় যে, পাইকান জমী বাজেয়াপ্ত করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চুয়াড়গণ অসভ্য ও ইংরাজ শাসন প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, তাহারা যখন

দেখিল যে, সহসা তাহাদের পুরুষানুক্রমে অধিকৃত জমী পুলিশের জন্য বাজেয়াপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা মনে করিল, যাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশা করা বৃথা; সেইজন্য তাহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া দেশ মধ্যে লুণ্ঠন ও অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা রাজস্ব আদায় একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমীর ব্যবস্থা বিষয়ে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব হ্রাস ও আদায়ের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বোর্ড স্থির করেন, চুয়াড়দিগের অত্যাচার নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত পাইকান জমীর বন্দোবস্ত স্থগিদ থাকিবে। পুলিশের দারোগারা অনাচার নিবারণে অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়ায় জঙ্গল-মহালের জমিদারদিগের হস্তে ঐ সময় পুলিশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল জমিদারের প্রজারা চুয়াড়দিগের লুণ্ঠনে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধেও সরকার বাহাদুর যথাসম্ভব শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। *

জঙ্গল-মহাল জেলা।

জঙ্গল খণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইলে পর, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম, বর্দ্ধমান, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি করিয়া জঙ্গল-মহাল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া "জঙ্গল-মহাল" জেলা নামে একটি নূতন জেলা গঠন করা হয়। † তৎকালে ঐ জেলায় তেইশটি মহাল ছিল এবং একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতেন।

---

* J. C. Price—The Chuar Rebellion of 1799.

† Regulation XVIII of 1805.

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ জেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উহা উঠাইয়া দিয়া উহার অন্তর্গত মহালগুলি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা কয়েকটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। * প্রাগুপ্ত মহালগুলির অধিকাংশই মানভূম জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি প্রায় সেইরূপই আছে।

জঙ্গল খণ্ডে চুয়াড়দিগের অত্যাচার নিবারিত হইতে না হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশের বন্য জাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মেদিনীপুরে এই বিদ্রোহ সাধারণতঃ "বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। নাএকগণ প্রায় চুয়াড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত। তাহারা কুক্কুট মাংস আহার করিলেও হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিত এবং গো ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিল। বগড়ীর রাজবংশ কর্ত্তৃক উহাদের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহারা সেই জায়গীর ভোগ করিত এবং আবশ্যক হইলে রাজ-সরকারে পাইক সৈন্যের কার্য্য করিত। কোম্পানীর আমলে বগড়ীর রাজা ছত্র সিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে বগড়ীর জমিদারী ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা হয় এবং নাএকদিগের জায়গীরও বাজেয়াপ্ত হয়। রাজা ছত্র সিংহের অধঃপতনে বহু সংখ্যক নাএক সৈন্য আপন বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচল সিংহ নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক পুরুষের নেতৃত্বে ইংরাজ শক্তির বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়।

বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা।

নাএকগণ গড়বেতার নিকটবর্ত্তী নিবীড় বনভূমি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বগড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্ত স্থল পর্য্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে এবং ইংরাজাধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতীয় নরনারীর সর্ব্ব-

* Regulation XIII of 1833.

নাশ সাধন করিতে থাকে। নাএকগণের দারুণ অত্যাচারে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার পার্শ্ববর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ জনপদ কাঁপিয়া উঠে। শত শত নরনারীর রোদনারোল আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অবশেষে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। অচিরকাল মধ্যে গবর্ণার জেনারেলের আদেশে ওকেলী নামক জনৈক ইংরাজ বীর একদল ব্রিটীশ সৈন্য লইয়া বগড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গনগণির অরণ্যে বন্যজাতীয় অশিক্ষিত নাএকগণের সহিত সুসভ্য, সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের খণ্ড যুদ্ধ অনেকদিন ধরিয়াই চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিত না, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া ইংরাজ সৈন্যের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিত। এইরূপে ইংরাজ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে পর, ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ একদিন রাত্রে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া ক্রমাগত গোলা বর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। নাএকগণ এবার প্রমাদ গণিল; অনেকেই প্রাণ হারাইল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারা সে অনলের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। ইংরাজসৈন্য সে রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন। পর দিন বৃক্ষ শাখায়, বনান্তরালে ও নদী পুলিনে অনুসন্ধান পূর্ব্বক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল। কিন্তু অচল সিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য কয়েকজন সৈন্য বগড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরের সেনানিবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

অচল সিংহ গণগনির বন হইতে পলাইয়া গিয়া জঙ্গলময় বগড়ীর

পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে যে আর একটি বন দেখিতে পাওয়া যায় সেই বনে আড্ডা স্থাপন করেন। যে সকল নাএক ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণে চারিদিকে পলায়ন করিয়া জীবনটা বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহারা আবার একে একে আসিয়া অচল সিংহের নবশিবিরে সমাগত হইল এবং ক্রমশঃ লুণ্ঠনপ্রিয় রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অচল সিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা ইংরাজাধিকৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া নিরীহ পল্লীবাসির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক আপনাদের নষ্ট ঐশ্বর্য্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে লাগিল। যে সকল ইংরাজ সৈন্য অচল সিংহকে ধৃত করিবার জন্য বগড়ীর বনপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিল তাহারা উহার কোন প্রতিকারই করিতে পারিল না। এই সুযোগে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্র সিংহ ইংরাজের হিতসাধন করিয়া প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার মানসে বিবিধ কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অচল সিংহকে ধৃত করিয়া ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে নাএক বীর অচল সিংহ রাজা ছত্র সিংহের আচরণে সংক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। বগড়ীর রাজবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

নাএক দলপতি অচল সিংহ।

অচল সিংহের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিলে নাএকগণ তাহাদের দলস্থ অন্যান্য সৈনিক পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া আরও কিছুদিন ইংরাজগণের প্রতিদ্বন্দিতা ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিল। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্যের পরাক্রমে নাএকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত

নাএকদিগের পরাজয়।

হয়। তাহাদের আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৭ জন দলপতিকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী দেওয়া হয়। ঐ বৎসরে প্রায় দুই শত জন বিদ্রোহীকে নিহত করা হইয়াছিল। নাএকরা স্বভাবতই উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে যে তাহাদের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য, ইহা জানিত বলিয়াই তাহারা প্রায়ই প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কোম্পানীর সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। এই কারণে নাএক হাঙ্গামা কিরূপ ভীষণভাবে মেদিনীপুর জেলায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হ্যামিল্টন সাহেবের বিবরণ হইতে বিশেষ জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশে ব্রিটীশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেও ব্রিটীশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের প্রজারা নিরাপদ নহে। ঐ স্থানের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা কোন রাজারই অধীন নহে। সে দেশে অত্যাচারীদিগের বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে অত্যাচারীগণ সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে একটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না। সামান্য কোন কারণে বা অর্থ লোভে প্রাণ নাশ করিতে সে দেশের লোকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।*

সন্ন্যাসী উপদ্রব।

চুয়াড় বিদ্রোহ ব্যতীত সন্ন্যাসী হাঙ্গামার দু'একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও মেদিনীপুরের শান্তি নষ্ট করিয়াছিল। সে সময় সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, বিশেষতঃ এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে গমনাগমন করিত। সাধারণতঃ উত্তর-ভারতের ভবঘুরে ব্যক্তিরাই মিলিত হইয়া এই দল গঠন করিত, পরে স্থানীয় চোর, বদ্‌মায়েস প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের দ্বারা ঐ দল পুষ্ট

* W. Hamilton's Description of Hindustan, 1820, Vol. 1. p. 152.

হইত। এক একটি দলে শত শত সন্ন্যাসী থাকিত এবং তাহারা রীতিমত অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র সমভিব্যবহারে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের গমন পথে যে সকল গ্রাম ও নগরাদি পড়িত তাহা লুণ্ঠন করিত এবং ধনীদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্যাদি আদায় করিয়া লইত। যাহারা বাধা দিত তাহাদিগকে প্রহার, এমন কি সংহার পর্য্যন্ত করিত। কোম্পানীর প্রথম আমলের কাগজ পত্রাদিতে সন্ন্যাসীদিগের প্রভূত অত্যাচারের বিবরণ বিবৃত আছে। এই সন্ন্যাসীর দল সাধারণতঃ বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বাংশেই ভ্রমণ করিত—মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্র যাইবার পথে মেদিনীপুরের উপর অত্যাচার করিয়া যাইত।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে একদল সন্ন্যাসী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট তাহাদিগের কতকগুলিকে হত, আহত ও বন্দী করেন এবং বাকীগুলিকে দল ভ্রষ্ট করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে আরও একদল, প্রায় তিন সহস্র সন্ন্যাসী, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে রায়পুর প্রদেশে দেখা দেয়। এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রেই তাঁহারা একদল সৈন্য সমভিব্যহারে কাপ্তেন ফরবেস্ সাহেবকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্থানীয় জমিদারগণও তাঁহাদের লোকজন লইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া সন্ন্যাসীরা ফুলকুসুমা হইতে জঙ্গল-মহালে প্রবেশ করিয়া আলমপুর ও গোপীবল্লভপুরের মধ্য দিয়া মারহাট্টাদিগের অধিকারে চলিয়া যায়। ফরবেশ সাহেব তাহাদিগের সাক্ষাৎ পান নাই। তবে পরবর্ত্তী জুন মাসে অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন এডওয়ার্ডস্ তাহাদিগের কয়েক-

জনকে ধরিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত হইয়াই আসিতে হইয়াছিল।

ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে আবার সংবাদ পাওয়া যায় যে, অন্য দুই দল সন্ন্যাসী বালেশ্বর জেলা হইতে উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে তাহারা মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য কাপ্তেন হার্সের অধীনে একদল সেনা জলেশ্বরে প্রেরিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীরা এই সংবাদ পাইয়া দল ভাঙ্গিয়া জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। হার্সে তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই। নভেম্বর মাসে তাহারা পুনরায় মিলিত লইয়া ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত হয়। মেদিনীপুর হইতে কাপ্তেন টমাস সসৈন্যে তাহাদিগের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে তাহারা পার্ব্বত্য পথে প্রয়াগের দিকে চলিয়া যায়। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা আর মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনপ্রকার উপদ্রব করিতে না পারে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে আর তাহারা এই জেলার মধ্যে বিশেষ কোন উৎপাৎ করে নাই। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভিত্তির উপরেই তাঁহার 'আনন্দ মঠ' নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

এই সকল হাঙ্গামা নিবারণ করিতে কোম্পানীর প্রায় ৪০।৫০ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর ইংরাজ রাজত্বে রাজকীয় বিশৃঙ্খলার স্মরণীয় ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে মেদিনীপুরের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

সিপাহী বিদ্রোহ।

"১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের

ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পোঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় পল্টন ছিল তাহার নাম Shekawatee Battalion ছিল। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসী দেন। একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনই মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ Phœnix কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবেরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। একদিন সাহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া সিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান দুর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে, সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে। বৃষ্টি পড়িলেই প্রবাহমান হয়। সাহেবেরা ও কোন কোন ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে, যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকা চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টার সাহেব

খানা খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী কাছারীর কোন ভৃত্য সখ করিয়া একটি বোমা ছুড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপরাশীর উপর চাপরাশী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টুলেনের ভিতর ধুতী পরিয়া কাজ করিতাম। যখনই সিপাহী আসিবে প্যাণ্টুলুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতী ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টুলেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবা বিবাহের উপর তাহাদিগের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। পরিবার কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন বন্ধুর বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময় লাল কোর্ত্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরী নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল। আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম, সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। Ostrich (অসট্রিচ্) পাখী যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ, তেমনই ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে, বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যাণ্টুলুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতী বাহির করিতেছিলাম

এমন সময়ে আমরা শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে এইরূপ ধূমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালী-দিগের সভা ডাকাইয়া বলিলেন, যে কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাহাকে জেলে দিব। সাহেব উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন। বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সকলে উপস্থিত আছেন কিনা জানিবার জন্য সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফাপার উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "ড্যানিডর রায়" এবং স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনিস্‌পেক্টার উমাচরণ হালদারের নাম "ওমরচন্দ হাবিলদার" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগী গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি সহরে এইরূপে চৌকী দিতেন। সংবাদ পত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে, Shekwattee Battalion মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে এই পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব* হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।"

* রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—পৃঃ ১০১-১০৪।

বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর বাঙ্গালার সিপাহী বিদ্রোহের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহার মধ্যেও মেদিনীপুরের Shekwattee Battalion ও পূর্ব্বোক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণের (Police Barkandaz) উল্লেখ আছে। উহা হইতে আরও জানা যায় যে, ঐ সৈন্যদল মেদিনীপুর হইতে ছোট নাগপুরে স্থানান্তরিত হইলে স্থানীয় সাঁওতালদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ অশান্তির সূচনা দেখা দিয়াছিল। কমিশনার সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট উহা জানাইলে ছোটলাট বাহাদুর মেদিনীপুরে আবার ক্রমান্বয়ে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।* ফলে সিপাহী বিদ্রোহের বিশেষ কোনও গোলযোগে মেদিনীপুরবাসীকে বিপন্ন হইতে হয় নাই। তবে অন্যান্য স্থানের পরাজিত সিপাহীগণ পলায়নকালে মেদিনীপুরের কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় লুণ্ঠন ও অত্যাচারাদি করিতে ত্রুটী করে নাই। মেদিনীপুরের প্রাচীন লোকদিগের নিকট তাহার দুই একটি কাহিনী অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরে ফরাসীদিগের কুঠী ও ব্যবসা-বাণিজ্য।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলে ইউরোপীও বিভিন্ন দেশের বণিক্‌গণ একে একে হিজলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা এই জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করতঃ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই জেলার দক্ষিণাংশের হিজলী, তমলুক, কেন্দুয়া (কাঁথি †) প্রভৃতি

* "Minute, dated the 30th. Sept. 1858, recorded by the Lieutenant Governor Sir Frederic Halliday K. C. B." Bengal under the Lieutenant Governors by C. B. Buckland C. S. Vol. I. pp. 138-140.

† W. Hedge's Diary Vol. II. p. 131. Midnapore Gazetteer, p. 175.

স্থানের ন্যায় উত্তরাংশের মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর প্রভৃতি স্থানেও পর্টুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদিগের ব্যবসায় চলিয়াছিল। পরে ইংরাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইতে না পারিয়া পর্টুগিজ ও ওলন্দাজ বণিক্গণ ধীরে ধীরে এ প্রদেশ হইতে কারবার উঠাইয়া দেন। তাহাদের প্রায় সমস্ত কুঠীগুলি ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়। ইংরাজ কোম্পানী যে সময় মেদিনীপুর জেলার অধিকার প্রাপ্ত হন সে সময় এ দেশে কেবল ফরাসীদিগের কারবার চলিতেছিল। জেলার যে কয়েকটি স্থানে ফরাসীদিগের কুঠী ছিল তন্মধ্যে ক্ষীরপাই, মোহনপুর ও খাজুরীর কুঠীর নাম উল্লেখ যোগ্য। মোহনপুরে উৎকৃষ্ট সাদা কাপড় এবং ক্ষীর-পাইতে সুতার ও রেশমের নানাপ্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এই সকল কুঠী চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টার ও মন্ত্রী সভার কর্তৃত্বাধীনে ছিল। প্রত্যেক কুঠীতে একজন করিয়া ফরাসী রেসিডেণ্ট থাকিতেন; তিনি দালালদিগকে দাদন দিয়া কার্য্য করিতেন। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলিত। সময় সময় দালালগণ টাকা বাকী ফেলিলে উহা আদায়ের জন্য তাহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও সে সময় উভয় জাতির মধ্যে আন্তরিক সদ্ভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একবার ফরাসীদিগের খাজুরীর কুঠীতে বিস্তর চাউল সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সন্দেহ হয় যে, শীঘ্রই এদেশে ফরাসী সৈন্য আসিবে, সেইজন্যই ঐ চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইতেছে। সেই বিশ্বাসে তাহারাও প্রস্তুত হন। ফরাসীদিগের গতিবিধি লক্ষ করিবার জন্য একদল সৈন্য খাজুরীতে এবং একদল সৈন্য প্রথমে কাঁথিতে ও তৎপরে আমীরাবাদে প্রেরিত

হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও ফরাসী সেনার আগমনের কোন সংবাদ না পাইয়া জুলাই মাসের শেষে ইংরাজ সৈন্য-দলকে ফিরাইয়া আনা হয়।*

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মেদিনীপুরের তৎকালীন ইংরাজ রেসিডেণ্ট বাবর সাহেবের হঠকারিতায় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরাজের পুনরায় একটু মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফরাসী এজেণ্ট লরেণ্ট সাহেব তাঁহাদের মোহনপুর ও ক্ষীরপাইর কুঠী পরিদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন সিপাহী-সহ মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। বাবর সাহেব তাঁহাকে পথে আটক করিয়া বলেন "আপনাদের চন্দননগরস্থ গবর্ণমেণ্ট আপনাকে আমাদের এলাকার মধ্য দিয়া সৈন্যসহ যাইবার জন্য যখন আমাদের কলিকাতার কাউন্সিলের অনুমতি লয়েন নাই, তখন আমি আপনাকে সৈন্যসহ আমার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইতে দিতে পারি না। তবে আমি আপনার সৈন্যদিগকে আমার দুর্গের মধ্যে আটক রাখিয়া আমার কয়েকজন সৈন্যকে আপনার সঙ্গে দিতে পারি, আপনি তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন।" ফরাসী এজেণ্ট এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন নাই; অগত্যা অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর বাবর সাহেব তাহাকে যাইবার অনুমতি দেন। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহা অপমানজনক বোধ করিয়া ৮ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিলে এক পত্র লিখেন। কাউন্সিল সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট দুঃখিত হইয়া পত্র লিখেন এবং বাবর সাহেব তিরস্কৃত হন।† ফলে কোম্পানীর গবর্ণর ও কাউন-

* District Gazetteer—Midnapore—pp. 46-47.

† Firminger's Midnapore Records, 1767-70, pp. 203-205.

দিগের সভ্যগণের সুবিচারে হাঙ্গামা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের প্রকাশ্যরূপে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উহার আয়োজন ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সেই সময়ে, ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, এ দেশের প্রায় সমস্ত কুঠী ফরাসীরা উঠাইয়া দেয়।

কোম্পানীর কয়েকটি কুঠীও মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে মেদিনীপুর সহরের থান কাপড়ের কুঠী এবং ক্ষীরপাইর বয়ন-কারখানা সমধিক প্রসিদ্ধ। কোম্পানীর রেসিডেন্টরাই ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অধ্যক্ষরূপে (Commercial Agent) ঐ সকল কুঠীর কার্য্যাদি তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ইদানীন্তনকালের ঘাটাল মহকুমা তৎকালে চাকলা বর্দ্ধমানের ও পরে হুগলী জেলার অন্তর্ভূত থাকায় ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানের কুঠীগুলি প্রথমে বর্দ্ধমানের রেসিডেন্টের এবং পরে হুগলীর অধ্যক্ষর কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। এতদ্ব্যতীত এই জেলার অন্যান্য কুঠীগুলি তৎকালে মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের হস্তে ছিল। রেসিডেন্ট মহাজনদিগকে রেসম ও রেসমী কাপড় এবং সুতার কাপড় সরবরাহের জন্য দাদন দিতেন। তাহাদের সহিত চুক্তি থাকিত যে, তাহারা কোম্পানী ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঐ সকল দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে না এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে কুঠীতে মাল পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। মহাজনেরাও আবার রেসম ও তুলার চাষীদিগের সহিত এবং তন্তুবায়দিগের সঙ্গে পূর্ব্বোক্তরূপ চুক্তি করিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে কোম্পানীর কুঠীতে মাল জোগান দিত। অতঃপর সেগুলি কুঠীতে বস্তাবন্দি হইত এবং সরকারী রাজস্বের সঙ্গে সিপাহী পাহারা দিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া হইত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ও কারবার।

কলিকাতা হইতেই সেগুলি বিক্রয় হইত বা বিক্রয়ের জন্য দেশান্তরে পাঠান হইত।

রাধানগরের কুঠী রেসমের জন্য বিখ্যাত ছিল। তৎকালে মেদিনীপুরের রেসম অনেক স্থানেই প্রেরিত হইত। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেণ্ট রেসমের রপ্তানী আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে তুঁত গাছের চাষের জন্য নাম মাত্র জমায় অনেক জমী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যবসায়ের অধিকতর উন্নতি ও কাপড়ের উৎকর্ষ-সাধন জন্য গ্রিমণ্ড (Grimand) নামক একজন বিশেষজ্ঞকে মেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই সকল কারবার বিশেষ বিস্তৃত হইয়া পড়ায় রেসিডেণ্টের পক্ষে উহার তত্ত্বাবধারণ করা অসুবিধাজনক হইতে থাকে। সেই কারণে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী একজন পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে এই সকল কারবার ও কুঠীর ভারার্পণ করেন। তিনি Commercial Resident নামে পরিচিত ছিলেন। এ প্রদেশে বহুদিবস পর্য্যন্ত কোম্পানী কারবার চালাইয়াছিলেন। পরে একে একে সমস্ত কারবারগুলি উঠাইয়া দেন এবং কুঠীগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই সকল কুঠীর ভগ্নাবশেষ এখনও এই জেলার নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। কোম্পানীর আমলের অনেক চিঠীপত্রেই সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায়।

হিজলীর লবণ-কারবার।

কাপড়ের ব্যবসায় ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের কারবার তৎকালে কোম্পানীর হাতে ছিল; তন্মধ্যে হিজলীর লবণ কারবারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর ইহা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতেই হিজলীর এই লবণ কারবারে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার হয়। ইংরাজ রাজত্বের

বহু পূর্ব্ব হইতেই, এমন কি মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেও নিম্নবঙ্গ বিশেষতঃ হিজলী প্রদেশ, লবণ প্রস্তুতের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শালতী করিয়া অতি সহজে লবণ লইয়া যাইবার জন্য বদরশাচরের সম্মুখস্থ ডাঙ্গা হইতে সাকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছিল। উহা সাধারণতঃ "নিমকীর খাল" নামে পরিচিত ছিল। কোন্ কালে কে এই কার্য্য করিয়াছিল তাহা জানা যায় না; কিন্তু এই পথ দিয়া অতি অল্প দিনেই উড়িষ্যায় যাওয়া যাইত। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য দেব এই পথ দিয়াই যাত্রা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও এই পথ দিয়া সাকরাইল হইতে সরস্বতী বাহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর অতিথি হইয়াছিলেন। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে আছে, শ্রীমন্তের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় পার হইয়া কালীকট যাইবার সময় 'ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।' গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হইলে লোকে ইহাকে 'কাটি-গঙ্গা' বলিতে লাগিল। এইজন্য কাটি-গঙ্গার কোন মাহাত্ম নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজেরা এই অংশটি কটিয়া দিয়া গঙ্গাকে সরল পথে চালাইয়া দিয়াছেন; উহা নিতান্ত ভ্রম। ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গার এই গতি হইয়াছে। *

মুসলমান রাজত্বে সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে হিজলীর নিমক-মহালের উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবী আমলে হিজলীর লবণ কারবার নবাব সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশীয় জমিদারদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইত। † তৎকালে এ দেশ হইতে লবণ লইবার

---

* নব্যভারত—কলিকাতার ইতিবৃত্ত—২০ খণ্ড—পৃঃ ৪৬৮।

† Fifth Report on East India Affairs—Firminger, Vol. II. pp. 182, 365-372.

জন্য দলে দলে কাশ্মিরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিয়া প্রভৃতি নানাদেশীয় ব্যবসায়ীরা আসিত। * ইহাতে এ প্রদেশের লোকেরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। পরবর্ত্তিকালে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এই কার-বারটি একচেটিয়া করায় বিদেশী ব্যবসায়ীগণের এ দেশে আগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এ প্রদেশে লবণ প্রস্তুতের কার্য্য চলিত। সাধারণতঃ যে সকল জমী বর্ষাকালে জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত সেই সকল জমীতেই লবণ প্রস্তুত হইত। ঐ সকল জমীকে 'চর' বলিত। চরগুলি আবার 'খালাড়ী' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক খালাড়ীতে সাতজন করিয়া লোক নিযুক্ত থাকিয়া গড়ে দুইশত তেত্রিশ মন লবণ প্রস্তুত করিত। ঐ সকল লোক 'মলঙ্গী' নামে অভিহিত হইত। † মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত পুঁথিখানিতেও ঐ মলঙ্গীদের নাম ও হিজলীর লবণ ব্যবসায়ের উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। হিন্দু রাজত্বেও যে এ প্রদেশে লবণ ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহার সাপক্ষে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

লবণ-প্রস্তুত প্রণালী।

মলঙ্গীরা সাধারণ প্রথায় মৃত্তিকা হইতে লবণাম্বু পরিস্রবণ করিয়া উহাকে কাষ্ঠের আগুনে উত্তপ্ত করিত। ফলে জলটি বাষ্পাকারে পরিণত হইত এবং লবণটি পাত্রের নীচে থাকিয়া যাইত। পরে ঐ লবণ একত্রিত করিয়া গুদামে জমা করা হইত। লবণাম্বু উত্তপ্ত

* মহারাজা নন্দকুমার,—সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত।

† Fifth Report—Firminger—Vol. II. 365-372.

করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থান হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইত সেই সকল জমীকে 'জালপাই জঙ্গল' বলিত। এইজন্য জালপাই জঙ্গলকে বিশেষভাবে রক্ষা (Reserved forest) করা হইত।

নবাব সরকার মলঙ্গীদের বেতন স্বরূপ প্রতি একশত মনে বাইশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্য্য করিয়া জমিদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জমিদারগণ তাহাদিগকে সমস্ত বৎসর বেতন না দিয়া, ছয় মাসের বেতন দিতেন ও অন্য ছয়মাসের জন্য বিনা খাজনায় অথবা অন্য কোনরূপ সুবিধাজনক সর্ত্তে কৃষি-কার্য্যোপযোগী জমী ভোগ করিতে দিতেন। মলঙ্গীরা কার্ত্তিক হইতে জৈষ্ঠ্য মাস পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত করিত, তৎপরে বর্ষা আরম্ভ হইলেই স্ব স্ব চাকরাণ জমীতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিত। এইরূপে তাহারা বারমাসই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিত। নবাবী আমলে মেদিনীপুর জেলায় ন্যূনাধিক চার হাজার খালাড়ী ছিল। প্রতি এক শত মণ লবণ তখন প্রায় ষাট টাকা মূল্যে মহাজন দিগকে বিক্রয় করা হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত থাকিত তাহা জমীদার ও সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের লভ্য ছিল। * সে সময় প্রধান লবণ ব্যবসায়ী "ফকর-উল-তজ্জব" (ব্যবসায়ীদের গৌরব) বা "মালীক-উল্-তজ্জব" (ব্যবসায়ীদের রাজা) উপাধি লাভ করিতেন। এই কারবার তৎকালে কিরূপ সম্মান ও লাভজনক ছিল তাহা ঐ দুইটি উপাধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান অধি-কারের শেষ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে ঐ রূপ বন্দোবস্তেই কার্য্য চলিয়াছিল। †

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্ম-

* Fifth Report—Firminger, Vol. II. 365-372.

† Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. III.(Midnapore).

চারিগণ বঙ্গের তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এদেশের লবণ, তামাক ও গুপারীর বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রচার করেন। * "মহারাজা নন্দকুমার" প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই নিয়মানুসারে কার্য্যারম্ভ হইবামাত্র দেশের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রজার হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেশীয় প্রজাগণের আর কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। ক্লাইব ও তাঁহার কাউন্সীলের সভ্যগণ কলিকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েসণ নামে একটি বণিক্ সভা সংস্থাপন করিলেন। কোম্পানীর প্রায় সমুদয় ইংরেজ কর্ম্মচারী বণিক সভার সভ্য হইলেন। নিয়ম হইল যে, দেশের মধ্যে যত লবণ উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় প্রথমতঃ দেশীয় লোকদিগকে বণিক সভার নিকট প্রতি এক শত মণ ৭৫৲ মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। পরে বণিক সভা উহা পাঁচশত টাকা মূল্যে দেশীয় মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করিবেন। দেশীয় মহাজনগণ আবার তাহার উপর নির্দ্দিষ্ট লাভ রাখিয়া জনসাধারণের নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারিবে। দেশীয় মহাজনগণ দেশীয় লোকের নিকট হইতে একায়িক এই সকল পণ্য দ্রব্য কখনও কিনিতে পারিবে না। †

কোম্পানীর লবণ ব্যবসায়।

এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার পর এ প্রদেশের লবণ নির্ম্মাতা ও লবণ মহালের জমীদারগণের নামে নবাবের পরওয়ানা বাহির হইল যে, তাহাদিগকে কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিক সভার নিকট এই মর্ম্মে মুচলৃকা দিতে হইবে, যে যত লবণ প্রস্তুত করিবে তৎসমুদয় ইংরাজ

---

* Bolts on India Affairs, pp. 166—168.

† মহারাজা নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন—পৃঃ ৩৪-৪১।

বণিক সভার নিকট বিক্রয় করিতে হইবে; তাহাদের নিকট ভিন্ন কাহারও নিকট কিছুমাত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদি মুচল্‌কা না দিয়া কেহ লবণ প্রস্তুত করে বা ঐরূপ মুচল্‌কা দিতে বিলম্ব করে তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইবে। ঐ সময় হিজলীর অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার জমিদার রাজা লক্ষীনারায়ণ চৌধুরীর উপর যে পরওয়ানা জারি হইয়াছিল এবং মাজনামুঠার জমিদার রাজা যাদবরাম রায় যে মুচল্‌কা দিয়াছিলেন পাদটীকায় তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। * এই বন্দোবস্তের পরে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের "মহারাজা নন্দকুমার" গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

---

* *Purwannah issued to the Gomasta of Lukminarain Chowdry of the Pergunnah of Jalla mutha.*

"Be it understood, that a request has been made by the Governor and the gentlemen of the Committee and Council, to this purpose, that until the contracts for salt of the said gentlemen are settled, no salt shall be made, or got ready in any District; that a Gomasta be sent to attend on the said gentlemen, and having given a bond, he may then proceed to his business, and make salt; but till the bond be given to the Governor and the gentlemen of the Committee and Council, they should make none. Therefore, this order is written, that you send without delay, your Gomasta to the said gentlemen in Calcutta, and give your bond, and settle your business; and then proceed to the making of salt. In case of any delay, it will not be for your good."

Mutchalka of Jadabram Chowdry of the Pergunnah of Dorodomnan; —"I Jadubram Chowdry of the Pergunnah of Deroodumna, in the District of Ingelee; agreeably to an order which has issued from the Nawab to this purpose, 'that I should attend upon the Gentlemen of the Committee and Council inorder to settle my

লর্ড ক্লাইবের প্রতিষ্ঠিত বণিক-সভার কার্য্য প্রণালী এবং লবণের এক-চেটিয়া অধিকার স্থাপনের নিয়মাবলী বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পৌঁছিলে তাঁহারা উহা অনুমোদন করিলেন না; পরন্তু লবণের একচেটিয়া অধিকার একবারে রহিত করিবার নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাই-লেন। কিন্তু তাহাদের বারংবার লেখা সত্বেও যখন কলিকাতার গবর্ণর এবং কাউন্সিল উহা কিছুতেই রহিত করিতেছেন না দেখিলেন, তখন তাঁহারা পাঁচ টাকা হারে লবণ বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক মণ দুই টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। * বণিক-সভা অতঃপর সেই মূল্যই ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন এবং লবণের এক চেটিয়া অধিকারের ও নিয়মাবলীর অনেক সংসোধন করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে

---

trade in salt and that I should not deal with any other person' do accordingly oblige myself, and give this writing, that, except the said gentlemen called :—"The English Society of Merchants for buying and selling all the Salt, Bettle-nut and Tobacco in the Provinces of Bengal, Behar and Orissa &c.,' I will on no account trade with any other person for the salt to be made in the year 1173; and without their order I will not otherwise make away with, or dispose of a single grain of salt; but whatever salt shall be made within the dependencies of my Zemindary, I will faithfully deliver it all, without delay, to the said society, and I will receive the money according to the agreement which I shall make in writing, and I will deliver the whole and entire quantity of the salt produced, and, without the leave of the said committee, I will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the sarcar of the said society a penalty of five Rupees per every maund."

' Bolts on India Affairs—pp. 176-177.

* মহারাজা নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন—পৃঃ ২৮৪।

গবর্ণর হেষ্টিংস্ সাহেব আবার রূপান্তরে সেই একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপন করিলেন। ক্লাইবের সংস্থাপিত নিয়মানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক যে বণিক-সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই বণিকসভাই লবণের বাণিজ্যের মূলধনী ছিল। কিন্তু হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেই মূলধনী করিয়া বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে লবণ মহালের ইজারদারদিগকে কোম্পানীর নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হইত। পরে তাহাদিগকে সমুদয় লবণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কখনও ঐ বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না বলিয়াও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। *

ঐ সময় কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজারা লইয়াছিল। কমল ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর ইজারদার ছিল। তৎপূর্ব্বে কাসেম আলী খাঁ (১৭৬৫—১৭৬৭), জইন আলাউদ্দীন (১৭৬৭—১৭৬৯), দৌলত সিংহ ১৭৬৯—১৭৭০), ও লুসিংটন সাহেব (১৭৭০—১৭৭১) হিজলীর ইজারদার ছিলেন এবং তাহার পরে পঞ্চানন দত্ত (১৭৭৭—১৭৭৮) ও রাজা যাদবরাম রায় (১৭৭৮—১৭৮০) ইজারদার হইয়াছিলেন। কমল উদ্দীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মহারাজা নন্দকুমারের জালের মোকদ্দমায় এই কমল উদ্দীনই প্রধান সাক্ষী ছিল। তাহার মিথ্যা সাক্ষ্যেই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ ফাঁসীকাষ্ঠে দোদুল্যমান হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন।

লবণ-মহালের ইজারদার।

কমল উদ্দীনের পিতার নাম রুস্তম। মহারাজা নন্দকুমারের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় ছিল। কমল উদ্দীনও বাল্যকালে মহারাজার দ্বারা

* মহারাজা নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন—পৃঃ ২৮২।

প্রতিপালিত ও নানাপ্রকারে সম্মানিত ও অর্থদ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার চরিত্র চিরকালই অতি ঘৃণিত ছিল। সেই জন্য সে ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহার প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই। হিজলীর ইজারদারী পাইয়া সে মলঙ্গীদের উপরেও নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। একবার কতকগুলি মলঙ্গী তাহার অত্যাচারে বিব্রত হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতা কাউন্সিলে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। ঐ ব্যাপারে হেষ্টিংসের আশ্রিত খ্যাতনামা কান্ত বাবুও লিপ্ত থাকায় কমল উদ্দীন সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। লবণের মহালের মধ্যে তৎকালে হিজলীর মহাল লাভজনক ছিল। এইরূপ প্রকাশ যে, রেগুলেটিং আইন বিধিবদ্ধ হইলে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যরূপে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কান্তবাবু কমল উদ্দীনের বেনামীতেই হিজলীর ইজারা লইয়াছিলেন। * কেহ কেহ একথা স্বীকার করেন না। † কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব জজ বেভারিজ সাহেব প্রথমতঃ কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রিকায় "নিম্ন বঙ্গে হেষ্টিংস্" (Hastings in Lower Bengal) প্রবন্ধে এবং পরে "নন্দকুমারের বিচার" নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রকাশ্যভাবে কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজারদার থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কান্ত বাবুই ইহার মালিক ছিলেন। ‡ হিজলীর অন্যতম লবণ ইজারদার রাজা যাদবরাম রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বনামখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। "জমিদার

---

* মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, পৃঃ ৪০১

† Story of Nundcomar by Sir James Stephen, Vol I. p. 79.

‡ Trial of Maharaja Nand kumar, pp. 134-38.

বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁহার বিস্তারিত জীবনী আলোচিত হইবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর লবণ মহালের ইজারা তাঁহার হস্তে ছিল। তিনিই হিজলীর শেষ লবণ ইজারদার।

সণ্ট ডিপার্টমেণ্ট বা নিমক-বিভাগ।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ‘সণ্ট ডিপার্টমেণ্ট’ নামে একটি নিমক-বিভাগ প্রতিষ্টিত করেন। এতদ্বারা জমিদারদিগকে তাঁহাদের জমিদারির মধ্যে লবণ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাদিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট ‘মালিকানা’ দিবার বন্দোবস্ত হয়। এতদ্ব্যতীত লবণ প্রস্তুত কার্য্যে তাঁহারা কোম্পানীর সাহায্য করিবেন বলিয়া উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাঁহাদিগকে একটি মাসাহারা দিবার ব্যবস্থাও হয়। প্রতি বৎসরই ঐ মাসাহারার পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকায় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে একটি বাৎসরিক জমা ধার্য্য করিয়া কোম্পানী জমিদারদিগের নিকট হইতে সমস্ত খালাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কোম্পানীর দিয়ত খালাড়ী খাজানা জমিদারদিগের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হয়। *

নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিজলী ও তমলুকে “সণ্ট এজেণ্ট” উপাধিধারী দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সণ্ট এজেণ্টদিগকে লবণ ব্যবসায়ের তত্বাবধারণ ব্যতীত তত্তৎ স্থানের সামান্য সামান্য ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদিও পরিচালনা করিতে হইত। টমাস কালভার্ট সাহেব ও আর্কডেকন সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের প্রথম সণ্ট এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময় নিমক মহালের কার্য্যে হিজলী প্রদেশে

---

* District Gazetteer—Midnapore—pp. 128, 137-38.

বহু সংখ্যক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী ও গুণশালী শিক্ষিত দেশীয় কর্ম্মচারীর সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের স্বর্গীয় লালমোহন, রাধামোহন, গোপীমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিও এখানকার কার্য্যালয়ে সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা বিশেষ ধনলাভ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সল্ট্ ডিপার্টমেণ্টের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে বিডন সাহেব (Sir Cicil Beadon K. C. S. I.) যখন বঙ্গের ছোট লাট সেই সময় সরকার বাহাদুর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে বিলাতী লবণের (Liverpool salt) প্রচুর আমদানী হইতে থাকায় সরকারের লবণ কারবারের ক্ষতি হইতে ছিল; এই জন্য সরকার লবণ কারবার উঠাইয়া দেন। * ডনিথর্ণ সাহেব ও কর্লিক সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমলুকের শেষ সল্ট্ এজেণ্ট। সরকার বাহাদুর লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলে দেশীয় লোকে সরকারকে লবণ-কর প্রদান করিয়া কিছুদিন এই কারবার চালাইয়াছিল; কিন্তু বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া অগত্যা উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। সরকার বাহাদুরও আইন করিয়া লবণ কারবার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। এদেশ হইতে লবণ কারবার উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশের অধিবাসিদের শ্রীসৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতাও অনেকাংশে

---

* Buckland's Bengal under the Lieutenant Governors, Vol. I., p. 286-87.

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। * গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সে সময় ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত সমস্ত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে বাৎসরিক যত লবণ উৎপন্ন হইত তাহার এক তৃতিয়াংশের অধিক লবণ হিজলী প্রদেশ হইতেই পাওয়া যাইত। † কিন্তু সেদিন আর নাই!

জালপাই-মহাল।

জালপাই জঙ্গলের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উড়িয়া ভাষায় 'পাই' শব্দ 'জন্য' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'জাল' শব্দ 'জ্বলন' শব্দের অপভ্রংশ। জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য উক্ত জঙ্গলগুলি রক্ষা করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাদের 'জালপাই জঙ্গল' নাম হইয়া থাকিবে। সরকার বাহাদুর লবণ কারবার ছাড়িয়া দিলে উক্ত জঙ্গলগুলি দেশীয় লোকদের সহিত খাজানা ধার্য্য করিয়া বন্দোবস্ত করা হয়। তাহারা ঐ সকল জঙ্গল পরিষ্কার করতঃ উহাদিগকে আবাদের উপযোগী করে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১ আইন অনুসারে জালপাই জমী সমূহ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইলেও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লবণ কারবার উঠিয়া যাইবার পর হইতে এখনও পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর জমিদারদিগকে পূর্ব্ববৎ খালাড়ী খাজানা দিয়া আসিতেছেন। মহামান্য সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের সহিত জলামুঠা জমিদারীর মালিক স্বর্গীয়া রাণী আনন্দময়ী দেবীর মোকদ্দমায় বিলাতের প্রিভী কাউন্সিল যে রায় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ইংরাজ সরকার খালাড়ী খাজানা বলিয়া যাহা দিয়া থাকেন তাহাকে

---

* "The Collector states that the abolition of the Government salt monopoly has seriously affected the natural prosperity of the inhabitants of Hijli, who formerly lived by the manufacture."
Statistic l Account of Pengal Vol, III.

† Fifth Report—Firminger—Vol. II, p. 364.

প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্বের ছাড় বলা যাইতে পারে। সুতরাং যতদিন গবর্ণমেণ্ট এই খাজনা বা রাজস্বের ছাড় দিতে থাকিবেন ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত জমী তাঁহাদের ইচ্ছামত অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। * গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত জমীকে ভিন্ন ভিন্ন মহালে বিভক্ত করিয়া রাজস্ব হিসাবে উহাদের এক একটি পৃথক তৌজী নম্বর দিয়াছেন। এই জেলায় ঐরূপ ১৮৭টি মহাল আছে এবং উহাদের মোট পরিমাণ ফল ১২০ বর্গ মাইল। † "জমী-জমা ও রাজস্ব সম্পর্কিত বিবরণ" অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

রাজস্ব-বিভাগ।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা বর্দ্ধমানে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে কোম্পানী তত্তৎস্থানে 'রেসিডেণ্ট' নামধারী এক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বিচার, শাসন ও রাজস্ব তিন বিভাগেরই কর্ত্তা ছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহাদের হস্তে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৈন্য পরিচালনার ভারও ন্যস্ত ছিল। ‡ তদনুসারে ইদানীন্তন কালের মেদিনীপুর জেলার যে অংশ তৎকালে চাকলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল তাহা মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টের এবং যে অংশ চাকলা বর্দ্ধমানের অন্তর্ভূক্ত ছিল তাহা বর্দ্ধমানের রেসিডেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আইসে। জনষ্টোন সাহেব ও হে সাহেব যথাক্রমে মেদিনীপুরের ও বর্দ্ধমানের প্রথম রেসিডেণ্ট।

---

* Indian Law Reports, 8 Calcutta, 95.

† District Gazetteer—Midnapore—pp. 137-138.

‡ H. Verelst's View of the English Government in Bengal (1772), pp. 70-74.

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর হিজলী প্রদেশও কোম্পানীর হস্তগত হয়। কিন্তু তৎকালে উক্ত প্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ঐ সকল স্থান মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের নায়েব দেওয়ানের অধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা পূর্ব্ববৎ যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই চলিতে থাকে; এই বন্দোবস্তে কার্য্যের নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে থাকায় কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক চাকলায় বা জেলায় 'সুপারভাইজার' নামে এক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন।* তাঁহারা কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের রাজস্ব সমিতির (Council of Revenue at Murshidabad) অধীনে কার্য্য করিতেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যরূপে এতদ্দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কে বাঙ্গালার গবর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংসের সময় সুপার-ভাইজারগণ কালেক্টর নামে অভিহিত হন এবং তাঁহাদের সহকারীরূপে দেওয়ান নামে এক একজন দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। † সেকালের সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায় যে, সে সময় হিজলী প্রদেশ হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল এবং বর্ত্তমান বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ (জলেশ্বর অঞ্চল) ও চাকলা মেদিনীপুর লইয়া মেদিনীপুর কালেক্টরী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টই কালেক্টারের কার্য্য করিতেন। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের রেসিডেণ্টের তখনও কালেক্টর নাম হয় নাই।

---

* Proceedings of the Select Committee, dated 16th August 1769.

† Regulations Passed on the 14th May 1772, Paras 6 and 7.

রাজস্ব কমিটীর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখের আদেশ অনুসারে তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি নিমক মহালগুলি সমেত সমস্ত হিজলী প্রদেশকে হুগলী জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি নূতন কালেক্টারী গঠন করা হয় এবং ঐ বৎসরেই কমিটির ২৩শে নভেম্বরের অধিবেশনে স্থির হয় যে, কালেক্টরদিগের দ্বারা রাজস্ব আদায় কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে না, অতএব অন্য বন্দোবস্ত করা হউক। তদনুসারে কালেক্টারী পদ উঠাইয়া দিয়া জেলাগুলিকে রাজস্ব সমিতির (Provincial Council of Revenue) অধীন করা হয়। সমস্ত বঙ্গদেশ তৎকালে পাঁচটী প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি জেলা ছিল। তৎকালে হিজলী কলিকাতা বিভাগের এবং মেদিনীপুর বৰ্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্ভূত হয়।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কালেক্টারী পদের সৃষ্টি হয় এবং জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইহার পর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক রাজস্ব সমিতি পাঁচটি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কার্য্যভার 'কলিকাতা রাজস্ব সমিতি' নামে একটি নূতন গঠিত সমিতি গ্রহণ করেন। * ঐ সমিতিই পরবর্ত্তিকালে রূপান্তরিত হইয়া বোর্ড অব রেভিনিউ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। † ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে আরও কয়েকটি নূতন কালেক্টারী গঠিত হইয়াছিল। সেকালের কাগজপত্রে উহার উল্লেখ আছে। সে সময় বৰ্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ লইয়া (বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার

* Proceedings of the Committee of Revenue dated 20th February 1781, pp. 3-11.

† Proceedings of the Governor General (Revenue), 16th June 1786.

উত্তরাংশে অবস্থিত বগড়ী প্রভৃতি পরগণার ও বাঁকুড়া জেলার কিয়দংশ) বগড়ী কালেক্টরী এবং মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কয়েকটি পরগণাকে লইয়া জলেশ্বর কালেক্টরী গঠিত হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আবার ঐ দুইটি কালেক্টরী উঠিয়া যায়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশসালা বন্দোবস্তের পর বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের পুনরায় অনেক পরিবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে এ প্রদেশের নিমক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন উল্লেখ যোগ্য। হিজলী কালেক্টরীর অন্তর্গত তমলুক ও হিজলীতে দুইটি নিমক-বিভাগ ছিল। দুই স্থানে সল্ট্ এজেণ্ট নামে দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকিতেন। ঐ সময় হিজলীর কালেক্টরী পদ উঠাইয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত সল্ট এজেণ্টদ্বয়ের হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভারও দেওয়া হয়। এই ভাবে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিয়াছিল; তৎপরে কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের কালেক্টরের হস্তে ঐ প্রদেশেরও ভার অর্পণ করা হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে হিজলীর রাজস্ব-বিভাগ পুনরায় হুগলীর কালেক্টরের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হয়। পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সমস্ত হিজলী প্রদেশকে মেদিনীপুর জেলার ও মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণা (থানা গড়বেতা) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হইলে, উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা তৎকালে হুগলী

* Proceedings of the Board of Revenue, dated the 13th March, 1787.—Fifth Report—Firminger p. 734.

জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঐ দুইটি থানাকে মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তর্গত করা হইয়াছে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। সেই সময় হিজলী ও মেদিনীপুর দুইটি জেলা কটক বিভাগের কমিশনারের অধীনে ছিল। ষ্টক্‌ওয়েল সাহেব কটকের প্রথম কমিশনার। পরে হিজলী সমেত সমস্ত মেদিনীপুর জেলা বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে ডেপুটী কালেক্টর পদের সৃষ্টি হইলে এই জেলাতেও কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কালেক্টরের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরূপে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদি পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

বিচার ও শাসন বিভাগ।

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম অবস্থায় তাঁহারা রাজস্ব আদায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যাদির সংস্কারে তাদৃশ মনযোগ দিতে পারেন নাই। তৎকালে ঐ সকল কার্য্য পূর্ব্ববৎ নবাবী আমলের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই পুরাতন প্রথায় চলিতেছিল। বাঙ্গালার নাজিম বিচার-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু চাকলা মেদিনীপুরে ও চাকলা বর্দ্ধমানে অর্থাৎ বর্ত্তমান মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার যে যে অংশ নবাব মীর কাশেম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই দুই স্থানে, কোম্পানীর নিযুক্ত রেসিডেণ্টদিগের হস্তেই ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার ভারও অর্পিত ছিল। রেসিডেণ্টগণ একাধারে উক্ত প্রদেশের বিচার, শাসন, রাজস্ব-আদায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ত্তা ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৭৭২

খৃষ্টাব্দের ২১শে অগষ্টের রেগুলেশন অনুসারে, প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ফৌজদারী ও একটি করিয়া দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। ফৌজদারী আদালতে বিচারের ভার নবাবী আমলের কাজি-দিগের হস্তে-ন্যস্ত ছিল; কিন্তু জেলার কালেক্টরগণ তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে পারিতেন। বিচার কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক কাজির সঙ্গে একজন করিয়া হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক একজন করিয়া মুফ্‌তী থাকিতেন। ফৌজদারী আদালতের আপিলাদি মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত সদর নিজামৎ আদালতে গৃহীত হইত। দেওয়ানী আদালতের বিচার কালেক্টর করিতেন; দেওয়ান তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের আপিল শুনিবার জন্য ও বড় বড় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কালেক্টরী পদ উঠাইয়া দেওয়া হইলে, দেওয়ানী বিচারের ভারও আবার কিছুদিনের জন্য দেশীয় কর্ম্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখের রেগুলেশন অনুসারে বঙ্গদেশের মধ্যে পুনরায় তেরটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় এবং তত্তৎস্থানে জজ্‌ নামক এক একজন বিচারক নিযুক্ত হন। জজদিগকে কতকাংশে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করিতে হইত। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলাতেও একটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু হিজলীতে কোন দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় নাই; হিজলী, হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও কৃষ্ণনগর জেলা তৎকালে কলিকাতার দেওয়ানী আদালতের অন্তর্ভূত ছিল। সেরমন বার্ড মেদিনীপুরের প্রথম জজ্‌।

ইহার পর কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ

তারিখের আদেশানুসারে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন যে রেগুলেশন বিধিবদ্ধ হয়, তদ্দ্বারা দেওয়ানি আদালতগুলি উঠাইয়া দিয়া পৃথক জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ রহিত করা হয়। ঐ সময় জেলার কালেক্টরদিগকেই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতেন এবং ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিয়া আসামীকে পনর ঘা বেত বা পনরদিন পর্য্যন্ত কয়েদ দিতে পারিতেন) আসামীকে ধরিয়া আনিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হস্তে ছিল। পিয়ার্স সাহেব মেদিনীপুরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর। তৎপূর্ব্বে তিনি মেদিনীপুরের সুধু কালেক্টর ছিলেন। ঐ সময় বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ফৌজদারী আদালতেই হইত। পূর্ব্বোক্ত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর গুরু অপরাধের আসামীকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করিতেন। ফৌজদারী আদালতে তখনও কাজিগণ বিচার করিতেন এবং তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নাজিমের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলেন। পুরাতন কাগজ পত্রে দেখা যায়, সে সময় হিজলী ও মেদিনীপুর দুই জেলার কালেক্টরই জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুইটি জেলা লইয়া একটি ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার পুনরায় পরিবর্ত্তন হয়। ঐ বৎসরের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের রেগুলেশন অনুসারে ফৌজদারী আদালতগুলি তুলিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গালা দেশের কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয়। প্রত্যেক সার্কিট কোর্টের অধীনে কয়েকটি করিয়া জেলা ছিল। সার্কিট কোর্টের বিচারকগণ সময়ানুসারে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া তত্তৎস্থানের বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিয়া

বেড়াইতেন। প্রত্যেক সার্কিট কোর্টে দুইজন করিয়া ইংরাজ বিচার-পতি ও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একজন কাজি ও একজন মুফ্‌তি থাকিতেন। হিজলী ও মেদিনীপুর জেলার ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলি তৎকালে কলিকাতা বিভাগের সার্কিট কোর্টে বিচার হইত। সার্কিট কোর্টের বিচারকগণও নিজামৎ আদালতের অধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় নিজামৎ আদালত গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের সভ্যদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং উহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়া আনা হইয়াছিল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় রেগুলেশন অনুসারে বঙ্গদেশে পুনরায় পনরটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালেক্টর ও জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ আবার পৃথক করা হয়। কালেক্টরদিগের হস্তে কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার থাকে এবং বিচার ও শাসন বিভাগ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়। জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্য দেওয়ানী মোকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্য ফৌজদারী সার্কিট কোর্টের ন্যায় কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি প্রভিন্‌স্যাল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রভিন্‌স্যাল কোর্টে তিনজন জজ্‌ বসিয়া বিচার করিতেন। এই তিনটি কোর্টের উপর আবার কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সময় মেদিনীপুরেও একটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইয়াছিল এবং একজন পৃথক জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হিজলী জেলায় কোন পৃথক জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন নাই বা দেওয়ানী আদালতও স্থাপিত হয় নাই; হিজলী ও তমলুকের সল্ট এজেন্টদ্বয় সে কার্য্য যথাক্রমে ১৭৯৪ ও ১৭৯৬ সাল পর্য্যন্ত

চালাইয়াছিলেন। পরে সল্ট এজেণ্টদিগের হস্ত হইতে ঐ কার্য্যের ভার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মেদিনীপুরের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পণ করা হয়। তদবধি হিজলী প্রদেশের দেওয়ানী মোকদ্দমা ও ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমা মেদিনীপুরের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটেই হইতে থাকে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বগড়ী পরগণার রাজস্ব-বিভাগ বর্দ্ধমান জেলা হইতে বাহির করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই (১৭৯৫ খৃঃ অঃ) বগড়ীর (থানা গড়বেতা) দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য মেদিনীপুর জেলাতেই হইতেছিল। এইরূপে মেদিনীপুরের জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকায় তাঁহার কার্য্য লাঘব করিবার জন্য নেগুঁয়ায় (এগরা) একটি জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের কয়েকটি থানা লইয়া ঐ কার্য্যালয়টি স্থাপিত হয়। কুক সাহেব নেগুঁ-য়ার প্রথম জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট। চৌদ্দ পনর বৎসরমাত্র ঐ কার্য্যালয়টির অস্থিত্ব ছিল; পরে অস্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর জন্য এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখের হুকুম অনুসারে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক করা হয়। ঐ সময় মেদিনীপুরে ডিক সাহেব জজ্ এবং হেনরী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জজদিগের হস্তে জেলার সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা ও বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার-ভার অর্পিত হইয়াছিল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটগণ শাসন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ঐ সময়েই সার্কিট কোর্টগুলি উঠিয়া যায় এবং রেভিনিউ

কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। সে সময় কালেক্টর, জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সকলেই কমিশনারদের অধীন হইয়াছিলেন। কমিশনারগণ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদি ব্যতীত দাওরার মোকদ্দমাও করিতেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার রাজস্ব বিভাগ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ঐ সময় উক্ত দুই স্থানের দেওয়ানী বিভাগও মেদিনীপুরের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের ফৌজদারী কার্য্যাদি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই মেদিনীপুর জেলায় হইতেছিল; তৎপূর্ব্বে উহা হুগলী জেলায় হইত। হুগলী যাতায়াত অসুবিধাজনক ছিল বলিয়া উক্ত স্থানের অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে, ঐরূপ বন্দোবস্ত কর হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ দুইটি থানার যাবতীয় কার্য্য মেদিনীপুরে হইতেছে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ এক হইয়া গিয়াছে। একই ব্যক্তি এক্ষণে দুই কার্য্যই করিয়া থাকেন। কমিশনারগণ আর দাওরার মোকদ্দমা করেন না। জজেরা জেলার দেওয়ানী মোকদ্দমা ব্যতীত ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিষ্পত্য ফৌজদারী মোকদ্দমার আপিল ও দাওরার মোকদ্দমা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিষ্পত্য মোকদ্দমার আপীল হাইকোর্টে হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালৎ উঠাইয়া দিয়া কলিকাতায় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজপুরুষগণ।

মেদিনীপুরে এক্ষণে একজন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং একজন ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ আছেন। বিচার, শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বর্ত্তমানে এই জেলায় একজন অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনজন অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ্, একজন জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন য়্যাসিস্‌টেণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব পুলিশ, একজন অতিরিক্ত, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব পুলিশ, তিন জন সব্‌অর্ডিনেট জজ, তের জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, পনর জন মুন্সেফ, তের জন সব ডেপুটী কালেক্টর, ত্রিশ জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, পাঁচ জন ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অব পুলিশ ও কয়েক জন পুলিশ ইন্স্‌পেক্টার আছেন। এতদ্‌ভিন্ন চিকিৎসা বিভাগে একজন সিভিল সার্জ্জেনও চার জন য়্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জন, পূর্ত্ত বিভাগে একজন এক্‌জি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক জন ডিষ্ট্রীক্ট্‌ ইঞ্জিনিয়ার ও কয়েকজন য়্যাসিস্‌টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সব ইঞ্জিনিয়ার, আবগারী ও নিমক বিভাগে একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ও চার জন ইন্স্‌পেক্টার, রেজিষ্ট্রেশন্‌ বিভাগে একজন ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার ও পঁচিশ জন সব রেজিষ্ট্রার, শিক্ষা বিভাগে একজন ডেপুটী ইন্স্‌পেক্টার এবং কৃষি বিভাগে একজন ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসার আছেন।*

ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলায় একটি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও উহার অধীনে চারিটি মহকুমায় চারিটি লোক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতহিতৈষী রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন কর্ত্তৃক এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর এই বোর্ডগুলি স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য সংখ্যা এক্ষণে চব্বিশ। তন্মধ্যে সদর লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি পাঁচজন, কাঁথি লোক্যাল বোর্ডের তিনজন, এবং তমলুক ও ঘাটাল বোর্ডের দুইজন করিয়া চারজন। অবশিষ্ট বারজন গবর্ণমেণ্টের

* Quarterly Civil List, January 1921.

মনোনীত সরকারী ও বে-সরকারী সভ্য। এতদিন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু বিগত ১৯২০ সাল হইতে মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বে-সরকারী চেয়ারম্যান মনোনীত করিবার অধিকার পাইয়াছে। মেদিনীপুরের সুসন্তান মাননীয় ডাক্তার সুরাওয়ার্দ্দী (Hon'ble Dr. Abdulla Al-mamun Surhawardy D. Lit., P. H. D , L. L. D., Bar-at-law) মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রথম বে সরকারী চেয়ারম্যান।

কিঞ্চিৎ অধিক দেড়শত বৎসর হইল এদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ের প্রায় প্রথম পঞ্চাশ বৎসর তাহাদিগকে দেশের নানা প্রকার অশান্তি নিবারণ করিতে যুদ্ধাদি করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ঐ কারণেও বটে আর সে সময় তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। পরে তাহারা সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া মেদিনীপুরবাসী এক্ষণে যে সামাজিক, রাজনৈতিক বা আর্থিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার সূচনা একপ্রকার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হইয়াছে। এই সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গবর্ণার জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য বঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান জেলার রাজপুরুষগণকে চল্লিশটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুরের তদানীন্তন উদার হৃদয় জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্ট্রেচী (H. Strachey) সাহেব উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন

শত বর্ষ পূর্ব্বে মেদিনীপুর।

ফার্মিন্‌জার সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থে উহার সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। * আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে উহার কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; ইহা হইতে তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অনেকটা জানা যাইবে। স্থানাভাব বশতঃ ও বাহুল্য ভয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর বা উত্তরগুলির সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হইল না।

স্কুল-কলেজ।

"প্রশ্ন :—আপনার অধিকারভুক্ত প্রদেশের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগের আইনের জ্ঞান কিরূপ? তথায় হিন্দু বা মহম্মদীয় আইন শিক্ষা দিবার জন্য কোন স্কুল বা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা আছে কি?

উত্তর :—এই জেলার লোকের আইন-জ্ঞান বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগের ন্যায়ই নিতান্ত সীমাবদ্ধ। কয়েক জন সরকারী কর্ম্মচারী বা কর্ম্মের উমেদার ও উকীল ব্যতীত আইনের খবর বড় একটা কেহ রাখে না, রাখিবার আবশ্যকতাও বোধ করে না। আইন শিক্ষা দিবার জন্য দেশের মধ্যে কোন স্কুল নাই বা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থাও নাই। তবে সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটি স্কুল আছে। স্কুলের মাসিক বেতন এক আনা কি দুই আনা মাত্র। যাহারা ঐ সকল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন তাহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা ঐ কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও সমাজে তাহাদের কোন সম্মান নাই; সমাজে তাহারা

* "The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company" edited by the Ven. W. K. Firminger M. A., B. D, B. Lit., Archdeacon of Calcutta, Vol. II. pp. 590—619.

সাধারণ ভৃত্যবর্গের অল্প উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্কুলের কার্য্য দিনের বেলাতেই হয়। মুক্ত আকাশের তলে কিম্বা কোন অচ্ছাদনের নিম্নে বসিয়া ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা ঐ সকল স্কুলে পড়ে না, গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পারসী ও আরবী ভাষা মৌলবীগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক মৌলবী নিজ বাড়ীতে বিনা মূল্যে আহার ও বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। মেদিনীপুরে একটি মুসলমান কলেজ আছে, সেখানে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। কিন্তু সেখানেও মহম্মদীয় আইন শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই।"

আইন-আদালত।

"প্রশ্ন :—মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য আদালতে সরকারের প্রাপ্য দাখিল, উকীলের পারিশ্রমিক দান, সাক্ষীর খরচ প্রদান ইত্যাদি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে কি? আর এই সকল খরচ অত্যন্ত বেশী হইতেছে বলিয়া আপনার মনে হয় কি?

উত্তর :—উপরোক্ত কারণে মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়াই আমার মনে হয়। লোকে যাহাতে কষ্টভোগ না করিয়া অল্প খরচে ন্যায় বিচার পাইতে পারে, দরিদ্র ব্যক্তি প্রবলের হস্তে উৎপীড়িত হইলে যাহাতে বিনা হায়রাণে ও কম খরচে মোকদ্দমা চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। উপরন্তু একটা খরচের বোঝা চাপাইয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির দুঃখের ভার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া রাজ সরকারের উচিত নয়। এই কারণে দেখা যায়, দরিদ্র প্রজা ক্ষমতাশালী মালিকের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও প্রায় আদলতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসে না।

আর যাহারা আসিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশকে আদালতের নানাপ্রকার খরচের দায়ে জিনিস পত্র বন্ধক দিয়া পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। আদালতের মধ্যেই এরূপ দৃশ্য নিত্য দেখা যায়। বিচারাসনে বসিয়া যাহাদিগকে এরূপ দৃশ্য দেখিতে হয়, তাহাদের নিকট উহা যেমন প্রীতিকর নহে, রাজ সরকারের পক্ষেও উহা তেমন গৌরব-জনক নহে।"

"প্রশ্ন ঃ—আপনার আদালতে যে সকল উকীল আছেন তাঁহারা কি মক্কেলের কার্য্য বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাসের সহিত করিয়া থাকেন ?

উত্তর ঃ—এখানকার উকীলেরা প্রায় সকলেই বিশেষ উপযুক্ত। তাঁহারা সাধারণতঃ বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত মক্কেলের কার্য্য করিয়া থাকেন। কোন সময়ে তাঁহাদের কাহারও কাহারও কার্য্যে কর্ত্তব্য অবহেলার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও, কাহাকে কখনও মক্কেলের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে দেখা যায় নাই।"

"প্রশ্ন ঃ- আপনার এজলাসের মধ্যে বিচারকের, অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীর, বাদী, প্রতিবাদীর বা তাহাদের উকিল ও সাক্ষীদের জন্য কোন পৃথক স্থান বা বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট আছে কি এবং আদালতের কার্য্য যে সময় আরম্ভ হয় বা চলিতে থাকে সে সময় কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন কি ?

উত্তর ঃ—এজলাসের মধ্যে বিচারকই কেবল চেয়ারে বসিয়া থাকেন; আর যদি কখনও মৌলবী উপস্থিত হ'ন তাঁহাকেও একখানি চেয়ার দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সকলেই দাঁড়াইয়া থাকে। তবে এজলাসের সংলগ্ন অন্য যে সকল গৃহ আছে সেখানে মাদুর বা কার্পেটের বিছানার উপর বসিয়া সকলে সচ্ছন্দে গল্প-গুজব করিয়া থাকে, হুকাও চলে। আদা-লতে অন্য কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা নাই; কেবল বিচারক

আদালতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং আসামী লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে। ইহাই এ দেশের পুরাতন প্রথা, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, নূতন প্রবর্ত্তিত নহে। আদালতের কার্য্য যখন চলিতে থাকে, তখন কেবল নিস্তব্ধতা রক্ষা করা ব্যতীত আমি আর অন্য কোন আদব-কায়দার ব্যবস্থা করি নাই।"

"প্রশ্ন :—দেশের দুষ্ট লোকদিগের অত্যাচার-অনাচার নিবারণের জন্য কোন নূতন নিয়ম বা আইন প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক বলিয়া আপনি মনে করেন কি ?

উত্তর :—আমি এ কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও সেই মতই পোষণ করি যে, আমরা এ দেশের প্রজাসাধারণকে দস্যু তস্করের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। অদূর ভবিষ্যতেও যে পারিব তাহার সম্ভাবনাও অল্পই আছে। এমতাবস্থায় ন্যায়, মনুষ্যত্ব ও রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের কর্ত্তব্য যে, আবশ্যক হইলে দেশবাসীকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একত্রিত হইবার অধিকার প্রদান করা। আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব সুযোগ দেওয়া উচিত। ঐ সকল অত্যাচার-অনাচার নিবারণের জন্য দেশের পুলিশের সংস্কার করাও আবশ্যক।* পুলিশ যদি

* "It is, my opinion, as I once before had occasion to mention to Government, that the procuring assistance of the men of property and influence in preserving the peace throughout the country, would lead to a system of Police the most efficient, the most economical, the most suitable to the habits and opinions of the people, and in all respects, the best calculated for their comfort and security."—Fifth Report. Vol, II. p. 609.

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে অত্যাচার ও অনাচার সহজেই নিবারিত হইবে।”

“প্রশ্ন ঃ—আপনার জেলার আনুমানিক লোক-সংখ্যা কত? তন্মধ্যে হিন্দুর ও মুসলমানের সংখ্যা কিরূপ?

লোক-সংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা।

উত্তর ঃ—আমার গণনা মতে মেদিনীপুর জেলার লোক-সংখ্যা প্রায় পনর লক্ষ। ইহার ছয়ভাগ হিন্দু, একভাগ মুসলমান।”

“প্রশ্ন ঃ—লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তার, ইমারত নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আপনার জেলা ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার কারণ আপান কি নির্দ্দেশ করেন?

উত্তর ঃ—এই জেলার লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই জন্য আবাদ-যোগ্য জঙ্গল ও অন্যান্য পতিত ভূমিগুলি ক্রমশঃ কর্ষিত হওয়ায় দেশের কৃষিকার্য্যও বিস্তার লাভ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও অবনতি হয় নাই বলা যাইতে পারে। তবে দেশীয় তন্তুবায়দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। নিজেদের বাসের জন্য বা দেশহিতকর ধর্ম্ম কার্য্যের উদ্দেশ্যে তেমন কোন বৃহৎ অট্টালিকাদি মেদিনীপুরে নির্ম্মিত হয় নাই। কয়েকটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। এ দেশের লোকের নিকট ইহা অত্যন্ত পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আমারও মনে হয়, ইহার মধ্যে স্থাপত্যের কোন নিদর্শন না থাকিলেও সাধারণ হিতকর যে সকল কার্য্য আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। কিন্তু দেশের বড়লোক-দিগের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্যান্য কারণে ওরূপ কার্য্য এখন আর বড় একটা হইতেছে না। এই জেলায় সেকালের প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ অনেক সুবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়।

এ দেশের অধিকাংশ লোকেই অল্পতেই বেশ সন্তুষ্ট থাকে। কোন প্রকারে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থাটা সামান্য রকমে করিয়া ফেলিতে পারিলে,আর তাহারা তদতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে চাহে না বা অর্থ সঞ্চয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না। একজন রায়ত বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া ষোল বিঘা জমি অক্লেশে আবাদ করে এবং উহা হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধাংশের দ্বারা খাজানাদি দিয়া অপর অর্দ্ধাংশে চার পাঁচ জনের এক বৎসরের খরচ এক রকমে চালাইয়া দেয়। ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট। তাহারা ইহার অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা বোধ করে না। যাহারা দৈনিক মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও যদি দু'একটি টাকা একবারে পাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা খরচ না হওয়া পর্য্যন্ত আর কাজে বাহির হয় না। এই কারণে দেখা যায়, যাহারা মজুর খাটাইয়া থাকেন তাহারা প্রায়ই উহাদের প্রাপ্য বাকী রাখিয়া দেন ; তাহা না হইলে উহাদিগকে সময়ে পাওয়া যাইবে না। কোন কারণে দেশে শস্যহানী ঘটিলে এ দেশের অল্প লোকেই মজুরী বা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়, অবশিষ্ট সকলের ভিক্ষাই তখন একমাত্র অবলম্বন। এ দেশের লোকের নিকট ভিক্ষা দানও বিশেষ পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত।"

নৈতিক চরিত্র।

"প্রশ্ন ঃ—আপনার জেলার লোকের নৈতিক চরিত্র সাধারণতঃ কিরূপ? ব্রটীশ আইন কানন দেশে প্রচলিত হইবার পর হইতে তাহাদের চরিত্রের কিছু উন্নতি বা অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে কি?

উত্তর ঃ—আমাদের প্রবর্ত্তিত আইন কানন দেশে প্রচলিত হইবার পর হইতে এ দেশের লোকের চরিত্রের উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে

তাহা বলা সহজ নহে। অত্যাচার, জুলুম, নৃশংসতা প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা কম হইলেও, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মদ্যপান, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি অপকার্য্য এই জেলায় বেশী না থাকিলেও ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, এই জেলার বেশীর ভাগ লোকেই পূর্ব্বকালের সরলতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব তাহাদের জীবনে বিশেষ-রূপে পরিদৃশ্যমান। পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলির অধিবাসীদিগের সহিত তুলনায় এই জেলার লোকে বিবাদ বিসম্বাদ বা বিরক্তিকর কার্য্য কমই করিয়া থাকে। মামলা-মোকদ্দমা করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কম। তবে আজকাল দেখা যায় যে, কাহারও কাহারও মধ্যে আদালতের দুর্নীতিগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে।"

মদ্য পান।

"প্রশ্ন :—নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া মদ্যের উপর কর ধার্য্য হইবার পর হইতে মদ্যপায়ীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে কি ?

উত্তর :—মদ্যপায়ীর সংখ্যা কম না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু কর ধার্য্য হইবার ফলেই যে এরূপ হইয়াছে, তাহা নহে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। এ দেশের উচ্চ জাতির মধ্যে মদ্যপান এখনও অত্যন্ত হীন কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অল্পসংখ্যক ভদ্রলোক যাহারা উহাতে আসক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যতদুর সম্ভব গোপনেই উহা পান করিয়া থাকেন। দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোকের মধ্যে এই পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহারা ক্রমশঃই অধিকতর চরিত্রহীন ও ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত এরূপ আরও অনেক কারণ আছে, যে জন্য আমার মনে হয় যে, যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে মদ্য বিক্রয় বা প্রস্তুত সম্পূর্ণরূপে রহিত

করিয়া দেওয়া উচিত। মদ্যপান করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকের স্বাস্থ্য একবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এদেশের জলবায়ুর গুণে উহার দ্বারা কোন উপকারই পাওয়া যায় না; অধিকন্তু যাহারা উহা পান করে তাহারা পূর্ণমাত্রাতেই পান করে এবং কচিৎ তাহা ত্যাগ করিতে পারে।

তবে এই প্রসঙ্গে মদ্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও একটি কথা বলিবার আছে। মদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক চাউলের আবশ্যক হয়; যে জিনিসের আবশ্যকতা বেশী সেই জিনিস বেশী পরিমাণ উৎপন্ন করিতেও হয়। দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য অধিক পরিমাণ চাউল উৎপন্ন করা আবশ্যক। কোন সময়ে দুর্ভিক্ষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সে সময়ের জন্য মদ্য প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই চাউলের দ্বারা দেশের অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে। লোকের জীবনধারণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে সে সময় পুতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পানীয়তে পরিণত না করিয়া উহার দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি চাউলের দ্বারা মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রথা একেবারে রহিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত চাউলের অভাব কমিয়া গেলে উহার উৎপন্নের পরিমাণও হ্রাস হইয়া গিয়া দেশের দারিদ্রতা বৃদ্ধি করিতে পারে।"

জেলার সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

"প্রশ্ন ঃ—আপনার জেলার মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম কি? তাঁহাদের অনুচরদিগের সংখ্যা কত এবং তাহারা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত থাকে কি?

উত্তর ঃ—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই জেলার সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী অধিবাসী। স্বীয় স্বীয় কাজ কর্ম্ম পরিচালন

করিবার জন্য তাঁহাদের দশ বার জন করিয়া পিয়ন ও জমিদারীর শান্তি রক্ষা করিবার জন্য কাহারও কাহারও কতকগুলি করিয়া পাইক ব্যতীত সেরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত অনুচর কাহারও নাই। ঐ সকল পাইকও এক্ষণে ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে।

(১) দর্পনারায়ণ রায়, মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কানুনগো। (২) চন্দ্রশেখর ঘোষ, তালুকদার ও জজ-কালেক্টর পিয়ার্স সাহেবের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান। (৩) লক্ষ্মীশ্বর সৎপথী, তালুকদার। (৪) কানাই পোদ্দার, ব্যবসায়ী, সহর মেদিনীপুর। (৫) চৈতন্য পোদ্দার, ব্যবসায়ী, সহর মেদিনীপুর। (৬) দর্পনারায়ণ বসু, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণভূম। (৭) কিষণ সিং, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণভূম। (৮) আনন্দলাল রায়, জমিদার, মেদিনীপুর ও নাড়াজোল। (৯) কৃষ্ণবল্লভ রায়, জমিদার, নারায়ণগড়। (১০) রঘুনাথ চৌধুরী, জমিদার, অমর্শী। (১১) আনন্দ নারায়ণ রায়, জমিদার, তমলুক। (১২) রাণী জানকী, জমিদার, মহিষাদল। (১৩) নরনারায়ণ রায়, জমিদার, হিজলী। (১৫) গোপালইন্দ্র রায়, জমিদার, সুজামুঠা। (১৫) বীরপ্রসাদ চৌধুরী, জমিদার, খড়্গপুর ও বলরামপুর। (১৬) জগন্নাথ ধল; জমিদার, ঘাটশীলা। (১৭) লছমীনারায়ণ, জমিদার, ছাতনা। (১৮) বৈদ্যনাথ চৌধুরী, জমিদার ও ব্যবসায়ী, খড়্গপুর।"

"প্রশ্ন :—আপনার জেলার লোকেরা গৃহে অস্ত্র শস্ত্র রাখে কিনা? সে সকল কিরূপ অস্ত্র এবং তাহা কি কার্য্যের জন্য রাখা হয়?

অস্ত্র-শস্ত্র ও দুর্গ।

উত্তর :—জঙ্গল-মহাল ব্যতীত এদেশের অন্যান্য স্থানের লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র বড় একটা তাহাদের গৃহে রাখে না। আমার মনে হয়, যদি তাহারা উহা রাখিত, ভালই করিত। জঙ্গলের পাইকদিগের তীর-ধনুক, তলওয়ার ও বর্শা প্রভৃতি আছে।"

"প্রশ্ন ঃ—আপনার জেলায় ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গাদি আছে কি না এবং থাকিলে সেগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে?

উত্তর ঃ—এই জেলায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত অনেকগুলি দুর্গ আছে। সেগুলি বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু দু'একটি ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকলগুলিই এক্ষণে ধ্বংসের পথে। এক সময় অশ্বারোহী মারহাট্টা সৈন্যের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য উহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। সম্প্রতি বগড়ীর জঙ্গল-মহালের একটি পুরাতন দুর্গ হইতে কুড়িটি কামান মেদিনীপুর সহরে আনা হইয়াছে।"

কোম্পানীর রাজত্বে প্রজার ধন-সম্পত্তি।

"প্রশ্ন ঃ—আপনি কি মনে করেন যে, আপনার জেলার লোকেরা বর্ত্তমান রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের ধন-সম্পত্তি নিরাপদ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে?

উত্তর ঃ—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, এদেশের লোকের বিশ্বাস, সরকারের কর্ম্ম-চারিগণের মনে ন্যায় বিচার করিবার বা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার একটা শুভ ইচ্ছা আছে; কিন্তু সকল সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁহারা উহা করিয়া উঠিতে পারেন না। যেমন চুয়াড় বা ডাকাতদের অত্যাচার হইতে জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তিনি কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারিতেছেন না। পরন্তু প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা রায়তদের স্বত্বও যে বিশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমার মনে হয় না। জমিদারদিগের এখনও বিশ্বাস যে, তাঁহাদের প্রদত্ত রাজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। লাখেরাজদারগণও আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের ভূমির উপরও একদিন না একদিন জমা ধার্য্য হইবেই; ব্যবসায়িগণও ধারণা

করিয়া রাখিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে তাঁহাদের উপরেও নূতন নূতন কর ধার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশ্বাস, সরকার বাহাদূর প্রজা সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার মানসে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা করেন, উহার মূলে তাঁহাদের একটা কিছু স্বার্থ প্রচ্ছন্ন থাকেই। তবে সরকার বাহাদূর যে তাহাদিগকে কোন দিন তাহাদের সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিবেন না বা ভয়ানক রকমের ক্ষতিকর কোন একটা বিধি-ব্যবস্থাও করিবেন না, এটাও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে।

মহাজন ব্যতীত এদেশের অন্য যে সকল লোকের নগদ টাকা কড়ি আছে, তাহারা উহা সুদের কারবারে নিয়োজিত করে না বা উহাতে কোম্পানীর কাগজাদিও কিনে না। তাহাদের অধিকাংশ লোকেই টাকা কড়ি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি মাটীর নীচে পুতিয়া রাখে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে যে তাহারা এরূপ করে তাহা নহে; দস্যু তস্করের জন্যই এরূপ করা হইয়া থাকে। কোম্পানীর অধিকারের পূর্ব্বেও তাহারা এরূপ করিত এবং এখনও করে।”

গবর্ণমেণ্টের উপর সাধারণের বিশ্বাস।

“প্রশ্ন ঃ—আপনার কি বিশ্বাস যে, আপনার জেলার লোকেরা মোটের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে সন্তুষ্ট আছে?

উত্তর ঃ—তাহাদের অসন্তোষের কোন নিদর্শন আমি পাই নাই। পুরাতন রাজ সরকারের বিধি-ব্যবস্থার সহিত ব্রিটীশ রাজ-সরকারের বিধি-ব্যবস্থার তুলনা করিলে, বরং তাহাদের সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। কারণ ইহার দ্বারা বিদেশীয় শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা পাইয়াছে এবং দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ নিম্নশ্রেণীর অসংখ্য লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকের অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ

করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয়, সে উচ্চ শ্রেণীর লোক। কিন্তু মেদিনীপুরের কেহ সেরূপ অসন্তোষের ভাব মনে পোষণ করে বলিয়া আমি মনে করি না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দেশের লোকের উদ্দ্যম ও সাহসের অভাব এবং তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতাই আমাদের গবর্ণমেণ্টকে শক্তিমান করিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানীর কর্ম্মচারিদের উপর এদেশের লোকের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তাহারা জানে, তাহাদের উপর নূতন কর যাহা ধার্য্য করা হয় বা যাহা কিছুই করা হয়, তাহা একটা আইন করিয়াই করা হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত তাহারা আর কিছু জানে না।"

"প্রশ্ন ঃ—আপনার জেলার মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন যাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর সন্তুষ্ট নহেন? দেশের মধ্যে ঐ সকল লোকের প্রতিপত্তি কিরূপ এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারে?

উত্তর ঃ—এইরূপ শ্রেণীর কোন বিশেষ লোকের নাম আমি দিতে পারিব না। এই জেলার প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকজন জমিদার মারহাট্টাদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আছেন। ঐ সকল জমিদারের পক্ষে মারহাট্টা রাজত্ব কামনা করা সম্ভবপর হইতে পারে। জঙ্গল মহালের জমিদারগণ আইন-জ্ঞানহীন, অত্যাচারী ও কলহপ্রিয় হইলেও তাহাদিগকে রাজ-সরকার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশের ভিতরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট যদি কেহ থাকেন, আমার অনুমান, তাঁহারা হচ্ছেন ধ্বংস প্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ। সাধারণতঃ তাঁহারা সহরেই বাস করেন। তবে এই জেলায় এবং দেশের সকল স্থানেই নিম্নশ্রেণীর এরূপ কতকগুলি লোক আছে যাহারা রাজভক্তি বা রাজদ্রোহিতা দুইটার কোনটারই কোন ধার ধারে

না; তাহারা দেশীয় বা বিদেশীয় যখন যাহার অর্থে প্রতিপালিত হয় তখন তাহারই অনুরক্ত থাকে। এইজন্য তাহারা যে গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট আছে, একথা বলা যায় না। দেশাচার এবং অবস্থার হীনতাই তাহাদিগকে এরূপ করিয়াছে। ঐ সকল লোক সাধারণতঃ পাইকের কার্য্য করে।”

উপাধি-বিতরণ প্রথা।

“প্রশ্ন ঃ—আপনি কি মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি এ দেশের লোককে নূতন নূতন উপাধি বিতরণ করিয়া বা অন্য কোনরূপে সম্মানিত করেন, তাহা হইলে রাজ-সরকারের সহিত প্রজাবর্গের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে?

উত্তর ঃ—আমার বিশ্বাস, খাঁটী ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে এ দেশে কোন বিধি-ব্যবস্থা চালাইতে গেলে তাহা ব্যর্থ হইবে; লোকে তাহা বুঝিবে না। রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করিবার কথা এ দেশের লোক স্বপ্নেও ভাবে না। আমার অনুমান, রাজ-সরকার যদি তাহাদের উপর ভয়ানক রকমের কোন একটা অত্যাচারও করেন, তাহাতেও এই জেলার অধিবাসীরা কোন রূপ বাধা প্রদান করিবে না বা রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য কোন প্রকার জনতা বা আলোচনা পর্য্যন্ত করিবে না। সুতরাং ‘গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি’ এই কথাটা তাহাদের নিকট বোধগম্যই নহে।

উপাধি বিতরণের দ্বারা বা অন্য কোনরূপে দেশীয় লোকদিগকে সম্মানিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কিন্তু উহা কি করিয়া কার্য্যকরি করা যাইতে পারে তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞানের সঙ্গে এদেশের লোকের আত্মসম্মান জ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। ইউরোপে রাজা প্রজার মধ্যে অবস্থার বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরের ভাবের একটা

সামঞ্জস্য আছে। উভয়ের দোষগুণ একই প্রকারের এবং উভয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা একই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানকার লোকে জানে যে, আমাদের সঙ্গে তাহাদের মনের মিল হইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে আমাদের ভাবেরও কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। তাহারা এরূপ শত সহস্র নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে যে, সেখানে পৌঁছাইয়া তাহাদের সংস্রবে আসা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এরূপ অবস্থায়, যদি আমরা তাহাদের সংস্রবেই আসিতে না পারিলাম তাহা হইলে তাহাদের যোগ্যতার বিষয় কি করিরা জানিতে পারিব? আর তাহা না পারিলে কাহাকেই বা উপাধিতে ভূষিত করিব? অন্যপক্ষে, দেশের মধ্যে এমন কোন শ্রেণীর লোকও নাই যাহাদের মধ্যস্থতায় এ কার্য্য হইতে পারে। জেলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার যিনি, তিনি এদিকে ভয়ানক গর্ব্বিত লোক হইলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন সাহেবের সামান্য একজন চাকরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করিতে অস্বীকৃত নহেন। এরূপ ঘটনা নিত্য দেখা যায় এবং তাহা দেখিয়া দুঃখিতও হই, কিন্তু উপায় নাই।

বর্ত্তমানকালে মহাজনেরাই এদেশের অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্তু তাহারা হালের বড় মানুষ। তাহারা উপাধি লইয়া কি করিবে? তাহাদিগকে উপাধি দেওয়ার অর্থ দেশের লোকের নিকট তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ করা। আমরা এক্ষণে যাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছি, সেই সকল মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ আর হিন্দু-জমিদারগণই দেশের প্রকৃত বড়লোক ছিলেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীরই এখন অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য আর যে এক শ্রেণীর লোক এদেশে আছে তাহারা আমাদেরই কর্ম্মচারী বা ভৃত্যবর্গ। তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়া কি হইবে?

সৈনিক শ্রেণীর মধ্য হইতে কাহাকেও সম্মানিত করা চলে না। কারণ এদেশের লোক সুবাদারের উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে পারিবে না এবং আমি যতদূর জানি, তাহাদিগকে তাহার অধিক অধিকার না দেওয়াই উদ্দেশ্য। অধিকন্তু ইউরোপীয়ানদিগের নিকট কিরূপ হীন হইয়া থাকা উচিত তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদেরও উপাধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মৌলভী ও উকীল প্রভৃতিকে উপাধি প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু এদেশের লোকের নিকট ঐরূপ শূন্য উপাধির কোন মূল্য নাই। উপাধির সঙ্গে জায়গীর দান অথবা সৈন্য পরিচালনার অধিকার প্রদান প্রাচ্য দেশের প্রচলিত প্রথা। আমার মতে, দেশীয় লোকের মধ্যে উপাধি বিতরণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, উপাধির সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর অথবা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।"

সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী ষ্ট্রেচী সাহেবের লিখিত উপরোদ্ধৃত বিবরণ হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অনেকটা বুঝা যায়। ইহার পর শতবর্ষ মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার ফলে এদেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, শিক্ষা, সমাজ, চরিত্র, মনুষ্যত্ব প্রভৃতিতে এদেশবাসী কোন্‌স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

উনবিংশ শতাব্দী।

এই শত বর্ষই উনবিংশ শতাব্দী। মানবেতিহাসের স্মরণীয় শতাব্দী। এই শতাব্দী যে সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়া

দেখা দিয়াছে তাহা অনেক প্রকারেই ব্যাপক ও সুদূর বিস্তৃত। এই প্রবাহ ও প্রভাব সমগ্র মানবজাতির ভিতর একটা নূতন তত্ত্ব, নূতন সমস্যা, নূতন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। সেই সকলের মীমাংসা করাই এবং তাহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই বিংশ শতাব্দীর কার্য্য।

সাধারণ হিসাবে ১৮০১ সালে ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ এবং ১৯০০ সালে ঐ শতাব্দীর শেষ। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ১৮০১ বা ১৯০০ সালের কোন বিশেষত্ব নাই। দিন আসে, দিন যায়, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, সবগুলিরই কি মূল্য থাকে? সবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? যে দিন, যে মাস, যে বৎসর কোন একটা বিশেষ চিন্তাপ্রবাহ বা কোনরূপ প্রভাব লইয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, সেই দিনই একটা দিনের মত দিন, সেই মাসই একটা মাস, সেই বৎসরই একটা স্মরণীয় বর্ষ। সেই মুহূর্ত্ত বা সেইক্ষণ হইতে আমরা দিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়া থাকি। মানবজাতির ইতিহাসে ১৮১৫ ও ১৯১৪ এই দুইটি সাল ঐরূপ দুইটি স্মরণীয় বর্ষ। মানবজাতির ইতিহাসের ঊনবিংশ শতাব্দী ঐ ১৮১৫ সালে আরম্ভ ও ১৯১৪ সালে শেষ। যেদিন ওয়াটালু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়, যেদিন ভিয়ানা নগরের কংগ্রেসে ইউরোপের মানচিত্রে নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় সীমার নির্দ্দেশ, সেই দিন প্রাচীনের অবসান, নবীনের অভ্যুদয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ। আর যেদিন জার্ম্মেনী তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, ইউরোপের বিরুদ্ধে, একপ্রকার সমগ্র সভ্য জগতের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামিয়া সমস্ত পৃথিবীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সেই দিনই ঐ শতাব্দীর শেষ।

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্তৃতি, শিল্পকারখানার আধিপত্যলাভ, ব্যবসায়

বাণিজ্যে বিপ্লব সাধন, কর্ম্মজগতে প্রকৃতি পুঞ্জের স্বায়ত্ত শাসন, ইংলণ্ডের বিশ্বসাম্রাজ্য, ভারতবাসীর অধীনতা এই সকলের উদ্বোধন করিয়া ১৮১৫ সাল মানবজগতে দেখা দিয়াছিল। ১৮১৫ সালে যেদিন ইউরোপে ইংলণ্ডের আধিপত্য ঘোষিত হইল, তাহারই কিছুকাল মধ্যে ভারতখণ্ডে মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক হইল। এইরূপে ইংরাজজাতির বিশ্বসাম্রাজ্য গঠিত হইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করিল। ১৮১৫ সালের ঘটনা এসিয়া ও ইউরোপের সুদৃঢ় মিলন-ব্যাপারের প্রথম ঘটনা। প্রাচ্য জগতে ও পাশ্চাত্য জগতে ভাববিনিময়, কর্ম্ম-বিনিময় ও আদর্শ-বিনিময়—এই দিন হইতে নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। তারপর নব নব চিন্তার আবির্ভাব, বিপ্লববাদ ও সাম্যবাদের প্রবর্ত্তন, ধর্ম্মে নাস্তিকতা, পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, সাহিত্যে ভাবুকতা, জার্ম্মান্ ও আমেরিকান্ দর্শনবাদে বেদান্তের ক্ষীণ আলোক বিস্তার, শিল্প জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জার্ম্মান-সাম্রাজ্য গঠন, ফরাসী-বিপ্লব, ইতালীর স্বাধীনতা, তুরস্কের ওষ্ঠাগত প্রাণতা, রুশিয়ার বিস্তার, আমেরিকার গৃহবিবাদান্তে বিশ্ববিজয়লিপ্সা, নব্যাভ্যুদয়প্রাপ্ত-জাতিপুঞ্জের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতা, সকল জাতিরই প্রাচ্যজগতে ভোগ স্বত্বাধিকারের প্রবল প্রয়াস, এসিয়ায় ও আফ্রিকায় বৃহত্তর জার্ম্মেনী, বৃহত্তর ইতালী, বৃহত্তর আমেরিকা ও বৃহত্তর রুশিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্যম—এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা পাশ্চাত্য জগতের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। (৪)

প্রাচ্যকে গ্রাস করিবার জন্য, প্রাচীন জগতের আদর্শ, সভ্যতা, শিল্প ও সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য, পুরাতনের প্রভাব অভিভূত

(৪) বিশ্বশক্তি—পৃঃ ২৫২—২৫৪।

করিবার জন্য, ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিগ্বিজয়ের পতাকা দান করিয়াছিল। ইহার পর ইউরোপীয় মানব 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করিয়া মত্ত ঐরাবতের ন্যায়—জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু ১৮১৫ সালই মানবজাতির একমাত্র বর্ষ নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীই তাহার সভ্যতা-প্রবাহের একমাত্র যুগ নয়। আবহমানকাল হইতে, যুগ যুগান্ত হইতে কত শতাব্দী আসিয়াছে, কত শতাব্দী গিয়াছে, কত যুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে তাহার সংখ্যা ত কেহ করে নাই, তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই। ১৮১৫ সালের মানব এরূপ দূরদৃষ্টি লইয়া ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাই সে ১৯১৪ সালের এক অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, স্বপ্নাতীত, চিন্তার বহির্ভূত ঘটনায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে! এই খানেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ, বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ। এক নূতন যুগের সূচনা। সে যুগের ইতিহাস ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ লিখিবেন, আমরা এই অধ্যায় এইখানে শেষ করিলাম।

দশম অধ্যায়।

প্রাচীন কীর্ত্তি ও কাহিনী।

মেদিনীপুর জেলায় কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আছে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা সেইগুলির ও আধুনিক কয়েকটি কীর্ত্তির যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। সাধারণতঃ ঐ কীর্ত্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) মন্দির ও মসজিদ, (২) দুর্গ বা গড়, (৩) সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও (৪) প্রস্তরমূর্ত্তি। মেদিনীপুরের ইতিকথার সহিত উহাদের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জেলার নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন কীর্ত্তিরাশীর ঐ সকল ধ্বংশাবশেষ দর্শন করিলে হৃদয়মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি মিশ্রিত অননুভূতপূর্ব্ব এক অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। স্মৃতির সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহৃত হইতে থাকে। মনে হয়, ঐ সকল বিদীর্ণ মন্দিরের কক্ষে কক্ষে, জীর্ণ দুর্গের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, পুষ্করিণীর সোপানে সোপানে অতীত কালের এক মহান্ আনন্দোজ্জ্বল বাণিজ্য বিলাস সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রদেশের কত অলিখিত ইতিহাস, কত অকথিত কাহিনী অলক্ষিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কীর্ত্তি ও কাহিনী।

মনে হয়, একদিন ঐ সকল দেবালয়ের অভ্যন্তর হইতে কত শত ভক্তের অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা আকাশ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইয়াছে! ঐ সকল দুর্গ প্রাঙ্গণ বিজয়গর্ব্বোৎফুল্ল কত শত সৈনিকের
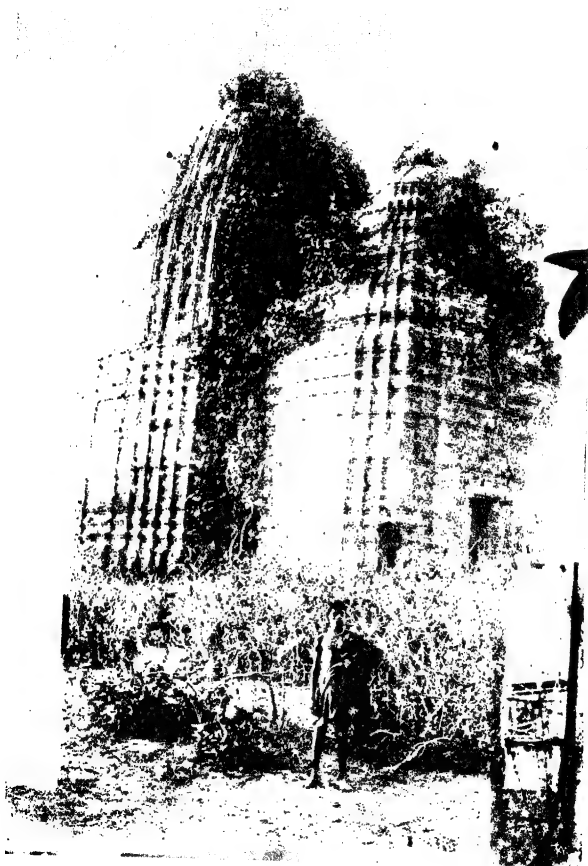
বাহিরীর প্রাচীন মন্দির

আনন্দোচ্ছ্বাসে একদিন মুখরিত হইয়াছে! ঐ সকল সরসীর সোপান-মালা লীলাললিতগামিনী কত শত কুলবালার অলক্তলাঞ্ছিত চরণের মধুর মঞ্জীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে! কত রাজা, মহারাজা, কত জ্ঞানী, গুণী, কর্ম্মী একদিন ঐ প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির চরণতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—কৃতার্থ হইয়াছেন! আর আজ সেই গগনস্পর্শী মন্দির-গুলি, সে কারুকার্য্য বহুল অট্টালিকা সমূহ ধরণীর ধূলাতে পরিণত হইয়াছে! সে বনদেবীর দর্পণের মত অনাবিল, নীল, শীতল, স্বচ্ছ, বিশাল দীর্ঘিকাগুলির খগুনীলিমাতুল্য জলরাশি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! সে সুন্দর নয়নাভিরাম প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির অঙ্গে ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও মুখ ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে! মন্দিরে এখন আর দেবতা নাই। দুর্গগুলি এখন বন্যজন্তুর বাসভূমি। দীর্ঘিকাগুলি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি মুক্ত প্রাঙ্গণে অথবা বৃক্ষমূলে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

মেদিনীপুরের বৈভব সমূহ নির্ম্মম কালের প্রভাবে এইরূপে স্মৃতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও মেদিনীপুরের বিজন পল্লী ও নদী সৈকত অর্দ্ধ-দগ্ধ অস্থি খণ্ডের ন্যায় এখনও দু' চারিটা কীর্ত্তি যাহা বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে উহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির এবং কর্ণগড়ের কীর্ত্তিরাশি তৎকালীন ভাস্কর ও স্থপতিদিগের কর্ম্মকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। গড়বেতা, গগনেশ্বর, নয়াগ্রাম প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর দুর্গগুলি দেখিলে মনে হয় না যে, সে গুলি আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তি। দাঁতনের শরশঙ্কা দীঘি এখনও বঙ্গদেশে অতুলনীয়। বগড়ীর কৃষ্ণরায়জীউর, কেশিয়াড়ীর সর্ব্বমঙ্গলার, খেলাড়ের অশ্বারূঢ় যুগলমূর্ত্তির ও দোরো

পরগণার মাধবমূর্ত্তি তিনটির গঠন প্রণালী দেখিলে মোহিত হইতে হয়। ঐ সকল স্মৃতি চিহ্নই মেদিনীপুরের পূর্ব্ব গরিমার ভস্মস্তূপ!

উপাখ্যান বহুল বাঙ্গালাদেশে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত কোন না কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের এই সকল কীর্ত্তির সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। তন্মধ্যে কতকগুলি ঐতিহাসিক, কতকগুলি পৌরাণিক ও কতকগুলি নানা প্রকার অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ। সে সমুদায় বংশ পরম্পরানুগত অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহা সামান্য অনুসন্ধিৎসার সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে উহাদের কোন স্থান নাই। তবে ভবিষ্যতে যদি কেহ এই সকল পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনীর মধ্য হইতেও কোন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন সেইজন্য ও পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এ স্থানে সে কাহিনী-গুলিও উল্লিখিত হইল।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন কীর্ত্তি ও কাহিনীর উল্লেখ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের কথা বলিতে হয়। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, "তমলুক বাঙ্গালীর বিলুপ্ত মহিমার মহাপীঠ।" * তাম্রলিপ্ত বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে।

তমলুকের কপাল মোচন তীর্থ

পুরাকালে তাম্রলিপ্ত হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। এখনও উহা একটি সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম, পদ্ম, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি

---

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ। মানসী,—চৈত্র, ১৩২১, পৃঃ ১০১।

পুরাণে এবং বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার তনয় প্রজাপতিকে নিহত করিলে পর ব্রহ্মহত্যা বশতঃ দক্ষ শরীর বিশ্লিষ্ট মস্তক মহাদেবের পাণি সংস্পৃষ্ট হইয়া যায়। মহাদেব উহা কোন প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া উহা হইতে মুক্ত হইবার আশায় তীর্থ যাত্রায় নিরত হন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেও দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্তচ্যুত না হওয়ায় তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু বলেন ঃ—

"অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্যা ক্ষণামুক্ত পাপাড্গো ভবিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ যেখানে গমন করিলে জীব অল্পকাল মধ্যে পাপ মুক্ত হয় এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, আপনাকে সে স্থানের কথা বলিব। এই বলিয়া তিনি বলিতেছেন ঃ—

"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যাং মহাপুরী
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতঃ গূঢ়ং তীর্থং বরংবসেৎ।
তত্রো স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থ রাজস্য দর্শনার্থং মহাশয় ॥"

অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাপুরীতে গূঢ় তীর্থ আছে। সেখানে স্নান করিলে লোকে বৈকুণ্ঠে গমন করে। অতএব আপনি তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমন করুন।

মহাদেব ইহা শ্রবণ মাত্র তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর কথিত সরসী নীরে অবগাহন করিলে দক্ষ শির তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। সেই অবধি সেই ক্ষুদ্র সরোবরটি "কপালমোচন" নামে অভিহিত হইতে থাকে এবং তাম্রলিপ্ত একটি প্রধান তীর্থস্থানে পরিগণিত হয়। অনেক

গ্রন্থেই তাম্রলিপ্তের ঐ কপালমোচন সরোবরটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুকাল হইতে উহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। কাল-সহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোত প্রবাহে উপর্য্যুক্ত স্থানটি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও প্রতিবর্ষে বারুণী স্নান উপলক্ষে বহু সংখক নরনারী উক্ত স্থানটির সন্ধান করিতে না পারিয়া বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের পাদদেশস্থ নদ সলিলে অবগাহনাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। তমলুকে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তী, মাঘীপূর্ণিমা, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মেলা হয় এবং ঐ উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

শ্বেতাম্বর জৈনদিগের একখানি প্রাচীন প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ভগবতী সূত্রে একটি বৃত্তান্ত আছে ঃ—

তমলুকের মোরিয় বংশীয় গৃহপতি।

"ইহৈব জংবুদ্দীবে দ্দীবে ভরহে বাে। তামলিত্তী নামং নগরী হোত্থা তত্থণং তামলিত্তীএ নয়রীএ তামলী নামং মোরিয় পুত্তে গাহাবই হোত্থা।"

অর্থাৎ এই জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে তামলিত্তী নামক নগরী ছিল, সেই নগরে তামলী নামক মোরিয় বংশীয় গৃহপতি ছিল। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত মৌর্য্য শব্দের পালি ও প্রাকৃত আকার মোরিয়, এবং ময়ূর শব্দের পালি ও প্রাকৃত আকার মোর। বিষ্ণু পুরাণের টীকায় মৌর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখা হইয়াছে, মুরার অপত্য, অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য মুরা নাম্নী দাসীর পুত্র বলিয়া মৌর্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য যেই হউন, পালি মহাপরিনিব্বাণ সূত্রে দেখা যায়, পিপ্‌ফলিবন নামক স্থানে মোরিয় নামক ক্ষত্রিয়গণ ছিল. তাহারা শাক্যমুনির চিতাভস্মের এক হিস্বা পাইয়া তাহার উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভগবতী সূত্রের

তামলীর আখ্যায়িকা সপ্রমাণ করে প্রাচীন তামলিপ্তী নগরীতেও মোরিয় বংশীয় গৃহস্থের বসবাস ছিল। এতদ্দেশের প্রচলিত একটি জনশ্রুতিও এই মত সমর্থন করে। জনশ্রুতিটী এই—ময়ূরধ্বজ নামক তমলুকের একজন রাজা ছিলেন। এই ময়ূরবংশীয় গরুড়ধ্বজ নামক একজন রাজা বর্গভীমা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাণে এবং মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য শূদ্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি মোরিয় বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যদি বৌদ্ধ মতই ঠিক হয় তবে পাটলীপুত্রের মৌর্য্য রাজবংশের সহিত তামলিপ্তীর 'মোরিয়-পুত্র'গণের সম্বন্ধও অনুমান করা যাইতে পারে।" *

বর্গভীমা দেবী।

তমলুকের বর্গভীমা দেবীর নামও অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। কাহার দ্বারা এবং কতদিন হইল যে ঐ মূর্ত্তিটি স্থাপিত হইয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না। বর্গভীমা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে এ প্রদেশে তিনটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। 'তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ' নামক গ্রন্থে আছে—"নরপতি তাম্রধ্বজের (কেহ কেহ বলেন গরুড়ধ্বজের।✝) নিয়োজিত ধীবর পত্নী প্রত্যহ রাজ সংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত। সে একদিন বন মধ্যস্থ একটি সংকীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল, দেখিল, পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ সলিল গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবনপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই

* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ। মানসী—চৈত্র, ১৩২৭, পৃষ্ঠা ১৪২।

✝ District Gazetteer—Midnapore, p. 322.

বার্ত্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। পরে তিনি একদিন ধীবরীর সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটি বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছেন। তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।”

কেহ কেহ বলেন যে, কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালভূঁঞা কর্ত্তৃক এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। তমলুকের রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'Statistical Account of Bengal' নামক গ্রন্থে আর একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ধনপতি বণিক্ বাণিজ্যার্থে সিংহল গমন কালীন্ তমলুকে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এইস্থানে অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তির হস্তে স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে সে ব্যক্তি বলে যে, নগর নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে একটি কুণ্ড আছে, তাহাতে পিত্তলের দ্রব্য ডুবাইতে স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে। তাহা শ্রবণ করিয়া ধনপতি ঐ স্থানের বাজারের সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই কুণ্ডের জলে ডুবাইলে সে গুলি স্বর্ণময় হইয়া যায়। তিনি সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া সিংহলে গমন করেন ও তথায় সে গুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। বাড়ী প্রত্যাগমন কালীন্ ধনপতি সেই স্থানে পুনরায় আসিয়া বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া যান।

বর্গভীমা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে এই সকল কিম্বদন্তীর আলোচনা করিয়া হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'Orissa' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পুরীতে জগন্নাথ দেবের প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে যেরূপ কাহিনী প্রচলিত

আছে ইহাও প্রায় সেই জাতীয়। প্রভেদের মধ্যে এই যে, জগন্নাথ দেব উড়িষ্যার জঙ্গল মধ্যে প্রকাশ হওয়ায় সে দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার-ব্যবহারানুসারে একরূপ গল্প রচনা করা হইয়াছে, আর তমলুক সমুদ্রকুলবর্ত্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের ভাব ও স্থানের অবস্থানুসারে এখানকার গল্প অন্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। জগন্নাথ দেব জঙ্গলের দেবতা ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে এক ব্যাধের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছিল, আর তমলুকের বর্গভীমা দেবীকে এক ধীবরী আবিষ্কার করিয়াছিল। জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি কাষ্ঠের এবং ভীমাদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রথমতঃ উভয়কে নীচ জাতীয় লোকে গোপনে পূজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নূতন আবিস্কৃত দেবতাদ্বয়কে দেখিবার জন্য যখন বহুদূর হইতে যাত্রী আসিতে লাগিল তখন ব্রাহ্মণগণও আপনাপন পুঁথি বাহির করিয়া নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি একখানি প্রস্তরে সম্মুখ ভাগ খোদিত করিয়া বাহির করা হইয়াছে। 'তমলুক ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, "এইরূপ প্রস্তরে কতকাংশ খোদিত মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা উগ্রতারা মূর্ত্তির অনুরূপ। ইহার ধ্যান ও পূজাদি যোগিনী-তন্ত্র এবং নীল-তন্ত্রানুসারে হইয়া থাকে।" রাজপ্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব হইতে ইহার সেবাদি নির্ব্বাহ হয়। বর্গভীমা বহুকাল হইতে এদেশে একটি জাগ্রত দেবী বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। কথিত আছে, দুরন্ত কালাপাহাড় যখন উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় অগণিত যবন সৈন্য সমভিব্যাহারে এ দেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনিও এই দেবীকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হ'ন এবং পারসী ভাষায় একখানি দলীল লিখিয়া দিয়া যান। সেই দলীল এখনও

দেবীর পূজকদিগের নিকট আছে। তাহারা উহাকে 'বাদ্‌সাহী-পঞ্জ' নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণও এই দেবীকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যে সময় হৃদয়হীন বর্গীসৈন্য নিম্নবঙ্গ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল, সে সময় তাহারাও তমলুকের কোন প্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক বরং ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করতঃ বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে দেবীকে ভূষিতা করিয়াছিলেন।

বর্গভীমা দেবী একান্ন পীঠের অন্তর্গত না হইলেও এখানেও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে (উত্তরে পায়রাটুঙ্গী খাল, পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণে শঙ্কর আড়া খাল, পশ্চিমে গড় মরিচা খাল।) দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, রটন্তী প্রভৃতি পূজা আবহমানকাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সেই কারণে এখনও কেহই উক্ত সীমার মধ্যে ঐ সকল পূজা করেন নাই। সকলেই বর্গভীমা দেবীর নিকটে আপনাপন পূজা দিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রতিমা করিয়া ঐ সকল পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত সীমার বাহিরে গিয়াই তাহা করিয়া থাকেন।

বর্গভীমা দেবীর মন্দিরটি তমলুকের একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। এই মন্দিরটির অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া সাধারণ লোকে উহাকে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকে। কত দিন হইল কাহার দ্বারা যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

বর্গভীমার মন্দির।

মন্দিরটির বাহিরের গঠনপ্রণালী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধবিহারের সদৃশ এবং অনেকাংশে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। * প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রধান বা মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমিত

---

* তমলুকের ইতিহাস—ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত—পৃঃ ১০৮-১০৯।

হয়, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল; সম্ভবতঃ প্রধান বিহারে বসিয়া আচার্য্য শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্মবিনিঃসৃত উপদেশ প্রদান করিতেন, আর ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারে শিষ্যগণ একা একা থাকিয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে বৌদ্ধদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া উহাকে দেব-মন্দিররূপে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। বর্গভীমার মন্দিরটির সঙ্গে চালুক্য বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত হারিতী দেবীর মন্দিরের কোন সম্বন্ধও আছে কিনা বলা যায় না।

বর্গভীমার মন্দিরটি একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থাপিত। যে স্থানে মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই স্থান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া ত্রিশ ফিট উচ্চ বুনিয়াদ করা হয়। এই বুনিয়াদের উপর নয় ফিট ভিত বিশিষ্ট তেহারা প্রাচীর প্রস্তুত পূর্ব্বক বাট ফিট উচ্চ করিয়া খিলানাকারে গোল ছাদ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যে, প্রথমে উহা একখানি প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর খণ্ড হইতে খুদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তৎপরে চতুর্দ্দিকে ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভিতরের প্রস্তর মন্দিরের শোভা অতি সুন্দর। খাঁজ করিয়া প্রস্তর খোদাই করা হইয়াছে বলিয়া শোভা আরও খুলিয়াছে। কোথাও জোড় আছে কিনা বোঝা যায় না।

মূল মন্দিরের ঠিক্ সম্মুখে যজ্ঞ মন্দির নামে আর একটি মন্দির আছে। সেটী পূর্ব্ব মন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত। কথিত আছে যে, একটি পতি পুত্রবিহীনা বৃদ্ধা সুতা প্রস্তুত

ব্যবসায় দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুইটি মন্দির একটি খিলান দ্বার সংযোজিত; সেই খিলানটি 'জগমোহন'নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদি হইবার জন্য 'নাট্যমন্দির' নামে ছাদ বিশিষ্ট একটি দালান আছে। উহারই সম্মুখে দেউড়ী ও নহবৎখানা। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পাকশালা ও অধিকারীদিগের থাকিবার গৃহাদি আছে এবং উত্তর দিকে একটি কুণ্ড বা পুষ্করিণী আছে। দেবীর বেদীর নিম্নে সোপানাবলীর ভিতরে ভূতনাথ ভৈরব আছেন।

তমলুকের নিকট পর্ব্বতাদি কিছুই নাই, আর তৎকালে এখনকার মত রেল ষ্টীমারের সুবিধাও ছিল না। এরূপ অবস্থায় বহুদূর হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া এরূপ সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করা তৎকালীন শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হাণ্টার সাহেব ইহার শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহাকে একটি অতি প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণও ঐ মতাবলম্বী।

তমলুকের জিষ্ণুহরি দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী যে, উহা নরনারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের যুগলমূর্ত্তি। তাম্রলিপ্তের প্রাচীন রাজা পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুনের তাম্রলিপ্তে আগমন ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাদের ঐ যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা ময়ূরধ্বজের সময়ে নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদের গর্ভস্থাৎ হওয়ায় প্রায় পাঁচ শত বৎসর হইল এক গোপাঙ্গনা জিষ্ণুহরির বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া

জিষ্ণুহরি মূর্ত্তি।

* Statistical Account of Bengal, Vol III. p. 65.

দিয়াছিলেন। জিষ্ণুহরির সেবা পূজার জন্য তমলুকের রাজারা যথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর বাসুদেব ঘোষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এই প্রদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হইলে বাসুদেব অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তমলুকে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া শোকের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করেন। কিছুদিন পরে তদীয় শিষ্য মাধবী দাসের হস্তে সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া তিনি তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন। তমলুক, ময়না, সুজামুঠা প্রভৃতি স্থানের ভূস্বামিগণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবাদির জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

খাট পুকুর।

তমলুকে 'খাটপুকুর' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ, রাজা তাম্রধ্বজ এই সরোবরটি খনন করাইয়া তন্মধ্যে মন্দির প্রস্তুত করতঃ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ বারিরাশি উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, ঐ মন্দিরের বর্ত্তমান চূড়াটি লোকের মনে এই সংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, এই পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা কালীন সাধারণের আচরিত বিল্বদণ্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা না করিয়া একটি মন্দির বা স্তম্ভ দ্বারা উহা সম্পন্ন করা হইয়াছিল। অনেক পুরাতন পুষ্করিণীতেই এইরূপ দেখা যায়।

'নেতা ধোপানীর পাট' বলিয়া একখানি প্রস্তরকে বহুকালাবধি

তমলুকের রজকেরা সংক্রান্তিদিবসে পূজাদি করিয়া আসিতেছে।

নেতা ধোপানীর পাট।

এইরূপ কিম্বদন্তী, চম্পাই নিবাসী চাঁদসদাগরের নববিবাহিতা পুত্রবধূ বেহুলা বিবাহ রজনীতে ফণীদংশনে মৃত্যু হওয়ায় মৃত পতির শবকে ভেলা সংযোগে অসংখ্য গ্রাম ও নদী পার হইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এখানে নেতা নাম্নী কোন রজকপত্নী দেবতাদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করিত; বণিক্ কামিনী তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারই সাহায্যে দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার পতি ও তদীয় অন্যান্য সহোদরগণকে পুনঃ-জীবিত করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু 'মনসার ভাষাণ' নামক পুস্তকে এই ঘটনা ত্রিবেণীর নিকটে কোন স্থানে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'নেতা ধোপানীর পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। আমাদের অনুমান, তমলুকের সহিত উক্ত ঘটনার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; তমলুকের নেতা ধোপানীর পাট খানি কেবল নেতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়।

লেপ্‌টেন্যাণ্ট ও'হারার সমাধি।

তমলুকের বর্ত্তমান সবডিভিজন্যাল্ আফিসের অনতিদূরে খাট পুকুরের পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালার ভলাণ্টিয়ার সৈন্যদলের লেপ্‌টেন্যাণ্ট ও'হারা সাহেবের (Lieutenant Alexander O' Hara of the 5th Battalion) একটি সমাধি স্তম্ভ আছে। কোম্পানীর আমলে উড়িষ্যা-বিজয় ও সাঁওতাল বিদ্রোহ নিবারণের জন্য কোম্পানীর সৈন্যসামন্তাদি কলিকাতা হইতে অর্ণবযানে তমলুকে পৌঁছিয়া লালদিঘী নামক পুষ্করিণীর নিকট দুই এক দিন ছাউনী করিয়া থাকিত। পরে তাহারা

স্থলপথে মেদিনীপুর দিয়া গন্তব্যস্থানে যাতায়াত করিত। ঐরূপ এক সৈন্যদল এস্থানে অবস্থান কালীন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর লেপ্‌টেন্যাণ্ট ও'হারার মৃত্যু হওয়ায় উক্ত স্থানে তাহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল। ২৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৌদ্ধযুগে তমলুকে রাজ্যের প্রধান সঙ্ঘারাম ছিল ; এতদ্ব্যতীত এই জেলার অন্তর্গত ময়না, দাঁতন ও বাহিরীতেও এক একটি সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া বোধ হয়। ময়নাগড়ে বৌদ্ধ নরপতি লাউসেনের রাজধানী ছিল। ময়নার নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবনচকে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তাঁহাকে অনেকে লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থাকেন। ময়নাগড় এখনও ধর্ম্মপূজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র ; বুদ্ধদেবই পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম্মনামে পূজা পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের উপর ধর্ম্মদেবের পৌরাণিক আখ্যান প্রতিষ্ঠিত, সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ময়নার ধর্ম্মঠাকুর।

ময়না রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গড়টি এ প্রদেশের একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। ঐ গড়টি এক সময় সুদৃঢ় ও দুরাক্রম্য ছিল। গড়টি বাহির গড় ও ভিতর গড় নামে দুই ভাগে বিভক্ত। ভিতর গড়ের পরিমাণ ফল ৫,৬২,৫০০ বর্গফিট। উহার চতুর্দ্দিকে যে পরিখাটি আছে তাহার প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য সাতশত ফিটেরও অধিক। ঐ পরিখাটির বাহিরেই বাহির-গড়। এই বাহির-গড়টিকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অন্য যে পরিখাটি আছে উহার প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য প্রায় চৌদ্দশত ফিট। উভয় পরিখাই প্রস্থে প্রায় দেড় শত ফিট এবং এখনও আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভিতরের পরিখাতে ৭।৮ হাত

ময়না-গড়।

এবং বাহিরের পরিখাতে ৪।৫ হাত জল থাকে। বাহির-গড়ের পশ্চিম ও অগ্নিকোণে প্রবেশ-দ্বার। ভিতর গড়ের চতুর্দ্দিকে প্রথম পরিখাটির পার্শ্ব দিয়া কাঁটা বাঁশের ঝাড় পরস্পর এরূপ নিরন্ধ্রভাবে সংলগ্ন ও জড়িত হইয়া রোপিত ছিল যে, উহার মধ্য দিয়া মানুষের যাতায়াত দূরের কথা, তীরও প্রবেশ করিতে পারিত না। পূর্ব্বে দুটিই পরিখা গভীর জলে এবং বহুসংখ্যক কুম্ভীরে পরিপূর্ণ থাকায় কাহারও উহা সন্তরণপূর্ব্বক পার হইবারও উপায় ছিল না। ভিতর গড়ে রাজা সপরিবারে বাস করিতেন এবং বাহির-গড়ে সৈন্য ও রাজকর্ম্ম-চারিগণ থাকিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবের সময় অনেকেই এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেন। কোম্পানীর প্রথম আমলের অনেক চিঠী পত্রে ময়নাগড়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহিষাদল-রাজবংশের কীর্ত্তি।

মহিষাদল থানার মধ্যে মহিষাদল রাজবংশের কয়েকটি কীর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে রাণী জানকীদেবীর প্রতিষ্ঠিত ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত মহিষাদলের নবরত্ন মন্দির, ১৭৮৮ সালে নির্ম্মিত রামবাগের রামজীউ মন্দির ও দেউলপোতা গ্রামের গোপীনাথের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিষাদলের সুবিখ্যাত সপ্তদশচূড়ক সমন্বিত বৃহৎ দারুময় রথটী রাজা মতিলালের কীর্ত্তি। মহিষাদলের এই রথোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় ও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। মহিষাদলের রাস-মণ্ডপ এবং সিংহবাহিনীদেবী ও দধিবামন নামক বিগ্রহ রাণী ইন্দ্রাণী দেবীর সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত রায়পাড়া গ্রামের মহাদেবের মন্দিরটিও

একটি প্রচীন কীর্ত্তি। এই মহাদেবের প্রকাশ সম্বন্ধেও নানাপ্রকার কিম্বদন্তী আছে। জনপ্রবাদ, এক সময়ে এই মন্দির পার্শ্বেই সমুদ্র ছিল। ধনপতি বণিক্ সিংহল যাইবার সময় এই পথেই গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থেই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় প্রায় ৭০।৮০ বৎসর হইল জয়নারায়ণ গিরি নামক স্থানীয় জনৈক ভূম্যধিকারী উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের মোহন্তের সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক মোহন্ত কর্ত্তৃক এই মহাদেবের সেবা পূজাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইঁহার অনেক ভূসম্পত্তি আছে। প্রতি বৎসর শিব-চতুর্দ্দশীর সময় এখানে একটি মেলা হয়; সে সময় এস্থলে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

নন্দীগ্রাম ও রায়পাড়ার মন্দির।

নন্দীগ্রামের জানকীনাথের সুবৃহৎ মন্দিরটি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহিষাদলের অন্যতম রাজা আনন্দলালের সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বোক্ত রাণী জানকীদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে অতিথি অভ্যাগতর আহারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বাশুলিচক গ্রামে হলদী নদীর তীরে বাশুলী দেবী নামে একটী প্রাচীন দেবীও আছেন।

দোরো পরগণার মন্দির ও মূর্ত্তি।

সুতাহাটা থানার দোরো পরগণায় মাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধব নামে তিনটি অতি প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত সুবৃহৎ মূর্ত্তিগুলির গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কত যুগ হইল মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, কালের কঠোর হস্ত উহাদের গাত্রে কত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে, তথাপি মূর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যেন শিল্পী সদ্যঃ সদ্যঃ উহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া গিয়াছেন। উহাদের প্রকাশ সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐ গুলি যে

বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেভোগের নবরত্ন ও দীর্ঘিকা মাজনামুঠার জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা যাদবরাম রায়ের পুত্রবধূ রাজা কুমারনারায়ণের পত্নী রাণী সুগন্ধা কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঘাটাল মহকুমার মধ্যে চন্দ্রকোণা বিশেষ প্রাচীন স্থান। হিন্দু-রাজত্বে ভানদেশের মধ্যে চন্দ্রকোণা একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ নগর ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যালেণ্টীনের মানচিত্রেও চন্দ্রকোণা (Sjandercona) শিলাবতী নদীর তীরবর্ত্তী একটি সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। হিন্দু রাজাদের অনেক কীর্ত্তিই এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, সে সময় চন্দ্রকোণা সহরে বাহান্নটি বাজার ছিল। কিন্তু এখন আর তাহার সে শ্রী সম্পদ নাই। চন্দ্রকোণার গৌরবচিহ্ন প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল কতকগুলি প্রস্তর-স্তূপ ও পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত দু'চারিটি মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া চন্দ্রকোণা আপনার অতীত-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণা সহর।

চন্দ্রকোণার রাজাদিগের দেবতা ও ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। তাহারা ঐ স্থানে অনেক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বাদশদ্বারী গড় নামে তাহাদের প্রাচীন দুর্গটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি যেস্থানে দৃষ্ট হয়, উহারই অনতিদূরে তাহা-দেরই প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজন্নাথ নামে দুইটি শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছেন। এইরূপ কিম্বদন্তী, মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় যখন প্রবল পরাক্রমে উড়িষ্যা বিজয় করিতে যাইতে-ছিলেন, যখন সেই বিধর্ম্মী সেনাপতি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ

মল্লেশ্বর ও উজন্নাথ মহাদেব।

হইয়া দেব মন্দির ও দেব মূর্ত্তি সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের লাঞ্ছনা করিতেছিলেন, সেই সময় এই শিবলিঙ্গ দুইটির পূজকগণ তাঁহা-দের চক্ষুর সম্মুখে দেবতার ঐরূপ লাঞ্ছনা হইবার আশঙ্কা করিয়া মল্লেশ্বরকে প্রস্তরাবরণে আবৃত করেন এবং উজন্নাথকে অদূরে এক বট-বৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া আসেন। কালাপাহাড় দেবমূর্ত্তি দুইটির সন্ধান না পাইয়া মন্দির দুইটিকেই ধ্বংস করিয়া দিয়া যান।

পরিবর্ত্তিকালে চন্দ্রকোণা বৰ্দ্ধমানাধিপতির অধিকারভুক্ত হইলে বৰ্দ্ধ-মানাধিপতি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লেশ্বর মহা-দেবের বর্ত্তমান সুউচ্চ ও সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু শিবলিঙ্গ অদ্যাপি সেইরূপ প্রস্তরাবৃত অবস্থাতেই রহিয়াছে। মল্লেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে উত্তরকালে ঐ স্থান মল্লেশ্বরপুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মল্লেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অনতিদূরে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে উজন্নাথ মহাদেবও অদ্যাপি আছেন। শ্রুত হওয়া যায় যে, যতবার উহার জন্য মন্দির বা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ততবার উহা ভূমিকম্প, গৃহদাহ, বজ্রাঘাত বা অন্য কোনপ্রকার দুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশদ্বারী দুর্গ।

চন্দ্রকোণা সহরের দক্ষিণে দ্বাদশদ্বারী বা 'বারদুয়ারী' নামক দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি ঐ স্থানেই চন্দ্রকোণার প্রাচীন রাজা চন্দ্রকেতুর রাজবাটী ছিল। পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হই-য়াছে, দক্ষিণ রাঢ়ে সুরবংশীয়দিগের অধিকার লুপ্ত হইলে বগড়ী ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে এক একটি ক্ষুদ্রতর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঐ সময় চন্দ্রকোণায় যে রাজবংশ প্রথম আধিপত্য করিয়াছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু সেই বংশের শেষ রাজা। তৎপরে চন্দ্র-কোণায় বগড়ীর চৌহান বংশীয় রাজাদিগের অধিকার আরম্ভ হইয়াছিল।

'জমিদার বংশ' শীর্ষক অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। দ্বাদশদ্বারী দুর্গটি চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত ও সুগভীর পরিখার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন আছে। ঐ দুর্গ মধ্যস্থ একটি স্থানকে লোকে কর্পূরতলা বা রাজাদের কোষাগার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐ প্রাসাদটীর পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শন নাই।

রামগড় ও লালগড় দুর্গ।

চৌহান বংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোণার পশ্চিম প্রান্তে রামগড় ও লালগড় নামে দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫২২ খৃষ্টাব্দে রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৫৭৭ শকাব্দায় (১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে) প্রাচীন দ্বাদশদ্বারী দুর্গ হইতে গিরিধারী জীউকে আনয়ন করিয়া লালগড় দুর্গে স্থাপিত করা হইয়াছিল। তথায় গিরীধারী জীউর জন্য একটি সুদৃশ্য নবরত্ন মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। রামগড় দুর্গে রঘুনাথ জীউর যে মূর্ত্তি ছিল, তাহা উত্তরকালে লুপ্ত হওয়ায় পরবর্ত্তী-কালে কোন রাজা ঐ দুর্গের অনতিদূরে একটি সুদৃশ্য বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অষ্টধাতু নির্ম্মিত রঘুনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লালগড় দুর্গের অভ্যন্তরস্থ নবরত্ন মন্দিরটিও ধ্বংস হইলে গিরীধারী জীউকেও উত্তরকালে তথা হইতে আনয়ন করিয়া রঘুনাথ জীউর মন্দি-রের নিকটে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। লালগড় হইতে আনীত হইবার পর হইতে গিরীধারী জীউ লালজীউ নামে অভিহিত হইতেছেন। গিরীধারী জীউর পুরাতন নবরত্ন মন্দিরে যে প্রস্তর ফলকখানি ছিল তাহা এক্ষণে লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে রক্ষিত আছে। উহা হইতে জানা যায় যে, ১৫৭৭ শকে রাজা হরি-নারায়ণের পত্নী রাণী লক্ষণাবতী কর্ত্তৃক গিরীধারী জীউর মন্দিরটি

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * লালজীউর মন্দিরটি বঙ্গীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু রঘুনাথ জীউর মন্দিরটি উৎকল স্থাপত্যের নিদর্শন।

লালজীউর মন্দিরের সম্মুখে একটি নাট্য-মন্দির আছে এবং উহার অনতিদূরে কামেশ্বর মহাদেবের একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরও আছে। উহারই দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস-মঞ্চ। খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, কামেশ্বর মহাদেবও ১৫৭৭ শকাব্দায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ গড় ও অযোধ্যা।

এই সমস্ত মন্দির সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে সুবৃহৎ প্রবেশ-দ্বার। এই স্থানটি 'রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ী' নামে পরিচিত এবং যে গ্রামে এই ঠাকুরবাড়ীটি অবস্থিত উহা 'অযোধ্যা' নামে অভিহিত হইতেছে। তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর ১২৩৮ সালে (খৃঃ অঃ ১৮৩১) ঐ সকল পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্কার ও আবশ্যকীয় নূতন মন্দির ও প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া প্রাচীন দেবতাগুলিকে সুশোভিত করেন। তদবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান রাজবংশের আনকূল্যে প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি সজীবভাবে রক্ষিত হইতেছে।

---

* প্রস্তর ফলকটিতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে :—

"শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৭৭।
শাকে অশ্ব মুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে
তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে শ্রীযুক্তস্য বভুবত।
হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী শ্রী লক্ষণাবতী
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্ন মিদংদদৌ॥
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ রসিকা শ্রী বীরভার্গেবির্ধুঃ
খ্যাত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বণিতা শ্রীহোলরজাত্মজ।
মাতা শ্রীযুক্ত মিত্রসেন নৃপতৌর্বিখ্যাত কান্তেমিতৌ
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী-রম্য দদৌমন্দিরং॥
গিরীধারী পদাম্বোজে নবরত্ন মিদং শুভ
নির্ম্মায় বহু যত্নেন সমর্পিতবতীমুক॥"

রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে লালজীউর ও রঘুনাথ জীউর কারু-কার্য্য বিশিষ্ট দুইখানি রথ আছে। দশহরার দিবস রথযাত্রা উপলক্ষে এবং রঘুনাথ জীউর পুষ্যা উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণায় দুইটি সুবৃহৎ মেলা বসে। সে সময় তথায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হয়। এই সকল উৎসবের খরচ, দেবতা দিগের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পূজার ব্যয় এবং অতিথি অভ্যাগত-দিগের সৎকারের জন্য বৰ্দ্ধমানরাজ বিস্তর ভূসম্পত্তি দেবত্তর রূপে দান করিয়াছেন। উহারই উপসত্ব হইতে সকল খরচ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

লালজীউ ও রঘুনাথ জীউর রথ।

চন্দ্রকোণায় 'রাজার মার পুকুর' নামে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। জনশ্রুতি, রাজমাতা লক্ষণাবতী উহারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রকোণার অন্তর্গত মিত্রসেনপুরের কালীপূজাও রাজমাতার অন্যতম কীর্ত্তি। এইরূপ কিম্বদন্তী, রাজা মিত্রসেন কর্ত্তৃক উক্ত স্থানে একটি নূতন নগর স্থাপিত হইলে পর রাজমাতা মহাসমারোহের সহিত তথায় কালীপূজা করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসরই বিশেষ সমারোহের সহিত ঐ স্থানে কালীপূজা হইয়া আসিতেছে এবং এখনও উহা 'রাজার মা'র কালীপূজা' নামেই পরিচিত। রঘুনাথ গড়ের নিকট রাণীসাগর ও সীমাসাগর নামে আরও দুইটি বড় বড় পুষ্করিণী আছে। চন্দ্রকোণায় রামোপাসক সম্প্রদায়ের বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি ও নানক পন্থীদিগের একটি মঠ আছে। তিনটি অস্থলে উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী তিন জন মোহন্ত থাকেন এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি পূজিত হয়। নানক সম্প্রদায়ের মঠে 'গ্রন্থ সাহেব' রক্ষিত আছে। ঐ সকল মঠেরও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে।

রাজমাতার কীর্ত্তি ও সন্ন্যাসীদের মঠ।

চন্দ্রকোণা সহরের উত্তরে 'সাহেব ডাঙ্গা'-নামক স্থানে কতকগুলি ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে। কোম্পানীর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ইউরোপীয় বণিকগণ ঐ স্থানে বাস করিতেন। সেই কারণে ঐ স্থানের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময় এ প্রদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি-লাভ করায় ইউরোপীয় বণিকগণ এই দেশের নানা-স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানে এখনও সেই সকল সুবৃহৎ নীলকুঠী ও রেশম কারখানাগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

সাহেব ডাঙ্গা।

ক্ষীরপাই সহরের নিকটবর্ত্তী কাশীগঞ্জ নামক গ্রামেও কোম্পানীর একটি সুবৃহৎ কুঠী ছিল। উহারই অনতিদূরে বেড়াবেড়া নামক পল্লীতে সাহেবদের ছয়টি সমাধি-স্তম্ভ আছে। সমাধি-স্তম্ভগুলির এখন ধ্বংসাবস্থা এবং উহাদের গাত্র-সংলগ্ন খোদিত লিপিগুলিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেজন্য ঐগুলি যে কাহাদের সমাধি বা কতদিনের পুরাতন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। সেকালে ইউরোপের অধিবাসীরা যাহারা এ দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য বা চাকরী উপলক্ষে আসিতেন, তাহারা এদেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন এবং এদেশের লোকেও তাহাদিগকে নিজেদের বন্ধু বান্ধবের মতই মনে করিতেন। সেকালের দেশী বিদেশীর ঐরূপ ঘনিষ্ঠতার অনেক কাহিনী অদ্যাপি এ প্রদেশে শ্রুত হওয়া যায়। এই জেলার সার্ভে সেটেলমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে আমাদিগকে একবার বেড়াবেড়া পল্লীতেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া কয়েক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সেই সময় দেখিয়াছি, গ্রামবাসিবৃদ্ধগণ এখনও তাহাদের পারিবারিক

বেড়াবেড়ার সমাধি-ক্ষেত্র।

কোন শুভকার্য্য উপলক্ষে বা কোন বিশেষ পর্ব্বদিনে তাহাদের পিতৃ পিতামহের সুখ দুঃখের সাথী পরলোকগত সেই সকল বিদেশীয় বন্ধুগণের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করতঃ এক একটি ক্ষুদ্র দীপাধার তৈল পূর্ণ করিয়া সেই জরাজীর্ণ সমাধিগুলির সম্মুখে জ্বালিয়া দিয়া আসে।

ঝাকরার দীঘি।

চন্দ্রকোণা সহরের চার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ঝাকরা গ্রামে "ছোট দীঘি" নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার এক পার্শ্বে দাঁড়াইলে অন্য পার্শ্বের লোক চেনা যায় না। কতদিন হইল কাহার দ্বারা যে ঐ পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছিল তাহা জানা না গেলেও পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে উহা খোদাই করা হয় নাই তাহা উহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা যায়। নাম হইতে জানা যায়, উহাই ঐস্থানের ছোট দীঘি ; এতদ্‌ব্যতীত ঐস্থানে একটি বড় দীঘিও ছিল, তাহা এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কেবল স্থানে স্থানে পাড়ের ধ্বংসাবশেষ তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। ছোট দীঘিটির পরিমাণ দেখিয়া বড় দীঘিটী কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

পিঙ্‌লাসের সাঁকো।

ঝাকরা গ্রামের তিন চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দনাই নদী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দরাম এই দনাই নদীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। দনাই নদীর উপরে বর্দ্ধমান রাস্তায় 'পিঙ্‌লাসের সাঁকো' নামে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত পুরাতন পোল ছিল। এই পিঙ্‌লাসের সাঁকো পূর্ব্বে 'কাত্‌লা ফেলার' জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ঐস্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। উহার অনতিদূরে একটি সুবৃহৎ নীলকুঠী ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষও অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেই স্থানেও একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে।

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে চিতুয়া বরদার জমিদার

শোভা সিংহের গড়বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বরদা পরগণার বিখ্যাত বিশালাক্ষী দেবী এই বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমায় হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ-নামক স্থানে হজরৎ ইস্‌মাইলের যে দরগা আছে জনশ্রুতি, উহা শোভা সিংহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি উহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। * রঙ্গপুর জেলার কাঁটাদুয়ার নামক স্থানে ইস্‌মাইল্ গাজীর সমধিস্থানে একজন ফকীরের নিকট রিসালৎ-উশ্-শুহাদা নামক একখানি পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। রিসালৎ-উশ্-শুহাদা অনুসারে মান্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে, ইস্‌মাইল্ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। ঐ সময় মান্দারণ উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। কিন্তু উৎকলের ইতিহাস মাদলা পাঞ্জীতে ইস্‌মাইল গাজীর উৎকল অভিযানের ফলাফল অন্যরূপ লিখিত আছে; ইতিপূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। রিসালৎ-উশ্-শুহাদা অনুসারে ইস্‌মাইল্ ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার মান্দারণ পরগণায় ইস্‌মাইলের দেহ ও রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ার গ্রামে তাঁহার মস্তক সমাহিত আছে। †

শোভা সিংহের কীর্ত্তি।

দাসপুর থানার অন্তর্গত নাড়াজোল পরগণায় নাড়াজোল রাজবংশের কয়েকটি কীর্ত্তি আছে। গড় নাড়াজোল নামক স্থানে ঐ বংশের রাজবাটী অবস্থিত। নাড়াজোল গড়ের আয়তন অন্যূন পাঁচ শত

---

* District Gazetteer—Midnapore—p· 167.

† বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ—২১২।

বিঘা ভূমি। উহা বাহির গড় ও ভিতর গড় নামে দুই ভাগে বিভক্ত। রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি সুপ্রশস্ত পরিখা ঐ দুই গড়ের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। বাহির গড়ে নিম্নশ্রেণীর বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানের বাস দৃষ্ট হয়; সেকালে উহারা বর্গী প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রাজভবন সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল। ভিতর গড় রাজবাটী, দেবালয়, পূজার দালান, বৈঠকখানা, তোষাখানা, সদর মহাল, অন্দর মহাল প্রভৃতি বিবিধ খণ্ডে বিভক্ত। ঐ গড়ের মধ্যে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট কয়েকটি দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ আছে। গৃহগুলি নানাবিধ মনোহর দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পদ্রব্য ও জয়পুর, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত মুসলমান সম্রাটগণের বহুমূল্য প্রতিকৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। প্রাসাদে প্রবেশের একটি মাত্র তোরণ এবং উহার মস্তকোপরি নহবৎখানা। গড়ের মধ্যভাগে সীতারাম জীউর মন্দির, একটি প্রাচীন শিবালয়, বিবিধ কারুকার্য্য খচিত সপ্তদশ চূড়া বিশিষ্ট রাসমণ্ডপ, দোলমঞ্চ ও শ্রেণীবদ্ধ ছয়টি শিবালয় আছে।

নাড়াজোল-গড়।

নাড়াজোল রাজভবনের নিকটস্থ 'লঙ্কা গড়' নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীটি নাড়াজোলের তদানীন্তন অধিপতি রাজা মোহনলাল খাঁনের একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই সুন্দর পুষ্করিণীটি ও জমিদারীর নানা স্থানে আরও কয়েকটী পুষ্করিণী খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। চিতুয়া পরগণার অন্তর্গত সখাদ গ্রামের মঠটীও রাজা মোহনলাল কর্ত্তৃক স্থাপিত। তিনি এজন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। নাড়াজোল পরগণার মধ্যে ফতেগড় ও গড়গোপীনাথপুর নামে রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ আছে। বর্গী প্রভৃতির উপ-

লঙ্কা গড় ও সখাদ গ্রামের মঠ।

দ্রবের সময় রাজ-পরিবার ধনরত্ন লইয়া তথায় সময়ে সময়ে বাস করিতেন।

সদর মহকুমার মধ্যে মেদিনীপুর সহরে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে। কতদিন হইল কাহার দ্বারা যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের অনুমান, রাজা মেদিনী কর কর্ত্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়েই এই দুর্গটীও নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপরে এদেশে মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এই দুর্গটীও মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময়েই উহার অভ্যন্তরস্থ মস্‌জিদটী নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর পরগণার মধ্যে দুইটি দুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর অনুমান করেন, এই দুর্গটী তন্মধ্যে একটি। * মোগল রাজত্বে এই দুর্গটী এপ্রদেশের একটি প্রধান সেনা-নিবাস ছিল। নবাব আলীবর্দ্দী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীর জাফর, মীর কাশেম প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে বহুদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত সুজাগঞ্জ, অলিগঞ্জ, মীর বাজার, মীরজা বাজার, নজরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নামগুলিতে এ স্থানে মুসলমান প্রতিপত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান দিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ কিছুদিন এই দুর্গটী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে এদেশে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা তাহাদেরও সেনা-নিবাসে পরিণত হইয়াছিল। সে সময় বহু সংখ্যক সৈন্য এই স্থানে থাকিত। মেদিনীপুর সহরের কর্ণেলগোলা, মিলিটারী বাজার, সিপাহী বাজার প্রভৃতি

মেদিনীপুর সহরের দুর্গ।

* J. A. S. B., Vol. XII. 1916. No. I, pp. 46-56.

স্থানের নামকরণ সেই সময়েই হয়। মেদিনীপুর হইতে সেনা-নিবাস উঠিয়া গেলে এই দুর্গটী মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট্ জেলরূপে ব্যবহৃত হইত। পরে নূতন সেণ্ট্রাল জেল নির্ম্মিত হইলে ডিষ্ট্রীক্ট্ জেলটিও তথায় উঠিয়া যায়। তদবধি সাধারণের নিকট উহা পুরাতন জেল নামে পরিচিত হইতেছে। এক্ষণে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় এই প্রাচীন দুর্গটী দিনে দিনে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। জন-শ্রুতি, এই দুর্গটীর অভ্যন্তর হইতে সহরের উপকণ্ঠস্থিত গোপগিরি পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। শত্রু কর্ত্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার বা বাহির হইতে ভিতরে আসিবার জন্য এই গুপ্ত পথটি রাখা হইয়াছিল। সহরের দুই একজন প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত হওয়া যায়, ডিষ্ট্রীক্ট্ জেলের জনৈক কয়েদি ঐ পথে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মারা যায়। এই দুর্ঘটনার পরেই দুর্গের মধ্যে ঐ সুড়ঙ্গটীর যে দ্বার ছিল তাহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন আছে। কিন্তু অন্য দ্বারটি যে, গোপগিরির নিকট কোন স্থানে ছিল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে যে সুবিস্তীর্ণ মাঠ আছে উহার সহিত হিন্দু, মুসলমানের, ইংরাজ, মারহাট্টার জয় পরাজয়ের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। ঐস্থানে হিন্দু মুসলমানে, মোগল পাঠানে, মোগলে বর্গীতে অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সে সময় মাঠটী সুবিস্তৃত ছিল; পরবর্ত্তিকালে উহারই স্থানে স্থানে জেলা স্কুল ও কলেজ, কলেজের ছাত্রাবাস, পোষ্ট আফিস, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড আফিস, এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হস্পিট্যাল, ফিমেল হস্পিট্যাল, কুষ্ঠাশ্রম, ইয়ংমেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসি-য়েসন প্রভৃতি সরকারী ও বে-সরকারী গৃহগুলি নির্ম্মিত হওয়ায় উহার আয়তন এক্ষণে ছোট হইয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুর সহরের মধ্যে জগন্নাথ, শীতলা ও হনুমান জীউর মন্দির তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি, মেদিনীপুর যে সময় উৎকলের রাজাদিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল, সেই সময় এইস্থানে উৎকলাধিপতি গঙ্গবংশীয় কোন রাজা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির।

কংসাবতী নদীর জল প্রবাহে প্রাচীন মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় প্রায় শত বৎসর হইল বড় বাজারের মহাজনগণ বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দিরটী সহরের দক্ষিণ প্রান্তে যে স্থানে রাণিগঞ্জ রোড, উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা প্রভিন্‌সিয়াল রোড (উলুবেড়িয়া রাস্তা) ও পুরাতন বম্বে রোড নামে চারিটি প্রসিদ্ধ রাজপথ মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে অবস্থিত।

শীতলা দেবীর মন্দিরটী মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরটী বড় বাজারের কেন্দ্রস্থলে এবং হনুমানজীউর মন্দিরটী মীর বাজার নামক পল্লীতে অবস্থিত। আনুমানিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে জনৈক রামোপাসক সন্ন্যাসী এই সহরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া হনুমানজীউর মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া যান।

মেদিনীপুর সহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুর পল্লীতে এবং সহরের দক্ষিণপ্রান্তে কংসাবতী নদীর তীরে নূতন বাজার নামক পল্লীতে প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি কালীমূর্ত্তি আছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল মেদিনীমাতার সুসন্তান, মধ্য প্রদেশের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে আই, সি, এস্ মহোদয় নিজ ব্যয়ে হবিবপুরের কালীর মন্দিরটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। সহরের মধ্যস্থিত বিবিগঞ্জ নামক পল্লীতে দশভূজা দুর্গা দেবীর ও

কর্ণেলগোলা নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের সুউচ্চ মন্দির দুইটিও উল্লেখ যোগ্য। শিববাজার পল্লীতে মেদিনীপুরের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় চৌধুরী জনমেঞ্জয় মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটি শিবালয় ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট একটি রাস-মঞ্চ আছে। বার মাসের তের পর্ব্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ রাস-যাত্রার সময় মল্লিক বাবুরা এইস্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

মসজিদ্ ও পীরস্থান।

মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত মসজিদ্ ও পীরস্থানগুলির মধ্যে সিপাহী বাজারের সাধল, নরমপুরের ইদ্‌গা, মিঞা বাজারের দেওয়ান সৈয়দ্ রাজ্জি বা চন্দন সাহিদের মসজিদ্ ও মহাতাপপুরের ইয়াদ্‌গার সাহেবের মসজিদ্ সুপ্রসিদ্ধ। সিপাহী বাজারের সাধলে পারস্য ভাষায় লিখিত যে লিপিটী আছে, উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নরমপুরের ইদ্‌গার সহিতও সাজাহানের নাম সংযুক্ত আছে, সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দন সহিদের মসজিদে হস্ত-লিখিত একখানি পুরাতন কোরাণ আছে। জনশ্রুতি, বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের সময়ে এই মসজিদ্‌টী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইয়াদ্‌গার সাহও চন্দন সহিদের সমসাময়িক ব্যক্তি। বর্ত্তমান কালেক্টারী কাছারীর পূর্ব্ব-প্রান্তে পীর পল্‌ওয়ান নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক এই সাধুর সমাধি পার্শ্বে দু'একটি করিয়া পয়সা বা কিছু সিন্নি দিয়া যায়। চন্দন সহিদ, ইয়াদ্‌গার সাহ ও পীর পল্‌ওয়ান হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট হইতেই সমভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া থাকেন। কর্ণেল গোলা পল্লীর দেওয়ান থানার মসজিদ্‌টীর কারুকার্য্যও উল্লেখ যোগ্য। সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে এক ফকিরের সমাধি স্থানে একটি কূপ আছে। এ প্রদেশে উহা 'ফকিরের কূয়া' নামে

পরিচিত; উহার জল অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য পরিবর্দ্ধক। এই জন্য প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক সমাধি রক্ষকের নিকট হইতে মূল্য দিয়া জল লইয়া যায়। কূপটির সহিত একটি ঝরণার যোগ থাকায় উহার জল কখনও শুষ্ক হয় নাই; প্রায় সকল সময়েই উহা পূর্ণ থাকে। বাহিরের আবর্জ্জনাদি যাহাতে কূপের ভিতরে পড়িতে না পারে সেইজন্য কূপটীর উপরেও ছাদ দেওয়া আছে।

গীর্জ্জা ও সমাধি-ক্ষেত্র

মেদিনীপুর সহরের কেরাণীটোলা পল্লীতে রোমান ক্যাথলিক-দিগের ও চার্চ্চ অব ইংলণ্ড মিশন সম্প্রদায় খৃষ্টানদিগের এক একটি গীর্জ্জা আছে। এতদ্ব্যতীত সহরের উত্তরাংশে 'আবাস গড়ের' সন্নিকটে আমেরিকান ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন সম্প্রদায়েরও একটি গীর্জ্জা আছে। রোমানক্যাথলিকদিগের গীর্জ্জাটি এ দেশে ইংরাজাধিকার আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের 'সেণ্ট জন্স্‌ চার্চ্চ' নামক সুউচ্চ গীর্জ্জাটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চার্চ্চ অব ইংলণ্ড মিশন ও আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন দুইটির কার্য্য যথাক্রমে ১৮৩৬ ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এ প্রদেশে আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি গীর্জ্জার সন্নিকটেই খৃষ্টানদিগের তিনটি সমাধি-ক্ষেত্র আছে। এতদ্ব্যতীত কর্ণেলগোলা পল্লীর পুরাতন জেল নামক প্রাচীন দুর্গটির দক্ষিণদিকে উহারই গাত্র-সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেও আর একটি সমাধি-ক্ষেত্র আছে। স্থানাভাব বশতঃ উহা এক্ষণে অব্যব-হার্য্য হইয়াছে। তথায় অনেকগুলি সমাধি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি শতাধিক বৎসরের পুরাতন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরাজ রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে কোম্পানীর কার্য্যে যাঁহারা দূরদেশে স্বজন বিরহ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ কয়েক জন ইংরাজ

সৈন্যাধক্ষ ও উচ্চ পদস্থ সিভিল কর্ম্মচারীর সমাধিও উহার মধ্যে আছে।

মেদিনীপুর জজ-আদালতের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে মেদিনীপুরের ভূত-পূর্ব্ব কালেক্টার জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি-স্তম্ভের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি তেইশ বৎসর কাল কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তন্মধ্যে শেষ বার বৎসর মেদিনীপুরের কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। পিয়ার্স সাহেব একজন অতি উচ্চ প্রকৃতির উদার-হৃদয় কর্ত্তব্য পরায়ণ রাজপুরুষ ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার দয়া ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার অনেক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। মেদিনীপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়টী তাঁহার সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষা কল্পে উহা 'পিয়ার্স হস্পিট্যাল' নামে পরিচিত।

পিয়ার্স সাহেবের সমাধি।

পিয়ার্স সাহেবের সমাধি-স্তম্ভে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতে লিখিত দুইখানি প্রস্তর-ফলক আছে। বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লেখা আছে তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

"শ্রীরাম
মেস্ত্র জন পিয়ার্শ সাহেব
জিলা মেদনিপুর বারো ব
ৎসর কেলট্টার কাজ করিয়া
সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই
সন ১১৯৫ বাঙ্গালা ১১ জৈষ্ঠী
কাল হইয়াছে—তাহার কবরে
এই কির্ত্তি করিয়া দেয়া গেল।"

সমাধি-স্তম্ভের এই লিপিটি হইতে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ নমুনা পাওয়া যায়, সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীদের প্রতি তৎকালীন রাজ কর্ম্মচারীদের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ইংরাজের সমাধি-স্তম্ভে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রস্তর ফলক বড় একটা দেখা যায় না।

পদ্মাবতী ঘাট ও কয়েকটী পুষ্করিণী।

মেদিনীপুর সহরের 'পদ্মাবতী ঘাট' নামক শ্মশানটী ভারত-গৌরব সার রাস বিহারী ঘোষের কীর্ত্তি। জননী পদ্মাবতীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তিনি এই শ্মশান ঘাট নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। পদ্মাবতী এই সহরে তাঁহার পিত্রালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর সহরে যে কয়েকটী পুষ্করিণী আছে তন্মধ্যে লালদীঘি হ্যারিসন দীঘি, মুকুন্দ সাগর, দ্বারিবাঁধ ও চন্দ্রাকর উল্লেখ যোগ্য।

গোপ গিরি।

মেদিনীপুর সহরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে গোপ গিরি নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, ঐ স্থানে মহাভারতোক্ত মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার "দক্ষিণ গোগৃহ" ছিল। বর্ত্তমান যুগের পণ্ডিতগণ রাজপুতানার মধ্যে মৎস্যদেশের স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ উত্তরে রঙ্গপুর জেলার গাইবাঁধা মহকুমা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নানা-স্থানে মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমাদের অনুমান, মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের সহিত এই সকল কীর্ত্তির কোন সম্বন্ধ নাই; এগুলি বৌদ্ধকীর্ত্তি। কালসহকারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি যেরূপে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, এই সকল স্থানও সেই কারণে এইরূপ পৌরাণিক

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আর যে সকল স্থানে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই, সে সকল স্থান হিন্দুদিগের পরিত্যজ্য হইয়া রহিয়াছে। উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, চৈতন্যদেব যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন, তখন পথে যে কোন হিন্দু-তীর্থ পাইয়াছিলেন তাহাই দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়গিরি বা খণ্ডগিরির উপরে উঠিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই। সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তখন পৌরাণিকদিগের প্রায়ই ত্যাজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় আমাদের তীর্থ নয়।" *

রায়বণিয়া দুর্গের প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমরা কোটদেশের বিরাট-গুহ নামক এক রাজার নামোল্লেখ করিয়াছি। আমাদের অনুমান, মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কীর্ত্তি মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, সে সকল কোটদেশাধিপতি উক্ত বিরাট রাজার কীর্ত্তি। এই জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দন্তপুর বা আধুনিক দাঁতন সহরের পাঁচ ছয় মাইল অন্তরে রায়বণিয়া গড়ে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুমান করেন, এই বিরাটগুহ দন্তপুরের সেই প্রাচীন রাজা গুহশিব বা শিব গুহের বংশধর; পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের প্রভুত্ব সমস্ত গড়জাত প্রদেশে বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহাদেরই বংশধর বিরাট গুহ রামচরিতের টীকায় গৌড় কবির নিকট "নানারত্ন-কুটকুট্টিম-বিকট-কোটটবী-কণ্ঠীরবো দক্ষিণ-সিংহাসন চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই বিরাট গুহ সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জানা যায় নাই। তিনি যদি শিবগুহর বংশধর হ'ন, তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনিও বৌদ্ধ ধর্ম্মা-

* উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সারদাচরণ মিত্র প্রণীত।

বলম্বী ছিলেন এবং সেই কারণে পৌরাণিকগণ উত্তরকালে তাঁহার কীর্ত্তির সহিত মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ স্থানটীর নাম 'গোপ' বলিয়া 'গোগৃহ' নামটীও সহজে মিলিয়া গিয়াছে। ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত ও বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থেও নগেন্দ্র বাবু বিরাট রাজার নাম পাইয়াছেন। তিনিও সেই বিরাট, কোটদেশাধিপতি বিরাট ও মেদিনীপুরের বিরাট রাজা, এই তিন বিরাটকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। *

গোপ গিরির অবস্থান দেখিলে মনে হয়, এক সময় ঐ স্থানে একটি গড় বা দুর্গ ছিল এবং তাহারই উপযোগী করিয়া পাহাড়টীকে কাটিয়া ছাঁটিয়া লওয়া হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, সে সময় মেদিনীপুর সহরে দুইটি দুর্গ ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন, তন্মধ্যে এই স্থানের দুর্গটী অন্যতর, দ্বিতীয়টি মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এক্ষণে 'পুরাতন জেল' নামে পরিচিত। হিন্দুরাজত্বের পর এই দুইটি দুর্গই মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে সময় মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত দুর্গটী প্রধান দুর্গ হওয়ায় গোপ দুর্গটীর তখন বোধ হয় আবশ্যকতা ছিল না। ফলে বহুকাল অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় দিনে দিনে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। উত্তরকালে, কিছু কম শত বৎসর হইল, তাহারই ধ্বংসাবশেষ লইয়া উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণ গোপ গিরির উপরে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালচক্রে তাহাও এক্ষণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গোপ গিরির উপরে ত্রিকোণমিতিক জরীপের একটি

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩১৪-৩১৫।

স্তম্ভ আছে এবং গোপ গিরির পাদদেশে পুরাতন বোম্বে রাস্তার পার্শ্বে গোপ নন্দিনী নামে এক প্রাচীন দেবী আছেন।

গোপ গিরির অনতিদূরে সুউচ্চ ভূমির উপর নাড়াজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতেছেন। কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই প্রাসাদটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলোক ও ব্যজন, সুরম্য উদ্যান, গ্রীষ্ম উত্তাপ নিবারণার্থে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ গৃহ প্রভৃতি বিলাসিতার সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থাই এই গৃহে আছে।

গোপ-প্রাসাদ।

মেদিনীপুর সহরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার পূর্ব্বদিকে আবাস গড়টি অবস্থিত। এক্ষণে উহাকে একটি ভগ্নপ্রায় উদ্যান বাটী-কার ন্যায় দেখায়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাজা রামসিংহ কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই গড়টী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের রাজা মোহনলাল খাঁ এই গড়টীর অনেক সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন। গড়টীর পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। উহার একদিকে এখনও অগাধ জল দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানের নাম 'রাজার বাঁধ'। গড়ের সম্মুখ-দেশে এক বৃহৎ সিংহদ্বার; ঐ দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরীদের থাকিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে খিলান করা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। ঐ দ্বার পার হইলে প্রাচীর বেষ্টিত অনেকখানি ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীরগাত্রে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল তথায় রাজসৈন্যগণ বাস করিত। ঐ স্থান অতিক্রম করিলে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে অন্যূন শতবিঘা

আবাস গড়।

আয়তন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে এবং উহার তীরে নয়টি চূড়াবিশিষ্ট একটি জীর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটীর পার্শ্বে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী বিদ্যমান। একটির মধ্যে দশভূজা, জয়দুর্গা ও গৌরী নামে তিনটি ধাতুময়ী ভগবতী মূর্ত্তি আছেন এবং অন্যটীতে প্রস্তরময় রাধাশ্যাম, শ্যামসুন্দর ও মদনমোহন এবং ধাতুময়ী রাধিকা ও রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি আছেন। এই গড়টী এক্ষণে নাড়াজোলাধিপতির সম্পত্তি। তাহারই ব্যয়ে দেবদেবীগুলির প্রত্যহ প্রচুর অন্নভোজ দেওয়া হয়। অতিথি, অভ্যাগত ও বহু সংখ্যক দরিদ্র প্রত্যহ সেই প্রসাদী অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আবাস গড়ের উত্তরে দুই ক্রোশ স্থান মধ্যে শালবণী থানায় কর্ণগড় নামে আর একটি গড় আছে। পূর্ব্বে ইহার কথা একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গড়টী প্রায় এক ক্রোশ ব্যাপী ছিল এবং উহার বহির্ভাগ সদর মহাল ও অন্তর্ভাগ অন্দর মহাল নামে দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। সদর মহাল রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগের অবস্থানের জন্য এবং অন্দর মহাল কুল দেবতা ও অন্তঃপুরিকা স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কর্ণ গড়।

এই জেলার পশ্চিমদিগ্‌বিভাগের উচ্চ ভূমি ক্রমে নিম্ন হইয়া যেস্থানে প্রস্তর লক্ষণ ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকা লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ সন্ধি-স্থলেই এই রাজবাটী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই জন্য এই গড়ের তিন পার্শ্বে জঙ্গল এবং পূর্ব্বপার্শ্বে আবাস ও কৃষিযোগ্য ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গল খণ্ড হইতে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া নদীর আকার ধারণ করতঃ যে স্থান দিয়া বহমান হইয়াছে এমন স্থানে কর্ণগড়ের অন্দর-মহাল প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর নাম পারাং নদী। পারাং নদীর স্রোত গড়ের দুই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার একত্র

মিলিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত নদী গড়ের স্বাভাবিকী পরিখার কার্য্য করিয়া এই স্থানকে অতি সুখদ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিখার মধ্যস্থিত ভূমি প্রায় শতাধিক পরিমাণ বিস্তৃত। ইহার মধ্যে ইষ্টক-নির্ম্মিত অনেকগুলি গৃহ ও দেব মন্দির ছিল। সে সমুদয় গৃহাদি এক্ষণে চূর্ণিকৃত হইয়া জঙ্গলময় স্তূপাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উচ্চ-ভূমিতে সৈন্যগণের ও রাজকর্ম্মচারিদিগের যে বাসস্থান ছিল, তাহার চিহ্ন অতি সামান্যই আছে। পরিখার বহির্ভাগে একটি পঞ্চরত্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, উহা রাজগুরুর কুলদেবতার মন্দির। এক্ষণে উহাতে কোন মূর্ত্তি নাই।

কর্ণগড়ের দক্ষিণাংশে এই রাজ্যের অধিদেবতা অনাদিলিঙ্গ ভগবান্ দণ্ডেশ্বর ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী মহামায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। বৃহদাকার প্রস্তর দ্বারা এই দেবদেবীর মন্দির এরূপ সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত যে দেখিলে মনে হয়, যুগযুগান্তরেও উহার বিলোপ হইবে না। এই মন্দিরের তোরণ-দ্বারদেশে নির্ম্মিত "যোগী-ঝোপা" বা যোগ মণ্ডপ-নামক প্রস্তরময় ত্রিতল মন্দিরটি আর এক অদ্ভুত বস্তু। মহামায়ার মন্দিরে একটি পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী শিবায়ন রচয়িতা কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের খ্যাতনামা রাজা যশোবন্ত সিংহ উক্ত যোগাসনে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ণগড়টীও এক্ষণে নাড়া-জোলাধিপতির সম্পত্তি। তাঁহারই ব্যয়ে মন্দিরগুলির সংস্কারাদি এবং দেবতাগুলির সেবা-পূজা যথারীতি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

খড়্গপুর থানার অন্তর্গত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ইন্দা গ্রামে খড়্গেশ্বর নামে মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, ধারেন্দার অন্যতম রাজা খড়্গসিংহ কর্ত্তৃক এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন,

খড়্গেশ্বর মহাদেব ও হিড়ম্ব-ডাঙ্গা।

বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা খড়্গ মল্ল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দিরটী যে সুপ্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত উহা 'হিড়ম্ব-ডাঙ্গা' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি, মহাভারতীয় কালে এই প্রদেশে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং উহা হিড়ম্ব রাক্ষসের অধিকার-ভুক্ত ছিল। পঞ্চপাণ্ডব যে সময় বনবাস করিতেছিলেন সেই সময় ঘটনাচক্রে তাঁহারা এক দিন এই স্থানে আসিয়া পড়েন; হিড়ম্বের ভগিনী হিড়িম্বা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। হিড়ম্ব ইহা অবগত হইয়া সক্রোধে ভীমকে আক্রমণ করিলে ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধে হিড়ম্ব পরাজিত ও নিহত হয়। জনপ্রবাদ, এই প্রান্তরেই তাহাদের মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই কারণেই উক্ত স্থান 'হিড়ম্ব-ডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তার পার্শ্বে পীর লোহানী সাহেব নামক এক মুসলমান সাধুর সামাধি আছে। পীর-

পীর লোহানী সাহেব।

সাহেবের আদি নাম আমীর খাঁ; সম্ভবতঃ তিনি লোহানীবংশীয় ছিলেন বলিয়া পীর লোহানী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল। জনশ্রুতি, তিন চারি শত বৎসরেরও পূর্ব্বে তিনি এতদ্‌অঞ্চলে ভ্রমণ উপলক্ষে আসিয়া শেষে এই স্থানেই থাকিয়া যান। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কাহিনী অদ্যাপি শ্রুত হওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান সমভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। এখনও এ প্রদেশের হিন্দু মুসলমানেরা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এই স্থানে সিন্নি দিয়া থাকে। তিনি লোকহিতকর নানাপ্রকার কার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। পীর সাহেবের আস্তানাটী প্রস্তর নির্ম্মিত সমচতুষ্কোণ চত্বর। এই চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে

একটি সুউচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর এবং অপর তিন দিকে অনতিউচ্চ প্রস্তর দেওয়াল আছে। আস্তানাটির মধ্যে পীর সাহেবের, তাঁহার সহোদরা ফতে খাতুনের ও লাল খাঁ ও তাজখাঁ নামক দুই ভাগিনেয়র দেহ সমাহিত আছে। আস্তানার নিকটে তাঁহার কয়েকটী শিষ্যেরও সমাধি আছে। এই স্থানের প্রায় শত হস্ত পশ্চিমে পীর সাহেবের গুরুর সমাধি দৃষ্ট হয়। আস্তানাটীর পার্শ্ববর্ত্তী একখানি মৃণ্ময় গৃহে ফকির, মসাফির প্রভৃতি আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে একদিন সন্নিহিত পাঁচখানি গ্রামের মুসলমানদিগকে আস্তানায় ভোজন করান হয়। এই সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নবাবী আমল হইত যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্কর দেওয়া আছে।

পীর লোহানী সাহেবের আস্তানার অনতিদূরে একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রঙ্কিনী দেবীর মন্দির বলে। কিন্তু মন্দিরে এক্ষণে কোন মূর্ত্তি নাই। জনশ্রুতি, যে সময় ঐ মন্দিরে রঙ্কিনী দেবী ছিলেন, সেই সময় তাঁহার আহারের জন্য প্রতিদিন একটি মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সন্নিহিত প্রত্যেক গ্রামবাসী গৃহস্থকে প্রদান করিতে হইত। একদিন এক দুঃখিনী বিধবার পালা উপস্থিত হয়। বিধবার একটি অল্প বয়স্ক পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। পুত্রকে আহারের জন্য দেবীকে প্রদান করিতে হইবে, এই চিন্তায় দুঃখিনী জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দুঃখিনীর ক্রন্দনে মর্ম্মাহত হইয়া পরদুঃখকাতর পীর লোহানী সাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হন। দেবীর সহিত পীর সাহেবের যুদ্ধ হইলে দেবী পরাস্ত হইয়া মন্দিরের চুড়া ভগ্ন করতঃ পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করেন। অতঃপর দেবী জঙ্গলভূমির নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়া এক রজকের

রঙ্কিনী দেবী।

গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রজক দেবীর-অনুগ্রহে উক্ত প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশ ধল বা ধোপার নামানুসারে ধলভূমি নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে, ধল রাজবংশের রাজত্বকালে রঙ্কিনী দেবীর বাৎসরিক পূজার সময় নরবলি প্রদান করা হইত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, পূর্ব্বে খড়্গপুরেও এই রঙ্কিনী দেবীর নিকটে নরবলি দেওয়া হইত; পীর লোহানা সাহেব সেই প্রথার উচ্ছেদ করায় উত্তর কালে এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। রঙ্কিনী দেবী ও পীর লোহানী সাহেব সংক্রান্ত নানা প্রকার কাহিনী অদ্যাপি এই প্রদেশে শ্রুত হওয়া যায়।

খড়্গপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে প্রায় চার পাঁচ মাইল অন্তরে চাঙ্গুয়াল নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে এবং তৎসন্নিহিত দেউলী প্রভৃতি স্থানে ষোলাদীঘি. ক্ষীর সরোবর, বীর সরোবর, নজর প্রভৃতি নামে কয়েকটী দীর্ঘ জলাশয় ও প্রস্তর-নির্ম্মিত কতকগুলি মন্দির ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল রাজা বীরসিংহ ও তদীয় বংশীয়গণের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বীর

বীর সিংহের গড়।

সিংহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে মৃত্তিকা-স্তরে এই সকল গৃহ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া প্রায় ৩।৪ হাত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। চাঙ্গুয়ালের চতুর্দ্দিকে একটি পরিখা আছে; তাহার পরিধি প্রায় চার মাইল। উত্তর দিকে সিংহদ্বার ও সেনা-নিবাসের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদের ও প্রাচীরের কোন কোন অংশ এবং প্রস্তরের চৌকাটাদি অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে। চাঙ্গুয়ালের বর্ত্তমান জমিদারগণ উক্ত গ্রামের নানা স্থানে পতিত প্রাচীন

অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ হইতে কয়েক লক্ষ ইষ্টক ও প্রস্তরাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে যথেষ্ট ইষ্টক ও প্রস্তর রহিয়াছে। এই গ্রামের মধ্যে 'ধনপোতা' নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ, পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে প্রাচীন রাজবংশের ধনাগার ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সময় সময় উক্ত স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে কেহ কেহ অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যে যাহা পায় তাহা সংগোপনেই আত্মসাৎ করিয়া থাকে।

কাল নাগিনী দেবী।

বীর সিংহের ভগ্ন প্রাসাদের পার্শ্বে কালনাগিনী নাম্নী এক প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। লোকে বলে, এ প্রদেশে বীরসিংহের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই এই দেবী এখানে সংস্থাপিতা আছেন। কালনাগিনী দেবীর মন্দিরের কিছু পশ্চিমে ক্ষীর সরোবরের তীরে একটি প্রাচীম শিবালয়ও আছে। জনশ্রুতি, ইহা বীরসিংহের বংশের কীর্ত্তি। কিন্তু তাহার কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই।

ষোলা দীঘি।

চাঙ্গুয়াল গ্রামের প্রায় অর্দ্ধমাইল অন্তরে শিরসী ও চক দেউল গ্রামের সীমায় ষোলা দীঘি নামে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। উহার পরিমান ফল প্রায় শত বিঘা। ষোলা দীঘি ষোল খণ্ডে বিভক্ত। ষোলটি পুষ্করিণী একত্র সংযোগ করিলে যেরূপ ভাব লক্ষিত হয়, এখানেও প্রায় তদ্রূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি, ষোল জন সর্দ্দারের অধীনে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমে ষোলটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া পরে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দীঘির উত্তর পার্শ্বে বাঁধা ঘাটের পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাভিমুখে একটি হোমকুণ্ড ছিল এবং ঘাটের উপরিভাগের কতক অংশ স্তম্ভযুক্ত ছাদ বা চাঁদনী দ্বারা আবৃত ছিল। চাঁদনীর প্রস্তর গাঁথনীর চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে

বর্ত্তমান আছে এবং তৎসন্নিহিত একখণ্ড ভূমি এখনও চাঁদনীচক নামে অভিহিত হইতেছে।

দীঘির উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বের পাড়ের উপরিভাগে চারিটি দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ পার্শ্বেও তিনটি শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত দেউল ছিল। এই তিনটি দেউলের ভগ্নাবশেষ তিনটি কঙ্করস্তর-মণ্ডিত বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। দৈব-প্রভাব-ভীতি লোকের মনে অত্যন্ত প্রবল থাকায় বহুকাল কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের এক খানি প্রস্তর গ্রহণ বা স্থানচ্যুত করিতে সাহস না করায় ঐ স্তূপী-কৃত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মন্দিরের অবশিষ্টাংশ যে কিরূপ ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না; কয়েক বৎসর হইল নিকটবর্ত্তী ধীতপুর গ্রামের জমিদার মহাশয়েরা একটি নূতন বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্তূপের মধ্যে সর্ব্বোত্তরাংশের স্তূপটি খনন করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় দেখা গিয়াছিল যে, একটি সুগভীর সমচতুষ্কোণ বৃহদায়তন প্রস্তর স্তম্ভের উপর উক্ত মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ স্তম্ভ বা মঞ্চের কোণচতুষ্টয় লৌহপাত দ্বারা সংযোজিত ছিল এবং প্রস্তরগুলি অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রস্তর মধ্যে একটি পাষাণময়ী দীর্ঘকায়া ভগ্ন হস্তপদ দশভুজা মূর্ত্তি ও একখণ্ড শিলালিপি পাওয়া গিয়াছিল। বহুকালের লিখিত প্রস্তর ফলকটির অক্ষরগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় এক্ষণে উহার পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। জমিদার মহাশয়েরা ধীতপুর ভবনস্থ কুলদেবতা রঘুনাথ জীউর মন্দিরের ভিত্তির উপরিভাগে উক্ত প্রস্তর ফলকখানি সংস্থাপিত করিয়াছেন। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিটীও উক্ত মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। কথিত আছে, ষোলাদীঘির মধ্যস্থলে একটি মন্দির আছে এবং সেই মন্দিরে এক দেবতা আছেন। ঐ মন্দির ও দেবতা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী

লোক মুখে শ্রুত হওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে সেই সকল কথা উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ঘোলাদীঘির বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়; আবর্জ্জনা ও পঙ্কে পরিপূর্ণ। খড়্গপুর পরগণার মধ্যে বারবাটীয়া ও কৌশল্যা নামেও দুইটি সুবৃহৎ ও সুরম্য সরোবর আছে।

খড়্গপুর থানার মধ্যে বলরামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 'আড়াসিনী গড়' ও 'অযোধ্যা গড়' বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাল বিবর্ত্তনে রাজবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গড়ের পূর্ব্ব শ্রী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যা গড়ের মধ্যে 'জোড় বাঙ্গালা' ও 'পঞ্চরত্ন' নামে প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটি মন্দির আছে। রাজা বীরসিংহের বংশধর রাজা সুরথ সিংহের কুলদেবতা সিংহবাহিনী জোড় বাঙ্গালায় অধিষ্ঠিতা ছিলেন এবং পঞ্চরত্ন মন্দিরটী শ্যামসুন্দর জীউ বিগ্রহের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা সুরথ সিংহের মৃত্যুর পর দুইটি মন্দিরই বলরামপুর রাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; বলরামপুরের অন্যতম রাজা শত্রুঘ্ন মহাপাত্র দেবতা দুইটির সেবা পূজার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে এখনও প্রতিদিন অনেক অতিথি, অভ্যাগত এইস্থানে প্রসাদান্ন পাইয়া থাকে। ইহা বলরামপুরের ঠাকুর বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ।

বলরামপুর গড়।

খড়্গপুর থানার অন্তর্গত কলাইকুণ্ডা গ্রামে ধারেন্দার প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ছিল। বাঘাসিনী দেবী এই রাজবংশের কুল দেবতা। একটী হস্তীর উপর সিংহ এবং তদুপরি প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তি। মহেশপুর নামক গ্রামের সন্নিকটে যমুনাদীঘি নামক যে পুষ্করিণীটী দৃষ্ট হয় উহা এই বংশের তৃতীয় রাজা খড়্গ সিংহ পালের সময়ে খোদিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এই

কলাইকুণ্ডা গড়।

বংশের অন্যতম রাজা প্রতাপনারায়ণ পাল তাঁহার সহোদরার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ উক্ত পুষ্করিণী মেদিনীপুরের স্বনামধন্য পুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় দেওয়ান চন্দ্রশেখর ঘোষের পিতামহ নন্দকিশোর ঘোষকে প্রদান করেন। অপরিশোধ্য ঋণের দায়ে ধারেন্দার প্রাচীন রাজবংশের জমিদারী এক্ষণে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যথাস্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

খড়্গপুর থানার অন্তর্গত জকপুর গ্রামে সদর কাননগো পদে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'মহাশয়' বংশের বাস ছিল। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। এই সদর কাননগো পদের ও মহাশয় বংশের বিস্তারিত বিবরণ 'জমিদার বংশ'-শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এই বংশের পূর্ব্বের বিত্ত বিভবের বা ধন সম্পত্তির বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু নবাবী আমলে ইহাঁদের যেরূপ সম্মান, আশবাব-পত্র ও অট্টালিকাদি ছিল মেদিনীপুরের তৎকালীন কোন জমিদারেরই সেইরূপ ছিল না। তাহাদের পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতে এক্ষণে কয়েকটী পঙ্ক পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ পুষ্করিণী, কয়েকটী ভগ্ন দেব মন্দির ও কারুকার্য্য খোদিত কয়েকটী প্রকাণ্ড জীর্ণ অট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীগণের মধ্যে যক্ষেশ্বর ও গনেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই দুইটি দেবমূর্ত্তি ও দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। যক্ষেশ্বরের নামেই স্থানটীর নাম যক্ষপুর বা জকপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামখানির চকগণেশ নামকরণ হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মন্দির দুইটি লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন ও মূর্ত্তি দুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

জকপুর ও মালঞ্চ।

জকপুরের নিকটবর্ত্তী মালঞ্চ গ্রামেও মহাশয় বংশের এক শাখা

এক্ষণে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে যে প্রাচীন কালী মন্দিরটী আছে উহা ঐ বংশের সন্তান গোবিন্দরাম রায় কর্ত্তৃক ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণায় 'ভুড়ভুড়ি কেদার' বা চপলেশ্বর নামে এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তাঁহারই নামে ঐ পরগণার নাম কেদার বা কেদারকুণ্ড হইয়াছে। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগে কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দৃষ্ট হয়। স্নুতরাং তাহারও পূর্ব্ব হইতেই যে ঐ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বলা যাইতে পারে। জনশ্রুতি, রাজা যুগল-কিশোর রায় নামক এই স্থানের জনৈক প্রাচীন জমিদার উহার প্রতিষ্ঠাতা।

ভুড়ভুড়ি কেদার।

মহাদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটি কুণ্ড বা জলাশয় আছে। কুণ্ডটির জল কখনও শুষ্ক হয় না। নিরন্তর উহার মধ্য হইতে 'ভুড় ভুড়' শব্দে জল-বুদ্বুদ উত্থিত হইতেছে। উহারই অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র জলস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ক্ষীরাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহার সহিত এই কুণ্ডটির কোন প্রকার যোগ থাকায় ঐরূপ জল-বুদ্বুদ উত্থিত হইয়া থাকে এবং উহার জলও ঐ কারণে কখনও শুষ্ক হয় না। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তরায়ন সংক্রান্তি দিবসে এই কুণ্ডে স্নান করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হন। এই কারণে উক্ত দিবস শত শত বন্ধ্যানারী প্রত্যূষে এইস্থানে স্নান করিয়া চপলেশ্বরের পূজা দিয়া থাকেন। সেই সময় এই স্থানে সাত আট দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বালিচক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে এই স্থানটি অবস্থিত।

ডেবরা থানার দ্বারপাড়া গ্রামে বাশুলী দেবী, কুমরপুর গ্রামে

হাতেশ্বর জীউ ও পুশং গ্রামে খগেশ্বর জীউ নামে তিনটি দেবতা আছেন। জনশ্রুতি, পূর্ব্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর রায়ের বংশের শেষ রাজা মুকুট নারায়ণ রায় বাশুলী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। ঐ স্থানের সুরাদীঘি নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীটীও তাঁহার সময়ে খোদিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হাতেশ্বর জীউ ও খগেশ্বর জীউর মন্দির-প্রাঙ্গনে এক একটি মেলা বসিয়া থাকে।

বাশুলী দেবী, হাতেশ্বর ও খগেশ্বর জীউ।

ডেবরা থানার মধ্যে 'গড় কিল্লা' ও 'আলীশার গড়' নামে দুইটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, গড়কিল্লায় কেদারকুণ্ড পরগণার জমিদার পূর্ব্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর রায় ও রাজা মুকুট নারায়ণ রায় প্রভৃতি বাস করিতেন। উত্তরকালে কাশীজোড়া পরগণার জমিদার রাজা রাজনারায়ণের হস্তে রাজা মুকুট নারায়ণের পরাজয় ঘটিলে উক্ত গড় সমেত সমস্ত কেদারকুণ্ড পরগণা কাশীজোড়া রাজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। তদবধি উক্ত গড়টি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকিয়া এক্ষণে স্মৃতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরিতে কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে তিনটি দুর্গের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গড় কিল্লাটি অন্যতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

গড়কিল্লা ও আলিশার গড়।

আলিশার গড়টি আলি সাহ-নামক জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদার কর্ত্তৃক অনুমান প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামটির নামও আলিশা গ্রাম হয়। আলিসাহর কীর্ত্তিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। গড়টির চতুর্দ্দিকে যে পরিখা ও মৃত্তিকাস্তূপের প্রাচীর ছিল অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর

হইল এই গড়ের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী খনন কালে একটি কূপ বাহির হয়। তন্মধ্য হইতে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের ব্যবহার্য্য কয়েকটী মূল্যবান তৈজস পত্র পাওয়া গিয়াছিল।

সাহাজীউ পীর।

ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণার মাড়তলা গ্রামে সাহাজীউ নামক এক মুসলমান সাধুর আস্তানা আছে। জনশ্রুতি, সাহাজীউ আলি সাহর গুরু ছিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে সাহাপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বিভাগে সাহাপুর মহাল সরকার মান্দারণের অন্তর্ভূ্ত ছিল; তৎপরে সুজার বন্দোবস্তের সময় উহা সরকার গোয়াল-পাড়ার অন্তর্ভূত হয়। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে, সাহাজীউ ও আলী সাহ চারিশত বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সাহাজীউর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও নানাপ্রকার কাহিনী অদ্যাপি এই প্রদেশে প্রচলিত আছে।

তাড়িয়া গ্রামের মাঝি রাজার গড়।

কেশপুর থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তঃপাতি তাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত গড়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এস্থানে মাঝি জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। মাঝি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। ঐ গড়টীও 'বাহির গড়' ও 'ভিতর গড়' নামে দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল। বাহির গড়ের চতুঃসীমার মধ্যস্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় দুই সহস্র বিঘা এবং ভিতর গড়ের মধ্যস্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় দুই শত বিঘা হইবে। ভিতর গড়েই রাজাদের বাসভবন ছিল। তাঁহাদের খোদিত তিন চারিটি বড় বড় পুষ্করিণীও আছে; তন্মধ্যে রেবতা বা রাউতা নামক দীর্ঘিকাতে শেষ মাঝি রাজা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী।

মাঝি রাজাদের রাজত্ব লোপ হইলে ব্রাহ্মণভূম পরগণায় ব্রাহ্মণ রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। মাঝি রাজাদের গড়ের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রসিদ্ধ 'আড়ঢ়া গড়' বিদ্যমান। ঐ গড়ে অবস্থান করিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার মনোহর 'চণ্ডীকাব্য' বিরচন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে এই গড়েরও উল্লেখ আছে :—

ব্রাহ্মণ ভূমের আড়ঢ়া গড়।

"ধন্যরে আঁড়ঢ়ার গড়, বাঁশ করে কড় কড়,
জয় চণ্ডী করে হানা হানি।"

মাঝি রাজার বাহির গড়ের উত্তর সীমায় জয়চণ্ডী ঠাকুরাণীর প্রস্তরময় মন্দির ও পূর্ব্বসীমায় হটনগর মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ অদ্যাপি আছে। 'জমিদার বংশ'-শীর্ষক অধ্যায়ে ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্মণভূম পরগণার উত্তর সীমায় 'নেড়া দেউল' নামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুমান, 'নেড়া' শব্দ রাঢ়া শব্দের অপভ্রংশ। * আমরাও তাহাই মনে করি। নেড়া দেউল চন্দ্রকোণা পরগণার দক্ষিণ সীমায় কোঙাই নদীর পর পারে অবস্থিত। কোঙাই নদীর দক্ষিণ হইতেই ব্রাহ্মণভূম পরগণা আরম্ভ। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, এক সময় মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত চন্দ্রকোণা প্রভৃতি পরগণা রাঢ় দেশের অন্তর্ভূত ছিল এবং উহার দক্ষিণ হইতে উড়িষ্যার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতেও দেখা যায়, সে সময় চন্দ্রকোণা বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের এবং ব্রাহ্মণভূম সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভূত

নেড়া দেউল ও ঝাড়েশ্বর মহাদেব।

* গৌড়ের ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ৬৩।

ছিল। ঐ মন্দিরটী রাঢ় দেশেরই শেষ সীমায় নির্ম্মিত হওয়ায়, উড়িষ্যা হইতে পৃথক করিবার জন্য উহাকে রাঢ়া দেউল নামে পরিচিত করা হইয়া থাকিবে। আর সেই কারণেই, রাঢ় হইতে পৃথক বলিয়া ব্রাহ্মণভূমেরও 'আরাঢ়া ব্রাহ্মণভূম' (রাঢ় নয়) নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যানডেন ব্রুকের মানচিত্রে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমান্তে চিতুয়া বরদার পশ্চিমে মন্দিরাকৃতি একটি চিত্র অঙ্কিত আছে দৃষ্ট হয়। * আমাদের অনুমান উহা ঐ নেড়া দেউল বা রাঢ়া দেউলের চিত্র।

ঝাড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরের নিকটবর্ত্তী কাণাষোল গ্রামে অবস্থিত। চৈত্রমাসে চড়ক পূজার সময় এই স্থানে যে মেলা বসে তাহাতে দেশ বিদেশের বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

গড়বেতা থানার অন্তর্গত গনগনি-ডাঙ্গা, ভিকনগর, একচক্রা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বগড়ীর রাজাদের রাজধানী প্রথমে গড়বেতা গ্রামে ছিল, পরে তাঁহারা গোয়ালতোড় গ্রামে উহা স্থানান্তরিত করেন; এক্ষণে তাঁহাদের অধঃস্তন পুরুষগণ মঙ্গলাপোতা গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে গড়বেতার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্নই নাই। বগড়ীর অন্যতম স্বাধীন নরপতি রাজা তেজচন্দ্রের নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ রায় কোটা দুর্গটী কালে চূর্ণ বিচূর্ণ

গড়বেতার রায় কোটা দুর্গ।

* "West of Barada a monument is drawn to make the frontier between Bengal and Orissa."

Professor Blochman's Notes in Hunters' Statistical Account of Bengal, Vol. I., p, 376.

হইয়া বনগুল্মলতা সমাদৃত প্রস্তর স্তূপে পরিণত হইয়াছে; আর যে সকল বজ্রনিনাদ কামান দুর্গ প্রাকারোপরি সজ্জিত থাকিয়া শত্রু হৃদয়ে ভীতি বিক্ষেপ করিত তাহা ইংরাজ রাজ ঐ স্থান হইতে অপসারিত করিয়াছেন। শিলাবতী নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে গড়বেতার সেই পরিখা বেষ্টিত দুর্গ প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। দুর্গের চারিদিকে উত্তরে লালদরজা, পূর্ব্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা নামে যে চারিটী সুবৃহৎ সিংহদ্বার শোভা পাইত অদ্যাপি দু'এক স্থানে সে গুলির ভগ্নাবশেষ আছে।

গড় বেতার কয়েকটী পুষ্করিণী।

রায় কোটা দুর্গের উত্তর দ্বারের সম্মুখে জলটুঙ্গী, ইন্দ্র পুষ্করিণী, পাথুরিয়া, হাদুয়া, মঙ্গলা, কবেশ দীঘি ও আম্র পুষ্করিণী নামে সাতটি পুরাতান পুষ্করিণী আছে। প্রত্যেক পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে এক একটি প্রস্তর নির্ম্মিত জীর্ণ মন্দির আছে। দুর্গের সান্নিধ্য হেতু অনেকে এই পুষ্করিণী ও মন্দির গুলিকে চৌহান বংশীয় রাজাদিগেরই কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।

গড় বেতার সর্ব্বমঙ্গলা দেবী।

পূর্ব্বোক্ত রায় কোটা দুর্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মহাশক্তি সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরটী গড়বেতার অন্যতম প্রাচীন কীর্ত্তি। কিন্তু কতদিন হইল এবং কাহার দ্বারা যে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠীক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ উহার প্রতিষ্ঠাতা; আবার কেহ কেহ বলেন, উজ্জয়িনীপতি রাজা বিক্রমাদিত্য যখন মধ্যভারতেয় শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেন সেই সময় জনৈক সিদ্ধ পুরুষ বগড়ীর বনপ্রদেশে এই দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীর অলৌকিক শক্তির বিষয় লোকমুখে অবগত হইয়া গরবেতায় সমাগত হ'ন এবং দেবীর মন্দির

মধ্যে শব সাধনে নিরত হ'ন। দেবী তাঁহার সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাল বেতাল নামক অলৌকিক তেজ সম্পন্ন দুই অনুচরের উপর আধিপত্যলাভের অধিকার প্রদান করেন। রাজা আপন সফলতা প্রত্যক্ষাভূত করিবার মানসে দেবীর অনুমতি ক্রমে তাল বেতালকে মন্দির-দ্বার পূর্ব্ব দিক হইতে উত্তর দিকে পরিবর্ত্তিত করিবার আদেশ করিবামাত্র উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জনশ্রুতি, সেই কারণে সর্ব্ব-মঙ্গলা দেবীর মন্দিরের দ্বার উত্তর দিকে অবস্থিত; সচরাচর কোন হিন্দু মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না।

উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য এ প্রদেশে আসিয়া শব সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দাঁতনের পূর্ব্বোক্ত রাজা বিক্রমকেশরী বা এ প্রদেশের বিক্রমাদিত্য নামে অন্য কোন রাজার সহিত এই কিম্বদন্তীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলা যায় না। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের নাম ভারত বিখ্যাত এবং তাঁহার শব সাধনা ও তালবেতালের কাহিনী তাঁহার নামের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় উত্তরকালে এই সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর উত্তরমুখী দ্বারের কারণটাও তাঁহার তালবেতালের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের গঠন প্রণালী অদ্ভুত; দেখিলে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইতে হয়। দ্বারযোগে মন্দিরের মধ্যে ত্রিশ হস্ত পরিমিত স্থান সুবিস্তীর্ণ সুড়ঙ্গ পথের ন্যায় আলোক বিরহিত পথ অতিক্রম করিয়া গেলে মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে দেবীর তেজময়ী পাষাণমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ও অন্ধকার। আলোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। দেবীর পার্শ্বে দিবারজনী একটি প্রদীপ জ্বালিত হইয়া থাকে। দেবীর বামপার্শ্বে

একটি সুরচিত পঞ্চমুণ্ডী প্রস্তর-আসন আছে। কিম্বদন্তী ঐ আসনে উপবেশন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজা গজপতি প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লভ জীউ।

গড়বেতার কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লভ জীউর মন্দির দুইটিও প্রসিদ্ধ। কামেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী কতকাংশে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের অনুরূপ এবং ইহার সম্বন্ধেও ঐরূপ নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। রাধাবল্লভজীউর মন্দিরটী বগড়ীর অন্যতম রাজা দুর্জ্জন সিংহ মল্ল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বগড়ীর কৃষ্ণরায় জীউ।

গড়বেতার ছয় মাইল উত্তর পশ্চিমে বগড়ীর সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরায় জীউ আছেন। জনশ্রুতি, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় ইহাঁর প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তিকালে বগড়ীর অন্যতম রাজা রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণরায় জীউর পার্শ্বে রাধিকা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল যাত্রার সময় এই স্থানে কয়েকদিন ব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা হয়। সেই সময় বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে বহু সংখ্যক বৈষ্ণব ও অন্যান্য বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ন মন্দির।

গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরের কারুকার্য্য মনোরম। রাজা যাদবচরণ সিংহ কর্ত্তৃক প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা এই মন্দিরে বালচন্দ্র-নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু দৈবগতিকে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে তথায় একটি গোবৎস মৃত হওয়ায় উহা অপবিত্র বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উড়িয়াসাই গ্রামে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত জীর্ণ মন্দির আছে। উহার গাত্রে যে খোদিত লিপিটী আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা চৌহান সিংহের সময়ে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্টিতা দেবী মূর্ত্তি সম্বন্ধেও নানাপ্রকার অদ্ভূত কাহিনী প্রচলিত আছে।

উড়িয়াসাইর মন্দির।

বগড়ী পরগণার মধ্যে আরও কয়েকটী মন্দির ও দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রাজ্যধর রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোয়ালতোড়ের সনৎকুমারী বাগবীজ গোস্বামী নামক জনৈক সাধু পুরুষ কর্ত্তৃক প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। পাথরবেড়া গ্রামের রঘুনাথ জীউ, কাদড়ার চমৎকারিণী দেবী ও মেড়রা শিরোমণিপুরের বৃক্ষমূলের ভৈরবী মূর্ত্তি ও প্রসিদ্ধ। চমৎকারিণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় নাই; কেহ কেহ বলেন, শিরোমণিপুরের ভৈরবী মূর্ত্তিটীকে উপেন্দ্র ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে অন্য স্থান হইতে লইয়া আসিয়া উক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। রত্নাবলা ব্যাকরণ, রাস কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা এবং পদাঙ্ক দূত, ষটপদী প্রভৃতি গ্রন্থের টীকাকার স্বর্গীয় পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বগড়ীর অন্য কয়েকটী মন্দির।

গড়বেতা থানার অন্তর্গত ঝালদা গ্রামের অদূরস্থ নয়াবসাতের ভগ্ন দুর্গটীও বগড়ীর রাজবংশের অন্যতম কীর্ত্তি। রাজা গনপতি সিংহের সময়ে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। জামলা সেতু নির্ম্মাণের সময় ঐ স্থান হইতে অনেক প্রস্তর লইয়া যাওয়া হয়। এখনও তথায় অনেক প্রস্তর রহিয়াছে। গড়বেতা থানার এই সকল মন্দির, পুষ্করিণী ও দুর্গাদির অধিকাংশই এক্ষণে বগড়ীর বর্ত্তমান

ঝালদার দুর্গ।

জমিদার কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সম্পত্তি।

পাঁশকুড়া থানায় কাশীজোড়ার প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ছিল। তাহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন অদ্যাপি ঐ থানার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। শুরা গ্রামের যামিনী দীঘি-নামক পুষ্করিণী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা যামিনীভানু রায়ের সময় খোদিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় প্রতাপপুর নামক গ্রাম স্থাপন করেন এবং হরশঙ্কর-নামক গ্রামে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কৃষ্ণরায়জীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ বংশের অন্যতম রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চাঁচিয়াড়া গ্রামের মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা জিতনারায়ণ রায় চাঁচিয়াড়া গ্রামের সঙ্গত ও ফকিরগঞ্জ গ্রামের জিত-সাগর জলাশয়ের প্রতিষ্ঠাতা। জয়পাটনা গ্রামের জয়চণ্ডী, প্রতাপপুরের অনন্ত বাসুদেব, দেড়াচকের গোবর্দ্ধনধারী, খসরবনের গোপাল জীউ এবং রঘুনাথ বাড়ীর রঘুনাথ জীউ এই রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যথাস্থানে কাশীজোড়া রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।

পাঁশকুড়া থানার কাশীজোড়া রাজ্য।

এই জেলার পশ্চিম সীমান্তে বীণপুর থানায় কানাইসর নামে একটি পাহাড় আছে। এতদ্ অঞ্চলের পাহাড় কয়টির মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে এই পাহাড়টীর দুইবার পূজা হয়। তদুপলক্ষে বাঁকুড়া, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি জেলা হইতে লোক আসিয়া থাকে। গিরি-শৃঙ্গের দৃশ্য অতি মনোরম। সেখানে নানা প্রকার অদ্ভুত ও বিচিত্র পুষ্পোদ্যান দৃষ্ট হয়। তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষও আছে। শিখর দেশ বিস্তৃত; তন্মধ্যে মাত্র ছয় বিঘা ভূমি উদ্ভিদ বর্জ্জিত সমতল ক্ষেত্র। অবশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশ ষাট

কানাইসর পাহাড়।

বিঘা ভূমি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ। একস্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, বহুকাল পূর্ব্বে ঐ স্থানেই পাহাড়ের পূজা হইত। কিন্তু বলিদানের পর তথায় আর কাহারও থাকিবার বা যাইবার অধিকার ছিল না। এক সময় পূজক বলির খড়্গটী আনিতে ভুলিয়া গিয়া পুনরায় যখন উহা আনিবার জন্য উপরে গমন করেন, তখন দেখেন যে, দেবতা তথায় দুইটি ব্যাঘ্র লইয়া উপবিষ্ট আছেন। দেবতার প্রত্যাদেশ হয়, 'আর কখনও এইস্থানে আসিও না— এবার হইতে নীচে পূজা করিও।' তদবধি আর উপরে পূজা হয় না বা সচরাচর কেহ উপরে উঠেও না। দেবতার আদেশে হউক বা না হউক, ব্যাঘ্রের ভয়েই যে পূজকগণ আর অত উচ্চে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের জীর্ণ মন্দিরে বসিয়া পূজা করিতে সাহসী হন নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পাহাড়টীর সানুদেশে 'দে হরির স্থান' নামে একটি প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় কতকগুলি বড় বড় প্রস্তর আছে। এক্ষণে পূজা প্রথমে সেইস্থানে হয়; তৎপরে পাহাড়ের পূর্ব্বদিক দিয়া উপরে উঠিবার যে পথ আছে, সেই পথে কিয়দ্দূর উঠিলে যে স্থানে উপনীত হওয়া যায় উহাই পূজার দ্বিতীয় স্থান। স্থানটী অত্যন্ত ঢালু বলিয়া বেশী লোক একত্র তথায় থাকিতে পারে না। একদল নামিয়া আসিলে আবার একদল উপরে যাইতে পারে। পূজার স্থানে প্রায় শত হস্ত দীর্ঘ এবং প্রায় পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও তদনুরূপ উচ্চ একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। উহার মধ্য দিয়া একটি গর্ত্ত আছে; পূজা শেষ হইলে যাত্রিগণ ঐ গর্ত্তের উপরে আমলকী ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নে হাত পাতিয়া থাকে। পূজারী বলেন, উক্ত আমলকী ও পুষ্প যত শীঘ্র যাহার হস্তে পতিত হয় তাহার মনস্কামনা তত শীঘ্র পূর্ণ হইয়া থাকে। আর যাহার হস্তে একবারে পড়ে না—তাহার মনস্কামনাও সিদ্ধ হয় না।

পর্ব্বত-গাত্রে একটি কূপ আছে। উহার গভীরতা মাত্র দুই তিন হাত হইলেও উহার সঙ্গে একটি ঝরণার সংযোগ থাকায় মেলার সময় পাঁচ ছয় হাজার লোক জলপান করা সত্বেও উহার জল সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে; জলও পরিষ্কার।

বীণপুর থানার মধ্যে রামগড় ও লালগড় রাজবংশের গড়বাড়ী অবস্থিত। 'জমিদার বংশ'-শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে। শিলদা গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে শিলদার প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহারই অনতিদূরে ভৈরব-ডাঙ্গা নামক স্থানে ভৈরব-নামক এক দেবতা আছেন। যে ভগ্ন মঞ্চটীর প্রস্তর-স্তূপের উপর ভৈরব আছেন ঐ স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে মনে হয়—এক সময় সেখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। কালে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে। জনশ্রুতি, শিলদার ঐ প্রাচীন রাজবংশ শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই কারণে, ঐ অঞ্চলের নানাস্থানে শিবলিঙ্গ ও প্রস্তর নির্ম্মিত ছোট ও বড় ষণ্ড মূর্ত্তি যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ওড়গোঁদা গ্রামের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও একটি সুবৃহৎ প্রস্তরময় ষণ্ড আছে। উহা এরূপ সুন্দরভাবে নির্ম্মিত যে, কতকাল ঐরূপ অযত্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকা সত্বেও এখনও প্রথম দেখিলে উহাকে জীবন্ত ষণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। পরবর্ত্তিকালে যে রাজবংশ এ প্রদেশে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শিলদা গ্রামে বাস করিতেন। 'শিলদার বাঁধ' নামক সুপ্রসিদ্ধ জলাশয়টী তাঁহাদেরই কীর্ত্তি। তাঁহাদের বংশ বিবরণও যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 'মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানী' এক্ষণে শিলদার জমিদার। বেল পাহাড়ী গ্রামে তাঁহাদের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

রামগড়, লালগড় ও শিলদা।

ঝাড়গ্রাম থানার মধ্যে ঝাড়গ্রাম ও জামবনীর গড় দুইটিও প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে ঝাড়গ্রাম গড়ের চতুর্দ্দিকেও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার ও পরিখা ছিল। এই গড়ের মধ্যে ঝাড়গ্রাম রাজবংশের কুলদেবতা এবং রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গায়ত্রী দেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটী একটি পুরাতন সরসী তটে সংস্থাপিত। উহার নির্ম্মাণ কৌশল ও অবস্থা দেখিলে উহাকে একটি প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। জামবনী রাজবংশের গড়-বাড়ী সাধারণতঃ 'চিল্কী গড়' নামে পরিচিত।

ঝাড়গ্রাম ও জামবনী গড়।

ঝাড়গ্রাম গড়ের দুই মাইল অন্তরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগালষণ্ড দেব বাহাদুরের নির্ম্মিত 'মেলা বাঁধ' ও 'কেরেন্দার বাঁধ' নামে দুইটি বৃহৎ জলাশয় আছে। নিদারুণ নিদাঘকালে যখন এই প্রদেশের চারিদিকেই ভীষণ জলকষ্ট হয় তখনও এই দুইটি জলাশয়ে অগাধ জল থাকায় এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকেই এই জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করে।

মেলা বাঁধ ও কেরেন্দার বাঁধ।

ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তের মাইল দূরে চন্দ্রী নামে একটি বৃহৎ গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে চন্দ্রশেখর নামে এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই মহাদেবের প্রকাশ সম্বন্ধেও এ প্রদেশে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। চন্দ্রশেখর মহাদেবের নাম হইতেই গ্রামটীর নাম চন্দ্রী হইয়াছে। ঝাড়গ্রামের রাজগণ দেবসেবার জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন এবং সমস্ত গ্রামখানি গ্রামবাসীদিগকে নিস্কর ভোগ করিতে দিয়া

চন্দ্রী গ্রামের চন্দ্রশেখর মহাদেব।

গিয়াছেন। চন্দ্রী গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে মহাসমারোহে চড়ক পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাজদহ মাতা।

ঝাড়গ্রাম পরগণার মধ্যে 'রাজদহ মাতা' নাম্নী এক দেবী আছেন। ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে এই দেবীর অবস্থিতি স্থান দৃষ্ট হয়। দেবীর অবস্থাপিত স্থানের নিকটেই একটি জলস্রোত নিরন্তর উজ্জীবিত হইতেছে। এই জলস্রোত হইতেই পরগণার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম রাজ্যের প্রজাদের বিশ্বাস কোন বৎসর এদেশে অনাবৃষ্টি হইলে দেশাধিপতি রাজা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে দেবীকে অর্চ্চনা করিলে দেশমধ্যে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে।

দ্বিপাকিয়ারচাঁদের প্রস্তর-স্তম্ভ।

গোপীবল্লভপুর থানায় কয়েকটী প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আছে। এই থানার অন্তর্গত কুলটিকরী গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে প্রায় পাঁচ ছয় শত প্রস্তর-স্তম্ভ স্থানে স্থানে প্রোথিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, দেখা যায়। সেগুলি উচ্চে আড়াই ফিট হইতে চার ফিটের বেশী নয়। উহাদের মস্তকভাগ গোলাকৃতি, অনেকটা মনুষ্যের মস্তক ও গ্রীবাদেশের অনুরূপ এবং অধঃভাগ সাধারণ স্তম্ভের ন্যায়। আসামের নাগা পর্ব্বতে ও ছোট-নাগপুরের স্থানে স্থানেও এইরূপ প্রস্তর-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম নিবাসিগণের কীর্ত্তি। তাহারা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর এইরূপ সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জহর সিংহ নামক এ প্রদেশের জনৈক রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে

এইরূপ প্রায় সহস্র স্তম্ভ সংগ্রহ করিয়া কিয়ারচাঁদ প্রান্তরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। দূর হইতে দেখিলে এইগুলিকে দণ্ডায়মান মনুষ্য বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কিম্বদন্তী, শত্রুপক্ষের মনে তাঁহার জনবল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে জহর সিংহ ঐগুলিকে উক্ত স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে?

রামেশ্বর নাথের মন্দির।

খেলাড় নয়াগ্রাম পরগণায় সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণকূলে দেউলবাড় গ্রামে রামেশ্বর নাথের একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে। মন্দিরটী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর উৎকল দেশীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত। উহার উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফিট। ছাদে এবং দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার চিত্র ও কারুকার্য্য আছে। মন্দির মধ্যে সহস্রলিঙ্গ নামে এক মহাদেব আছেন। জনশ্রুতি, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের অন্যতম রাজা চন্দ্রকেতু স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া এই স্থানে ঐ মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও নয়া-গ্রামের বর্ত্তমান রাজবংশের ব্যয়েই দেবসেবা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তী ও গঙ্গা বারুণীর সময় ঐস্থানে প্রতি বৎসর বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে।

তপোবন।

রামেশ্বর নাথের মন্দিরের প্রায় দুই মাইল অন্তরে নিবিড় অরণ্য মধ্যে তপোবন নামক একটি স্থান আছে। তথায় একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়। উহার নিকট দিয়া সীতা খাল নামক একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই স্থানেই মহর্ষি বাল্মিকীর তপোবন ছিল; সীতাদেবী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে লক্ষ্মণ

এইখানেই তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন; লব কুশের জন্ম এই স্থানেই হইয়াছিল। বলা বাহুল্য রামায়ণ বর্ণিত মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের সহিত এই তপোবনের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য যে অতি মনোরম এবং উহা তপোবনেরই উপযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে অরণ্য মধ্যে প্রাচীন কালের তপস্বিগণের তপোনুষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রাচীন লোকের মুখে শ্রুত হওয়া যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা ঐ অরণ্য মধ্যে দুই চারিজন সাধু সন্ন্যাসীকে নির্জ্জনে সাধনা করিতে দেখিয়াছেন। অরণ্য-জাত ফল, মূল ও নির্ঝরিণীর জল পান করিয়াই তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। লোকালয়ের সঙ্গে তাঁহাদের একপ্রকার কোন সম্বন্ধই ছিল না।

নয়াগ্রামের খেলাড় গড়টি নয়াগ্রাম রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর-নির্ম্মিত সুবৃহৎ রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া গড়টীর চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর ও সুগভীর পরিখা ছিল। এক্ষণে সেই রাজবাটী প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, গড়খাই ভরিয়া গিয়াছে, কেবল প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ও তোরণ দ্বারটী প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া আছে। এই গড়ের অভ্যন্তরে নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি অশ্বপৃষ্ঠে একত্রোপবিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তি আছে। সচরাচর এরূপ অশ্বারূঢ় যুগলমূর্ত্তি দেখা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে পারসীক বা শক প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, ইহার গঠন প্রণালী অনেকাংশে আরবের প্রাচীন বিধ্বস্ত নিনিভ নগরীর স্তূপ-গর্ভে প্রাপ্ত মূর্ত্তির অনুরূপ আমরা কিন্তু উহাকে আমাদের এই ভারতবর্ষেরই সম্পত্তি—আমাদেরই

খেলাড় গড়।

কামদেব ও রতিদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া মনে করি। পুরুষ মূর্ত্তিটীর হস্তস্থিত তীর ধনুক কামদেবের ফুলশরের কথাই স্মরণ করিয়া দেয়। মানভূম জেলার অনেক মন্দিরের সম্মুখেও এরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়। এ সকল মূর্ত্তি খুব বেশী প্রাচীন কালের নয়।

নয়াগ্রাম পরগণায় চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। মেদিনীপুর জেলায় যতগুলি প্রাচীন গড়ের চিহ্ন আছে তন্মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। গড়টীর দৈর্ঘ্য প্রস্থের ভূমি পরিমাণ ১০৫০ × ৭৮০ গজ। ইহার বাহিরে যে পরিখাটী ছিল তাহার দৈর্ঘ্য প্রত্যেক দিকে প্রায় এক মাইল। সুবিস্তীর্ণ কঙ্করময় কঠিন ভূমির উপর এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, কুড়ি পঁচিশ ফিট প্রস্থ এবং বার তের ফিট গভীর ঐ পরিখাটী খনন করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়া থাকিবে। পরিখাটীর ভিতর পার্শ্ব হইতেই গড়ের চতুর্দ্দিকে পনর ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর-প্রাচীর ছিল। তৎপরে আর একটি ক্ষুদ্র পরিখা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। সাড়ে পাঁচ ফিট দীর্ঘ, দুই ফিট প্রস্থ এবং দেড় ফিট উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা এই সকল গৃহ ও প্রাচীরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গড়টীর চারিদিক এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীর ও অট্টালিকাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরিখাতে এখন আর জল নাই—অধিকাংশ স্থান ভরিয়া গিয়াছে। পরিখার বাহিরে এক স্থানে 'গড় দুয়ার'-নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে, সেখানে কতকগুলি সাঁওতাল বাস করিতেছে। জনশ্রুতি, ঐস্থানেই চন্দ্ররেখা গড়ের প্রধান প্রবেশ-দ্বার ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ (কেহ কেহ বলেন চন্দ্রশেখর সিংহ) কর্ত্তৃক এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা ও

চন্দ্ররেখা গড়।

খেলাড় গড় নয়াগ্রামের বর্ত্তমান জমিদার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সম্পত্তি।

গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দজীউর মন্দিরটী এ প্রদেশে সুপ্রসিদ্ধ। গোবিন্দজীউ বা গোপীবল্লভ জীউর নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। গোপীবল্লভপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশ এই মন্দির ও মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের বংশেরও বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত হইবে। স্নান পূর্ণিমার সময় ঐ স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং সেই উপলক্ষে নানাস্থানের বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের সমাবেশ হইয়া থাকে। পশ্চিম-বঙ্গের এবং উড়িষ্যার নানাস্থানেই গোপীবল্লভপুরের গোবিন্দ জীউর সম্পত্তি আছে এবং গোস্বামী বংশের শিষ্য আছে।

গোবিন্দ জীউর মন্দির।

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ভূতপূর্ব্ব সব্ ডেপুটী কালেক্টর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ মহাশয় মেদিনীপুর জেলায় সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, নয়াগ্রামের নিকটবর্ত্তী কমলপুর গ্রামের সুবর্ণরেখার নদীর গর্ভে বালুকা প্রোথিত অবস্থায় একটি প্রস্তর মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। মূর্ত্তিটী খণ্ডিত। চালি, মস্তক, মুখ, গলদেশ ও দক্ষিণ বাহু একবারেই নাই। বাম বাহু, পদদ্বয় মধ্যস্থ মূর্ত্তি ও উভয় পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের মুখ ভগ্নাবস্থায় আছে। তলদেশের অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে মাঝের ও বাম দিকের মূর্ত্তিগুলি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। ইহা সূর্য্য বা আদিত্য মূর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু এই জেলার কোন স্থানে সূর্য্য মন্দির নাই বা কখনও ছিল বলিয়াও তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এরূপ মূর্ত্তি এই জেলার অন্য কোন স্থান হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্থানীয় অশীতিপর বৃদ্ধেরাও এইরূপ মূর্ত্তি

কমলপুরে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তি।

সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে নাই বা ইতিপূর্ব্বে ইহা কথনও দেখিয়াছে বলিয়াও স্বীকার করে না।

কর্ণেল ডাল্‌টন ও বেলগার কর্তৃক বিবৃত মানভূম জেলার সুবর্ণরেখার তীরবর্ত্তী ডালমী নামক স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, তথায় আদিত্য মূর্ত্তি এবং কামদেব ও রতী মূর্ত্তি ছিল। এখনও সেখানে তাহার নিদর্শন আছে। এই কারণে সত্যেশ বাবু অনুমান করেন যে, ঐ মূর্ত্তিটী ও খেলাড়গড়ের অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তিটী মানভূম জেলা হইতেই এখানে আসিয়া পড়িয়াছে ; এ গুলি ডালমীর অসংখ্য ভগ্ন মন্দিরের কোন না কোনটিতে এককালে স্থাপিত থাকাই সম্ভব। সুবর্ণরেখা নদী মানভূম প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া এই জেলার পশ্চিমোত্তর প্রান্তে নয়াবসান নামক পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া নয়াগ্রাম প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান, এই সুবর্ণরেখার জল প্রবাহই ঐগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে। *

কেশিয়াড়ীর সর্ব্বমঙ্গলা।

কেশিয়াড়ী থানার প্রাচান কীর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভবানীপুরের মঙ্গলামাড়ো পল্লার মধ্যস্থলে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরটী অবস্থিত। ঐ মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূমি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত প্রাচীরের দ্বারা তিনটি অংশ বা মহালে বিভক্ত। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার পশ্চিমে সিংহ-দ্বার। সিংহ-দ্বারের সম্মুখে বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মসৃণ দেহ প্রকাণ্ড ষণ্ড বর্ত্তমান। এই ষণ্ডের সম্মুখস্থ পদদ্বয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহাও কালাপাহাড়ের অত্যাচারের চিহ্ন বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। মন্দিরে উঠিয়া

* ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ—১৩২৩।

সিঁড়ীর দুই পার্শ্বে দুইটি নয় ফিট উচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ আছে। সিঁড়ীতে উঠিলেই প্রথমে বারদুয়ারী-নামক বারটী খিলানযুক্ত নাট্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। উহার সম্মুখের দেওয়ালে উড়িয়া ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, শাহ সুলতান নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া যখন কেশিয়াড়ীর রাজস্ব কেন্দ্রের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারই অধীনস্থ সুন্দর দাস নামক জনৈক কর্ম্মচারী ও অর্জ্জুন মহাপাত্র নামক দেওয়ান বা সেরেস্তাদারের তত্ত্বাবধানে বনমালী দাস নামক স্থানীয় রাজমিস্ত্রী উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উক্ত শিলা-লিপিটি ১৫৩২ শকাব্দায় বা ১৬১০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ।

বারদুয়ারীর মধ্য দিয়া জগমোহনে প্রবেশ করিতে হয়। এই জগ-মোহন মন্দিরে দেবীর সমস্ত বাহ্য পূজার কার্য্য অর্থাৎ দুর্গোৎসব, কালীপূজা ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে নৈমিত্তিক পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোমা-দির কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইখানে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড গণেশ, একটি দ্বিভুজ ত্রিশূল খড়্গধারী মহাকাল এবং চতুর্ভুজা ত্রিশূল-ধারিণী অসুরনাশিনী একটি কালভৈরবী মূর্ত্তি বিদ্যমান। উড়িষ্যায় প্রায় সকল প্রাচীন মন্দিরেই এইরূপ এক একটি জগমোহন দেউল মূল দেউলের সংলগ্ন আছে দেখা যায়। এই জগমোহন দেউলগুলি দেবতার শ্রীমন্দির অপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য সম্পন্ন ও মনোমুগ্ধকারী। ঐগুলি দেখিবামাত্রই দর্শকের মনঃ বিমোহিত হয় বলিয়াই বোধ হয় উহাদের জগমোহন নাম হইয়াছে।

জগমোহন হইতে দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর উপর প্রস্তর-নির্ম্মিতা প্রৌঢ় বয়স্কা, সিন্দুর-লিপ্ত বদনা দ্বিভূজা সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি। দেবীর দক্ষিণ পদ বেদীর নিম্নে সিংহের

মস্তকে এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপিত। তাঁহার মস্তকে বৃহৎ স্বর্ণ মুকুট, দুই কর্ণে সুবর্ণের ফুল মাকড়ী ও দুই হস্তে বিবিধ সুবর্ণালঙ্কার আছে। দেবীর দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্চে ঐরূপ প্রস্তর-নির্ম্মিত সিন্দুর-চর্চ্চিত জয়া বিজয়া মূর্ত্তি।

মঞ্চের উপর বাম পার্শ্বে এই মূর্ত্তিত্রয়ের অনুরূপ 'বিজয় মঙ্গলা' নামে পিত্তল নির্ম্মিত আর তিনটি মূর্ত্তি ক্ষুদ্র একটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি প্রস্তর বেদীর সহিত সংলগ্ন বলিয়া কোন পর্ব্বোপলক্ষে দেবীকে মন্দিরের বাহিরে জগমোহনে লইয়া যাইতে হইলে এই বিজয় মঙ্গলা মূর্ত্তিই বাহির হ'ন। এই বিজয় মঙ্গলা মূর্ত্তির পাদদেশে এবং পূর্ব্বোক্ত জগমোহন মন্দিরের দেওয়ালে উড়িয়া ভাষায় যাহা লিখিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে,এই ভূভাগে রঘুনাথ শর্ম্মা নামক ভূঞা উপাধিধারী কোন জমিদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র চক্রধর ভূঞা ১৫২৬ শকাব্দায় (১৬০৪ খৃঃ অঃ) মহারাজ মানসিংহের তিন অঙ্কে সোমবারে দেবী মন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হরিদাস নামক জনৈক ব্যক্তি সেই জমিদারের করণ বা কর্ম্মচারী ছিলেন এবং রঘুনাথ কামিলা (কর্ম্মকার) ও বাসুরাম কারিকর (রাজমিস্ত্রি) যথাক্রমে বিজয় মঙ্গলা মূর্ত্তি ও জগমোহন মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভূঞা বংশের কথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে বৌদ্ধ প্রভাবও বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কালভৈরবের মূর্ত্তির গঠন প্রণালী বৌদ্ধ যুগের মূর্ত্তি গঠনের অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, দেবী মন্দিরের সম্মুখেই যূপ কাষ্ঠ স্থাপিত ও সেই স্থানেই পশু বধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থানের প্রথা স্বতন্ত্র। দেবীর মূল মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে

প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে। সেখানে সাধারণের দৃষ্টি সহজে পতিত হয় না। ঐ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অর্গল ও তাহার নিকটে উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি খর্পর খোদিত আছে। বলি-যোগ্য পশুকে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে লইয়া যাওয়া হয়, তৎপরে একটি দ্বার পথে পূর্ব্বোক্ত বেষ্টিত স্থানে লইয়া গিয়া উৎসর্গীকৃত করা হয়। ছেদিত পশুর রক্ত মাংস খর্পরে রাখিয়া সেই স্থানেই দেবীকে নিবেদন করা হইয়া থাকে। এইজন্য মনে হয় যে, বৌদ্ধ ভাব দূরীভূত হইয়া তন্ত্রের প্রভাব সর্ব্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সর্ব্বমঙ্গলা দেবী দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহারা ইহাঁর সেবা পূজার জন্য অনেক অর্থ ও অলঙ্কারাদি দিয়া গিয়াছিল।

সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে কাশীশ্বর নামে এক শিব আছেন। এই শিব মন্দিরে কোন শিলালিপি নাই। শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভূ। যে প্রস্তর খানির একাংশের উপর মন্দির উঠিয়াছে, তাহা হইতে খোদাই করিয়াই শিব ও শক্তি বাহির করা হইয়াছে। কাশীশ্বর ব্যতীত কপিলেশ্বর, নমোজ প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ কেশিয়াড়ীতে আছেন। এক সময় এই শিবালয়গুলিতে অতি সমারোহে চড়ক পূজা হইত এবং সেই উপলক্ষে নানাপ্রকার সং ও মিছিল বাহির হইত। ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে দেশের লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাওয়ায় এবং লোকের অবস্থার বৈগুণ্যে এখন সে সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কাশীশ্বর ও কপিলেশ্বর মহাদেব।

কেশিয়াড়ী গ্রামের নিকটবর্ত্তী তলকেশরী পল্লীতে জগন্নাথ দেবের একটি পুরাতন উচ্চ মন্দির আছে। মন্দিরটী ইষ্টক

নির্ম্মিত ও প্রাচীন গঠন। উহাতে পুরীর অনুকরণে ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত এবং আকারেও সেগুলি প্রায় পুরীর শ্রীমূর্ত্তির সমকক্ষ। জনশ্রুতি, এই স্থানের ঘোষবংশীয় জনৈক ধনশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময় একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীও খনন করিয়া দিয়াছিলেন; তাহা অদ্যাবধি 'ঘোষ পুকুর' নামে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ মহাত্মার পরিচয় সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। কেশিয়াড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী গগনেশ্বর গ্রামে ঘোষ উপাধিধারী এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের বাস আছে। কবি ও গায়ক চৌধুরী শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ঐ মন্দিরটী ঐ ঘোষ বংশেরই কোন পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।

জগনাথ দেবের মন্দির ও গুণ্ডিচা বাড়ী।

ঐ মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অরণ্য মধ্যে জগন্নাথ দেবের "গুণ্ডিচা বাড়ী"। উহা একবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল কাশীনাথ সাউ নামক জনৈক স্থানীয় মহাজন উহা মেরামত করিয়া দিয়া এবং উৎসবোপযোগী ইষ্টক নির্ম্মিত অতি প্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। রথের দিন হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত অষ্টাহ কাল সেই স্থানে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

কেশিয়াড়ীর প্রায় তিন মাইল অন্তরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি জীর্ণ দুর্গ আছে। দুর্গটীর বহিঃপার্শ্বের প্রাচীর এক্ষণে অনেকখানি মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, যাহা বাহিরে আছে তাহার উচ্চতা প্রায় দশ ফিট এবং প্রস্থ তিন ফিট। এই প্রাচীর গাত্রে দুর্গের অভ্যন্তরে আট ফিট প্রশস্ত

কুরুমবেড়া দুর্গ।

খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ সমূহ চারিদিক বেষ্ঠন করিয়া আছে। মধ্যস্থলে প্রশস্ত সমতল চত্বর ভূমি। এই প্রাঙ্গনের পূর্ব্বাংশে একটি দেব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং পশ্চিম দিকে তিনটি প্রশস্ত বৃত্তাকার গম্বুজ ও চারিদিকে খিলানযুক্ত দ্বারসহ একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। মন্দির গাত্রে উড়িয়া ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহার প্রায় সকল অক্ষরই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কেবল যে দু'একটি স্থান অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আছে, উহা হইতে "বুধবার" ও "মহাদেবঙ্ক মন্দির" এই দুইটি কথা মাত্র পাওয়া যায়। জনশ্রুতি, উড়িষ্যাধিপতি রাজা কপিলেশ্বর দেব কর্ত্তৃক এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেই কথাই উক্ত প্রস্তর ফলকটিতে খোদিত ছিল। কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্র দেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িয্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কুরুমবেড়া দুর্গমধ্যস্থ মস্‌জিদটীর গাত্রেও একটি শিলালিপি আছে। উহা হইতে জানা যায় যে,সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহির কর্ত্তৃক ১১০২ হিজিরীতে (১৬৯১ খৃঃ অঃ) ঐ মস্‌জিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদটীর প্রস্তরগুলি দেখিলে মনে হয় যে, কোন হিন্দু মন্দিরের উপকরণ লইয়াই উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। একই প্রাঙ্গনে একই প্রাচীরের মধ্যে হিন্দু মন্দির ও মুসলমান মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠা এক নূতন দৃশ্য। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, রাজা কপিলেশ্বর দেব কর্ত্তৃক শিব মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বহুকাল যাবৎ উহা হিন্দুদিগের একটি পুণ্যস্থান রূপে পরিগণিত ছিল। প্রাচীরের পার্শ্বস্থিত সারি সারি প্রকোষ্ঠগুলি সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথি অভ্যাগতের অবস্থানের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে এই স্থানে মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে মন্দিরের পূজকগণ মুসলমানদিগের দ্বারা দেবমূর্ত্তির অবমাননা হইবার আশঙ্কা করিয়া শিব লিঙ্গকে দুর্গ মধ্যস্থ একটি

কূপের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া মন্দির ত্যাগ করিয়া যান। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূজকগণ শিব লিঙ্গকে কূপের মধ্যে রাখেন নাই, তাঁহারা এই কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া উহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কপিলেশ্বর নামক মহাদেবই ঐ শিবলিঙ্গ এবং কপিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই শিবলিঙ্গটী অতি মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত।

এই স্থানে মুসলমান দিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাহারা ঐ মস্‌জিদটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিলে এ প্রদেশের কিয়দংশও তাহাদিগের হস্তগত হয়। তাহারা তখন পুনরায় মুসলমানদিগকে ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া উহাকে একটি দুর্গে পরিণত করেন। মস্‌জিদটী ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রকোষ্ঠগুলি সৈন্যদিগের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। শিবলিঙ্গ কূপাভ্যন্তর হইতে ষোড়শোপচারে পূজা পাইতে থাকেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ যতদিন এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়া ছিলেন ততদিন উহা তাহাদের অন্যতম দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাদিগের আধিপত্য লোপের পর হইতে উহা অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্গটীর এখন ধংসাবস্থা। চারিদিক বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গ্রামবাসিগণ সময় সময় কূপ মধ্যস্থ মহাদেবের পূজা দিতে এখানে আসিয়া থাকে। অন্য সময় ইহা শৃগাল বরাহের লীলাভূমি। এই দুর্গটীর পূর্ব্বদিকে সিংহ-দ্বারের সম্মুখে উচ্চতীর ভূমি ও প্রাচীর বেষ্টিত শিবের কুণ্ড বা যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড নামে একটি সুগভীর পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটী কুম্ভীরে পরিপূর্ণ।

মোগল রাজত্বের সময় কেশিয়াড়ীতে একটি প্রধান তহশীল কাছারী ছিল। সেই কারণে বহু সংখ্যক মোগলের এ প্রদেশে আমদানী

হওয়ায় যে স্থানে তাহারা বাস করিতেন উহা মোগল পাড়া নামে অভিহিত হয় এবং অদ্যাবধি ঐ স্থান সেই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের নির্ম্মিত মস্‌জিদ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

মোগল পাড়া ও তলকেশিয়াড়ীর মস্‌জিদ।

তন্মধ্যে একটি জীর্ণ মস্‌জিদে আরবী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলক খানি আছে উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে ঐ মস্‌জিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি প্রস্তর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। উহার আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি দেখিলে উহা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। তলকেশিয়াড়ী গ্রামেও একটি মস্‌জিদ্ আছে। উহা বাদশাহ সাহ আলমের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদ্‌টীর গঠন প্রণালী সুন্দর, নানা প্রকার কারু কার্য্য শোভিত। সংস্কারাভাবে উহা এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও স্থানীয় মুসলমানগণ এখনও সেই স্থানেই উপাসনাদি করিয়া থাকেন।

কেশিয়াড়ী, কাঞ্চনপুর, গগনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মধ্যে 'মুকুন্দ দেব', 'বিদ্যাধর', 'পাত্রমা', 'দাঁড় পাত্রমা', 'নায়কা' প্রভৃতি নামে কয়েকটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। মুকুন্দদেব পুষ্করিণীর তটভূমি অতি উচ্চ এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। উহার চারিধার উত্তমরূপে গাঁথিয়া প্রাচীরাদির দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। কর্ত্তিত প্রস্তরের আগাগোড়া গাঁথনীর ও সুগঠিত সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির কালের কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে।

কেশিয়াড়ীর কয়েকটী প্রাচীন পুষ্করিণী।

কেশিয়াড়ীর পূর্ব্বদিকে ও গগনেশ্বরের উত্তরে বিদ্যাধর নামে যে

পুষ্করিণীটী আছে উহা অতীব পুণ্যতোয়া বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেলা বসে। সে সময় অনেকেই এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড ও জল তর্পণ প্রদান করে। জনপ্রবাদ, উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব ও উৎকল রাজ্যের মন্ত্রী বিদ্যাধরের নামানুসারে ঐ দুইটি পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছিল।

কেশিয়াড়ীর দক্ষিণাংশে পাত্রমা পুষ্করিণী ও উহার দক্ষিণ পূর্ব্বে দাঁড় পাত্রমা পুষ্করিণী। ঐ স্থান এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হওয়ায় শৃগাল বরাহাদির লীলা নিকেতন হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুষ্করিণীটী অন্দর মহালের এবং শেষোক্ত পুষ্করিণীটী সদর মহালের পুষ্করিণী বলিয়া এতাবৎকাল সকলে বলিয়া আসিতেছে। উড়িয়া ভাষায় সদরপ্রাঙ্গণ, বহিভূমি ও রাস্তাকে 'দাণ্ড' বা 'দাঁড়' বলিয়া থাকে এবং পাত্র ও মহাপাত্র শব্দে রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে বুঝায়। আমরা মনে করি, উৎকলের হিন্দু রাজাদিগের আমলে এই স্থানে যে সকল রাজকর্ম্মচারী অবস্থান করিতেন তাহাদের কাহারও মাতা সদরে ও অন্দরে এই দুইটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করায় উহাদের 'পাত্রমা' বা পাত্রের মাতা এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

কেশিয়াড়ীর বর্ত্তমান পুলিশ ষ্টেশনের অনতিদূরে কাঞ্চনপুর পল্লীতে 'নায়কা' নামক পুষ্করিণীটী আছে। উহাকে পুরাতন কাছারীর সরকারী জলাশয় নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। উহার পূর্ব্বদিকে একটি পুরাতন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও দৃষ্ট হয়। 'নায়ক' উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের আমলের অন্যতম কর্ম্মচারী। সাধারনতঃ তহশীল কর্ম্মচারিগণ নির্দ্দিষ্টরূপে এই উপাধি ধারণ করিতেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উড়িষ্যার রাজাদিগের আমলে এখানে যিনি রাজস্ব

কর্ম্মচারী বা 'নায়ক' ছিলেন তিনিই এ পুষ্করিণী তহশীল কাছারীর সন্নিকটে খোদিত করেন।

নারায়ণগড় থানার মধ্যে নারায়ণগড় গ্রামে নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের গড়বাড়ী অবস্থিত। উহাই হান্দোল-গড় নামে পরিচিত।

নারায়ণগড়ের 'হান্দোল-গড়'।

এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা নারায়ণ বল্লভ পাল এই স্থানে প্রায় তিন শত বিঘা ভূমি সুগভীর পরিখা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে রাজভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরিখার ভিত ও পুরাতন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

নারায়ণগড়ের চারিদিকে সেকালে চারিটি দ্বার ছিল। তন্মধ্যে নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়া উৎকল গমনাগমনের যে পুরাতন রাস্তাটী ছিল উহার উপরিস্থ দ্বারটীই প্রাধান ছিল। এ প্রদেশে উহা 'যম দুয়ার' নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাণী দেবীর প্রাচীন মন্দিরটীর সান্নিধ্যহেতু উহা ব্রহ্মাণী দরজা নামেও পরিচিত। উৎকল গমনের ঐ পথটীর উভয় পার্শ্বে হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ নিবিড় জঙ্গল থাকায় তৎকালে এই দরজাটী রুদ্ধ করিয়া দিলে উৎকল গমনাগমনের পথ একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইত। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, উৎকল সম্রাটদিগের নির্দ্দেশমত যাত্রীদিগকে নারায়ণগড়ের রাজার নিকট হইতে 'ছাড়পত্র' লইয়া এই দ্বার অতিক্রম করিতে হইত। দ্বারে প্রকাণ্ড লৌহ কপাট ছিল। এক্ষণে তাহার চিহ্ন স্বরূপ কেবল একটি প্রস্তর-স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। উহার গাত্রে অর্গলবদ্ধ করিবার চিহ্নও দৃষ্ট হয়। অনুমান, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই দরজাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নারায়ণগড়ের চারিটি দরজা।

দ্বিতীয় দ্বারটীর নাম 'সিদ্ধেশ্বর দরজা'। ঐস্থানে সিদ্ধেশ্বর নামে

এক প্রস্তরময় মহাদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় দ্বারটী 'মৃন্ময় দরজা' বা 'মেটে দুয়ার' নামে বিখ্যাত। উহার দুই পার্শ্বের প্রাচীরের উপর দিয়া তিনজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। চতুর্থ দ্বারটী নারায়ণগড়ের পার্শ্ববর্ত্তী কেলেঘাই নদীর গর্ভে কোন স্থানে ছিল। জনশ্রুতি, এই দ্বারটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল যে, উহা অবরুদ্ধ করিলে নারায়ণগড়ের বাহিরের সমস্ত পথ জলমগ্ন হইয়া যাইত; শত্রুপক্ষের নারায়ণগড়ে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু এক্ষণে উহার কোন চিহ্নই নাই।

নারায়ণগড়ে ব্রহ্মাণী দেবীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। নারায়ণগড় রাজবংশের আদিপুরুষ গন্ধর্ব্ব পাল ব্রহ্মাণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা।

ব্রহ্মাণী দেবী।

এক সময়ে এ প্রদেশে এই দেবীর অসীম প্রভাব ছিল। জগন্নাথ যাত্রীকে ইহাঁর চরণে প্রণামীর টাকা প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মাণীর ছাপ (মুদ্রা বিশেষ) গ্রহণ করিয়া তবে পুরী প্রবিষ্ট হইতে হইত। নারায়ণগড়ের রাজাদিগের আমলে ইহাঁর সেবার জন্য প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাগ, মেষ ও মহিষের জীবন উৎসর্গীকৃত হইত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই! রাজবংশের অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে তাঁহার সে অসীম প্রভাবও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি, যেদিন ভগবতী ব্রহ্মাণী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যে ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহা ছয় শত বৎসর সমভাবে আলোক দান করিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজবংশের শেষ রাজা পৃথ্বিবল্লভের জীবন-দীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯০ সালে সে চির প্রজ্বলিত আলোকও অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণী এখন ভিখারিণী। অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সেবাদি

চলিতেছে। তিনি এখন মাঠের মধ্যে এক জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। নারায়ণগড়ের বর্ত্তমান জমিদারগণ দেবীর সামান্য কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া একজন সেবাকারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মাঘী পূর্ণিমার সময় এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

রাণী সাগর।

ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে রাণীসাগর বা রাণীয়া নামে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উহার আয়তন প্রায় দুই শত বিঘা। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, রাজা গন্ধর্ব্বের পত্নী রাণী মধু মঞ্জরী একদিন নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কুলদেবী ভগবতী ব্রহ্মাণী তৃষ্টায় কাতর হইয়া তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। রাণী কুলগুরুর নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহারই উপদেশ মত এই পুষ্করিণীটী খনন করা হইয়াছিল।

ধলেশ্বর মহাদেব।

চৈতন্যদেব জগন্নাথ যাইবার সময় নারায়ণগড়ের ধলেশ্বর নামক অনাদি-লিঙ্গ মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বহু শিষ্য সমভিব্যহারে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের নারায়ণগড়ে অবস্থান কালে বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। গোবিন্দদাসের কড়চাতে লিখিত আছে যে, এই স্থানের ভবানী শঙ্কর ও বীরেশ্বর সেন নামক দুইজন ব্যক্তি মহাপ্রভুর শিষ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

ভদ্রকালী গ্রামের ভদ্রানী দেবী।

খান্দার পরগণার সুবিখ্যাত ভদ্রকালী দেবীও নারায়ণগড়ের রাজা গন্ধর্ব্ব পাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। ভদ্রানী বা ভদ্রকালী দেবীর নামেই গ্রামের নাম ভদ্রকালী হইয়াছে। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজার সময় এই স্থানে একটি মেলা হয় এবং সেই উপলক্ষে বহু লোকেরও সমাগম হইয়া থাকে।

নারায়ণগড়ের দুই ক্রোশ পশ্চিমে বিনয়গড় নামে নারায়ণগড়ের রাজাদিগের একটি উদ্যান বাটিকা ছিল। প্রায় পনর শত বিঘা ভূমি এই গড়ের অন্তর্ভূত। রাজা দেবীবল্লভ পালের সময় উহা প্রস্তুত হয় কিন্তু রাজা পৃথিবল্লভই উহার শোভা সমৃদ্ধি যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজাদিগের সুখ সৌভাগ্যের সহিত ঐ স্থানের শ্রী সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও প্রকৃতি দেবী ঐ স্থানটিকে এখনও মনোমোহনরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। আলবাল বেষ্টিত তরুরাজি এবং লতামণ্ডপশোভিত তপোবন তুল্য কুঞ্জবনের মনোরম দৃশ্য, মৃগকুলের শ্যামল ক্ষেত্রোপরি নিঃশঙ্কচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ, নানাজাতীয় বিহগের কুজন, স্বচ্ছ সলিল নির্ঝরিণীর সুশীতল বারি এখনও পথিকের প্রাণে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়। বসন্তে ও নিদাঘে এইস্থানের রমণীয় বেশ দেখিলে মন-প্রাণ বিমোহিত হইয়া যায়।

বিনয় গড়।

নারায়ণগড়ের অন্তর্গত কশবা গ্রামে একটি মস্‌জিদ আছে। উহাতে পার্শী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১০৬০ বঙ্গাব্দে (১৬৫৩ খৃঃ অঃ) সম্রাট্ সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গালার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সা সুজা কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে উত্তর মহল্লা পল্লীর এক মুসলমান বংশের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

সা সুজার মস্‌জিদ।

সবঙ্গ থানার অন্তর্গত দশগ্রাম নামক গ্রামে গোকুলানন্দ গোস্বামীর একটি সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ বহুলোক নানা স্থান হইতে এখানে সমবেত হয় এবং প্রত্যেকে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা ঐ সমাধিটীর উপর লেপন করিয়া যায়। এইরূপে সমাধিটীকে একটি সুউচ্চ

তুলসীচারা যাত্রা ও বাথরাবাদের মেলা।

মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত করিয়াছে। এই উপলক্ষে ঐস্থানে যে বৃহৎ মেলাটী বসিয়া থাকে উহা 'তুলসী চারা যাত্রা' নামে সুপরিচিত। বৈষ্ণবদিগের সমাধির উপর তুলসী চারা রোপণ করা হইয়া থাকে; এইজন্য এই স্থানের ঐরূপ নাম হইয়াছে।

তুলসীচারা যাত্রার ন্যায় বাখরাবাদের মেলাও প্রসিদ্ধ। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে কেলেঘাই নদীর উপরে জগন্নাথ রাস্তায় যে সুদীর্ঘ পুরাতন পুলটি আছে, উহারই নিকটে এই মেলাটি বসে। পুলের নিকটে বসে বলিয়া উহাকে 'পোলো যাত্রা'ও বলিয়া থাকে।

দাঁতনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। দাঁতনের জগন্নাথের মন্দিরের পাণ্ডারা বলেন যে, চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি এইখানে দন্ত ধাবন করিয়া দন্ত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় এই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে এইস্থান দাঁতন নামে পরিচিত ছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহা চৈতন্যদেবের জীবনকালেই রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতেও জানা যায়। এই কারণে চৈতন্যদেবের দন্ত ধাবন বা দন্ত কাষ্ঠের সহিত যে এইস্থানের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধ-দন্ত ধাবনের সহিত এই দাঁতন নামের বরং কোন সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতেপারে।

দাঁতন ও চৈতন্যদেব।

দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানের অন্যতম প্রাচীন কীর্ত্তি। উহাতে শিল্প নৈপুণ্যও আছে। মন্দিরটির প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড সুগঠিত প্রস্তরময় ষণ্ড আছে। উহার সম্মুখের দুইটি পদও ভগ্ন এবং সেজন্য এখানেও কালা পাহাড়কেই দোষী করা হইয়া থাকে। কতদিন পূর্ব্বে এই

শ্যামলেশ্বরের মন্দির।

মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি, ভোজ নামক কোন রাজা এক সময়ে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তিনিই এই মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রদেশের আরও কয়েকটী কীর্ত্তি ও কিম্বদন্তীর সহিত ভোজ রাজার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, এই ভোজ রাজাই উজ্জয়িনীপতি খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর ছিলেন। বলা বাহুল্য ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তবে তিনি পূর্ব্বোক্ত রাজা বিক্রমকেশরীর শ্বশুর হইলেও হইতে পারেন।

দাঁতনে বিদ্যাধর নামে একটি সুদীর্ঘ পুষ্করিণী আছে। উহার দৈর্ঘ্য ১৬০০ ফিট এবং প্রস্ত ১২০০ ফিট। প্রবাদ, বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রী কর্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারায়ণ-গড় রাজবংশের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ পাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ পালের বিদ্যাধর নামে এক মন্ত্রী ছিলেন; এই পুষ্করিণী তাঁহারই কীর্ত্তি। জনশ্রুতি, এই জেলাই তাঁহার জন্মভূমি। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি দার পরিগ্রহ না করিয়া যৌবনাবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করতঃ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে বারাণসীধামে এক দণ্ডীর নিকটে বেদাধ্যয়ন করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাজা শ্যামবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ হয়; রাজার উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন, দাঁতনের বিদ্যাধর পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাধর

বিদ্যাধর পুষ্করিণী।

উৎকলাধিপতি রাজা মুকুন্দদেবের মন্ত্রী ছিলেন। দাঁতনে যেরূপ বিদ্যাধর নামক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ঐরূপ নামের ক্ষুদ্রতর আরও কয়েকটী পুষ্করিণী জগন্নাথ রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। এই কারণে নারায়ণগড়ের মন্ত্রীর অপেক্ষা উৎকলাধিপতির মন্ত্রীর পক্ষে এইগুলি প্রতিষ্ঠা করা অধিকতর সম্ভবপর। কিন্তু উৎকলের ইতিহাসে বিদ্যাধর নামে কয়েকজন মন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের, রাজা অনঙ্গভীম দেবের ও রাজা প্রতাপ রুদ্র দেবের মন্ত্রীদের নামও বিদ্যাধর ছিল। সুতরাং কোন্ বিদ্যাধর কর্ত্তৃক যে এই পুষ্করিণীটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না।

বিদ্যাধর যে স্থানের অধিবাসী হউন না কেন এই সুবৃহৎ পুষ্করিণীটী তাঁহার পবিত্র নাম ঘোষণা করিতেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত কালই অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, কত রাজা, মহারাজা, কত সম্রাট্, সাম্রাজ্য গেল, কত প্রাসাদ, কত মন্দির, কত মস্‌জিদ্ ধূলিসাৎ হইল, কিন্তু গৃহস্থ বিদ্যাধরের পবিত্র নাম অদ্যাপি অবিকৃত রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জগন্নাথ যাত্রী কত কাল ধরিয়া এই জলাশয়ে অবগাহন ও ইহার সুশীতল বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

দাঁতনের অনতিদূরে শরশঙ্ক-নামক আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী স্বচ্ছ সুবৃহৎ দর্পণ খণ্ডের ন্যায় বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে।

শরশঙ্ক দীঘি।

বোধ হয় বঙ্গে বা উৎকলের অন্য কোন স্থানেই এত বড় পুষ্করিণী আর একটিও নাই। দিনাজপুরের তপন দীঘি অথবা মহীপাল দীঘির অপেক্ষাও শরশঙ্ক দীঘি বৃহৎ ও রমণীয়। তপন দীঘির দৈর্ঘ্য ৪৭০০ ফিট এবং প্রস্থ ১৭৫০

ফিট। মহীপাল দীঘির দৈর্ঘ্য ১৮০০ এবং প্রস্ত ১১০০ ফিট। * শরশঙ্ক দীঘির দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফিট এবং প্রস্ত ২৫০০ ফিট। † কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বাঙ্গালা বা উৎকলের কোন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ দেখা যায় নাই। জনশ্রুতি, পাণ্ডববংশীয় রাজা শশাঙ্কদেব যে সময় জগন্নাথ-দেবের দর্শনোপলক্ষে পুরী গমন করিতেছিলেন সেই সময় বঙ্গ ও উৎকলের সীমান্তে স্বীয় নামে এই সরোবরটী প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। কিন্তু পাণ্ডব বংশীয় শশাঙ্ক নামে কোন রাজার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই। উৎকলের ইতিহাস মাদলা পাঞ্জীতে শরশঙ্ক নামে গঙ্গবংশের এক রাজার নাম আছে এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের গৌড়ের সম্রাট্ শশাঙ্কর নাম সুবিখ্যাত। এক সময় গৌড়াধিপতি এই শশাঙ্কর রাজ্য দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাঁদের মধ্যে কে যে এই সুবৃহৎ পুষ্করিণীটীর প্রতিষ্ঠাতা তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ আছে, বিদ্যাধর ও শরশঙ্কর সহিত যোগ রাখিবার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরে চারি হাত উচ্চ ও তিন হাত প্রস্ত একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুড়ঙ্গ আছে। শরশঙ্কা দীঘিটী সংস্করণাভাবে ক্রমশঃই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

বিদ্যাধর ও শরশঙ্ক ব্যতীত দাঁতন থানার মধ্যে আরও কয়েকটী পুরাতন পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে দাঁতনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মসাগর ও জয়রামপুর ও ঝারি গ্রামের পুষ্করিণী দুইটি উল্লেখ যোগ্য। সংস্করণাভাবে এই সকল পুষ্করিণী দিন দিন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে জলদান একটি বিশেষ পুণ্য কার্য্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সে বিশ্বাস শিথিল

ধর্ম্মসাগর।

* List of Ancient Monuments in Bengal.

† District Gazetteer—Midnapore,—p. 178.

হইতে থাকায় নূতন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা দূরের কথা এই সকল পুষ্করিণী সংস্কার করার আবশ্যকতাও লোকে বোধ করিতেছি না। অথচ দেশে জলকষ্টের সীমা নাই।

দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত মোগলমারী গ্রামের নাম পূর্ব্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ গ্রামে একটি মৃত্তিকা ও ইষ্টকস্তূপ শশিসেনার পাঠশালা বলিয়া অদ্যাপি অভিহিত হইয়া থাকে। জনশ্রুতি, ঐ স্থানে রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সখিসেনার সহিত অহিমাণিকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শশিসেনা নানা বিদ্যায় ও নানাশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার অনেক কাহিনী এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। শশিসেনার ও অহিমাণিকের প্রণয়কাহিনী বর্দ্ধমান নিবাসী কবি ফকিররাম তাঁহার সখিসেনা নামক কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। *

শশিসেনার পাঠশালা।

মোগলমারীর নিকটে সাতদেোলা-নামক একটি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি, সেই গ্রামে সারি সারি সাতটি সুবৃহৎ দেউল বা মন্দির ছিল বলিয়া উক্ত স্থানের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এইরূপ কিম্বদন্তী, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর পূর্ব্বোক্ত ভোজরাজ কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একণে সেই সকল মন্দিরের কোন চিহ্নই নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজঘাট রাস্তা নির্ম্মাণ কালে এই স্থান হইতে পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট বহু সংখ্যক ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল।

সাতদোলা গ্রাম।

দাঁতন থানার অন্তর্গত মনোহরপুর ও খণ্ডরুই গ্রামে যথাক্রমে দাঁতনেরও খণ্ডরুই গড়ের বর্ত্তমান রাজবংশের গড়-বাড়ী, বিদ্যমান। এই রাজ-

* বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন—Introduction, p, 73.

বংশের বিস্তারিত বিবরণও জমিদার বংশ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। খণ্ডরুই গড়ে বর্ত্তমান রাজাদের পূর্ব্বে তৈলঙ্গ দেশীয় যে প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের সময়ের একটি সতীকুণ্ড ঐ স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে উহাতে বসুন্ধরা দেওয়া হইয়া থাকে। খণ্ডরুই গড়ের সুবৃহৎ পুষ্করিণীটী বর্ত্তমান রাজবংশের অন্যতম রাজা গঙ্গানারায়ণের সময় খোদিত হইয়াছিল।

মনোহরপুর ও খণ্ডরুই গড়।

কাঁথি মহকুমার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির মধ্যে এগরা থানার অন্তর্গত হটনগর মহাদেবের মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি, উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেবের সময়ে উহা নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, উৎকলাধিপতির সামন্ত স্থানীয় রাজার দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটীর গঠন-প্রণালী উড়িষ্যা প্রদেশের মন্দিরগুলির ন্যায় এবং দেখিলেই উহাকে একটি প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরটীর কারুকার্য্যও সুন্দর। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নানাস্থানের প্রাচীন মহাদেব গুলির আবিষ্কার ও পূজা প্রচার সম্বন্ধে সচরাচর যে চিরপ্রচলিত কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়, এগরার হটনগর মহাদেবের প্রচার সম্বন্ধেও সেইরূপ কিম্বদন্তীই প্রচলিত আছে। 'রাখাল গরুর পাল লইয়া প্রতিদিন মাঠে যায়, আর প্রতিদিনই একটি না একটি দুগ্ধবতী গাভী সবেগে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় দৌড়াইয়া যায়; কিছুকাল পরে যখন ফিরিয়া আসে তখন তাহার স্তনে বিন্দুমাত্র দুগ্ধ থাকে না। নিত্য এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকায়, একদিন রাখাল গাভীর পশ্চাদানুসরণ করিয়া দেখে যে, গাভিটী নিবিড় অরণ্য মধ্যে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার স্তন হইতে অজস্রধারে দুগ্ধ নিঃসরণ

এগরার হটনগর মহাদেবের মন্দির।

হইতেছে। দুগ্ধ নিঃশেষিত হইলে গাভিটী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় গোপালের সহিত মিলিত হয়। রাখাল এই কথা গ্রামে গিয়া প্রচার করিলে ক্রমশঃ উহা দেশাধিপতি রাজার কর্ণগোচর হয়। অতঃপর ঐ স্থান হইতে মহাদেব আবিষ্কৃত হ'ন এবং ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করা হয়।' এই কাহিনী হইতে অনুমিত হয় যে,প্রথমে এ মহাদেবগুলিকে নিম্নশ্রেণীর লোকে গোপনে জঙ্গলের মধ্যে পূজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দিরটীর পশ্চাতে 'কুণ্ড'নামক একটি ছোট পুষ্করিণী আছে। শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে পুণ্যলাভাশায় অনেকে ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া থাকে। সে সময় ৭।৮ দিন ধরিয়া এগরায় একটি মেলা বসে।

হটনগরের মন্দিরের অনতিদূরে স্বচ্ছ দর্পণখণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণসাগর নামক একটি পুষ্করিণী আছে। কেহ কেহ বলেন, পটাশপুর থানার অন্তর্গত ধুসুর্দ্ধাগড়ের কায়স্থ জমিদার চৌধুরী কৃষ্ণ চন্দ্র মিত্র প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উহা খনন করিয়া দিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এগরাতে যে সময় জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়েই এই পুষ্করিণীটীও খোদিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ সাগরের উত্তর পশ্চিম কোণে এক্ষণে যেখানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ডাক বাংলোটী নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রথমে ঐ স্থানেই কাঁথি মহকুমার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উহা 'নেগুঁয়ার কাছারী' নামে অভিহিত হইত। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথি মহকুমার সবডিভিজন্যাল অফিসার হইয়া আসিয়াছিলেন তখন এই নেগুঁয়াতেই কাছারী ছিল। পরে মহকুমার কার্য্যালয় ঐ স্থান হইতে কাঁথিতে স্থানান্তরিত করা হয়। পুরাতন কাছারির বুনিয়াদ অদ্যাপি স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণসাগর ও নেগুঁয়ার কাছারি।

পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমর্শী গ্রামে পীর মুক্‌দুম্ সাহেবের আস্তানা আছে। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী এতদ্ অঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। জনশ্রুতি, দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। মুক্‌দুম্ সাহেবের আস্তানার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভূসম্পত্তি আছে।

অমর্শীর মুক্‌দুম্ সাহেব।

পটাশপুর থানার অন্তর্গত পঁচেট গ্রামে পটাশপুর পরগণার প্রাচীন জমিদার চৌধুরীবংশ বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, রাসমঞ্চ, দীর্ঘিকা, গড়খাই প্রভৃতি বিদ্যমান। জমিদারবংশ শীর্ষক অধ্যায়ে ঐ বংশের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।

পঁচেট গড়।

ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কাজলাগড় নামক স্থানে সুজামুঠার প্রচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, দীর্ঘিকা, পরিখা প্রভৃতি এক্ষণে বর্দ্ধমানাধিপতির সম্পত্তি। অপরিশোধ্য ঋণের দায়ে সুজামুঠা জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় বর্দ্ধমানাধিপতি উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। পুরাতন রাজবাটীতেই বর্দ্ধমানাধিপতির কাছারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথাস্থানে সুজামুঠা রাজবংশের বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত হইবে। কাজলাগড়ের সুবৃহৎ দীর্ঘিকাটী ঐ বংশের অন্যতম রাজা গোপালেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সময়ে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খোদিত হইয়াছিল।

কাজলা গড়।

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী দুইটীর কথা পূর্ব্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। জলামুঠার রাজধানী গড় বাসুদেবপুর নামে এবং মাজনামুঠার রাজধানী গড় কিশোরনগর নামে

পরিচিত। গড় বাসুদেবপুর বর্ত্তমান বাসুদেবপুর পুলিশ ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে এবং গড় কিশোরনগর কাঁথি সহরের সন্নিকটে অবস্থিত। গড় বাসুদেব-পুরের পূর্ব্ব শ্রী সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহ্ন

গড় বাসুদেবপুর ও গড় কিশোর নগর।

এক্ষণে না থাকিলেও জমিদারী এখনও সেই প্রাচীন বংশের অধিকারেই আছে এবং তাঁহারা পুরুষানুক্রমে ঐ গড়েই বাস করিয়া আসিতে-ছেন। কিন্তু মাজনামুঠার প্রাচীন জমিদারবংশ বহুদিন হইল লোপ হইয়া গিয়াছে—জমিদারী হস্তান্তরে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা গড় কিশোরনগরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীন রাজবংশের দৌহিত্রের দৌহিত্রবংশ; উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারীর কিয়দংশও তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথাস্থানে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে। গড় কিশোরনগরের অধিকাংশই এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ। তোরণ-দ্বার, দেবালয় ও অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই এক্ষণে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

কাঁথি সহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তরে বাহিরী গ্রামটী অবস্থিত। হিজলীর প্রাচীন রাজবংশের প্রসঙ্গে এই বাহিরী গ্রামের কথা পূর্ব্বে একবার আলোচনা করা হইয়াছে। বাহিরীর চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা একটি প্রাচীন

বাহিরী গ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তি।

স্থান। ঐ স্থানে পুষ্করিণ্যাদি খনন কালে সাত আট ফিট মাটীর নীচে প্রায়ই এক একটি কূপ বাহির হইতে দেখা যায়। কূপগুলি সাধারণতঃ তের চৌদ্দ ইঞ্চি দীর্ঘ, সাত ইঞ্চি প্রস্থ ও দুই ইঞ্চি পুরু অর্দ্ধ বৃত্তাকার ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত। বাহিরার ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে প্রাচীন ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যে মৃত্তিকাস্তরে সেই সকল প্রাচীন

গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া প্রায় সাত আট ফিট উর্দ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বাহিরী গ্রামের মধ্যে 'পালটিক্‌রী,' 'শাপটিক্‌রী,' 'ধনটিক্‌রী' ও 'গোধন টিক্‌রী' নামে চারিটি সুউচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ আছে। কিম্বদন্তী, মহাভারতীয় কালে ঐ স্থানেও মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার একটি গোগৃহ ছিল এবং এই স্তূপগুলি সেই সকল গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ। জনশ্রুতি যাহাই থাকুক, মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার সহিত যে এই সকল স্থানের কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বাহিরীর এই স্তূপগুলি আমাদের মনে বৌদ্ধযুগের স্তূপের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের অনুমান, বৌদ্ধযুগে দাঁতন ও ময়না গড়ের ন্যায় বাহিরীতেও একটি সঙ্ঘারাম ছিল। বাহিরী নামটীও সেই প্রাচীন 'বিহার' শব্দেরই হীন পরিণতি বলিয়া আমরা মনে করি। বাহিরীর মধ্যে 'বিধু বাহিরী' নামে একটি স্থানের নাম শ্রুত হওয়া যায়; আমাদের অনুমান, উহা 'বৌদ্ধ বিহার' শব্দেরই অপভ্রংশ।

বাহিরী গ্রামে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন কালে সময় সময় বৌদ্ধযুগের প্রস্তর গঠিত যে দু'একটি মূর্ত্তি বাহির হয় তাহা হইতেও অনুমান করা যায় যে, এক সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ঐ সকল মূর্ত্তির গঠন প্রণালী দেখিলে শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্ত্তিগুলি প্রায় ভগ্ন। কাহারও হাত নাই, কাহারও কান নাই, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও কান ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও শরীরের অর্দ্ধেকটাই গিয়াছে! সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"পুতুল-গুলাও অনিক হিন্দুদের মত অঙ্গহীন হইয়াছে

আছে।" * কাঁথির বর্ত্তমান সব্ডিভিজন্যাল অফিসের সম্মুখে যে প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তিটী স্থাপিত আছে উহাকেও বাহিরীর জঙ্গল হইতেই লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

বাহিরীতে একটি প্রাচীন মঠ আছে। মঠটী যে স্থানে অবস্থিত তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম; মনোহর তপোবনের ন্যায় রমণীয়। কে জানে উহা সে যুগের কোন বৌদ্ধ মঠের রক্ত মাংস হীন কঙ্কাল কিনা! মঠটীতে এক্ষণে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে। কিন্তু একদিন হয়ত সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিই বিদ্যমান ছিল; শ্রমণগণ তাঁহারই পূজায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিতেন। আচার্য্যগণ সেই স্থানে বসিয়া গম্ভীর আরবে 'নির্ব্বাণ মুক্তির' অপূর্ব্ব সত্য দেশবাসীকে শুনাইয়া দিয়া ডাকিতেন, "এস এস নরনারী, আমরা অমৃত পাইয়াছি, সে অমৃত তোমাদিগকেও দিব।" সে দিন চলিয়া গিয়াছে! কালের কঠোর হস্ত আজ সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। এখন সেখানে সেই মহাযোগীর লোকমধুর চরিত্র কাহিনী বা তাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্মসংযমের কোন আলোচনা দূরে থাক্ মঠবাসিগণ কেহ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না!

বাহিরীতে ভীম-সাগর, হেমসাগর, লোহিতসাগর প্রভৃতি নামে কয়েকটী পুরাতন পুষ্করিণীও আছে এবং তথায় 'জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ' নামক একটি পুরাতন তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে। দড়ী বা শিকলের ক্রমাগত ঘর্ষণে বৃক্ষাদির গাত্রে যেরূপ চিহ্ন হয় এই বৃক্ষটীর গাত্রেও সেইরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ।

জনশ্রুতি, এক সময়ে উহার পার্শ্ব দিয়া একটি নদী প্রবাহিত ছিল এবং সেই সময় যে সকল বড় বড় নৌকা বা ছালুতি লবণ কারবারের

* সীতারাম—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জন্য এ প্রদেশে আসিত সে গুলি ঐ বৃক্ষকাণ্ডেই বাঁধা হইত। কিন্তু এক্ষণে ঐ স্থানে কোন নদী বা খাল নাই। তবে বাহিরীর চতুঃপার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এক সময় ঐ স্থান কোন নদী সৈকতে অবস্থিত ছিল। বাহিরীর নিকট-বর্ত্তী লাউদা, কুমিরদা, ঝাপড়দা, অমরদা, মারিসদা প্রভৃতি 'দা' বা 'দহ' শব্দান্ত স্থান গুলির নাম দেখিয়া মনে হয়, ঐ নদীটি ঐ সকল স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া দহগোড়া (দহের মুখ) নামক স্থানের নিকট রসুলপুর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল।

খাজুরী বন্দর।

রসুলপুর নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে খাজুরী থানা। খাজুরী থানার পুলিশ ষ্টেশন পূর্ব্বে খাজুরী গ্রামেই ছিল এক্ষণে উহাকে জনকা গ্রামে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে খাজুরী হুগলী নদীর উপরে একটি বিশিষ্ট বন্দর ছিল। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজুরীও ধীরে ধীরে একটি বিশেষ গণনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছিল। বড় বড় বাণিজ্য-পোত সমূহ আর কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইত না, খাজুরী বন্দরেই মাল বোঝাই ও নামাই করিত। ঐ স্থান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্লুপের দ্বারা মাল আনা-লওয়া করা হইত। এই কারণে যাত্রী ও মহাজন দিগের বাসোপযোগী সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই খাজুরীকে একটি জনাকীর্ণ জনপদে পরিণত করিয়াছিল।

ঐ সময় বহু ইউরোপীয়ান খাজুরীতে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যাদি উপলক্ষে বাস করায় একটি স্থান 'সাহেবনগর' নামে অভিহিত হইয়াছিল। সাহেব নগর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও উদ্যানে শোভিত হইয়াছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যও অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই প্রদেশে

আসিয়া বাস করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময় খাজুরী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল।—

"For sale by auction on the 29th May 1792 a large upper roomed house and premises situated at Kedgeree containing a hall, four bed room and an open Verandah standing on eight bighas of ground more or less."

কলিকাতা হইতে খাজুরী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ডাক যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্রুতগামী ছোট ছোট 'ছিপে' করিয়া ডাক পাঠান হইত। বিলাত হইতে জাহাজ সকল পৌঁছিবা মাত্রই কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ বিলাতী সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দ্রুতগামী 'ছিপে' আরোহণ করতঃ কলিকাতা যাত্রা করিতেন। পরবর্ত্তিকালে খাজুরী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের বন্দোবস্তও করা হয়। কলিকাতা হইতে খাজুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম চিকিৎসক ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. W. B. O'shanghnessy গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে স্বীয় উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার, ডায়মণ্ডহারবার হইতে কুকড়াহাটী এবং কুকড়াহাটী হইতে খাজুরী পর্য্যন্ত এই তিনটী লাইন খুলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ যন্ত্র দ্বারা কার্য্য চলিয়াছিল, তৎপরে বিলাত হইতে Morse Instrument আসিলে নূতন পদ্ধতিতে কার্য্য চলিতে থাকে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খাজুরী বন্দরের অস্তিত্ব ছিল। পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যায় খাজুরীর শ্রীসৌভাগ্য সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

ঐ বন্যায় খাজুরীর অধিকাংশই হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর গ্রাস করিয়া লইয়া খাজুরীকে জনমানবশূন্য এক শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া দিয়াছে। খাজুরীর সেই সমস্ত সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান, সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে পুনরায় সেই স্থানে পলি মৃত্তিকা পড়িয়া এক্ষণে আবার নূতন ভূমি জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন মাত্র তথায় নাই। খাজুরীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, এক সময় ঐ স্থানে একটি সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ নগর ছিল; একদিন ঐ স্থান স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য নরনারীর পোতারোহণ কোলাহলে মুখরিত থাকিত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সেই ভীষণ জলপ্লাবনের পরে খাজুরীর শ্রীসৌভাগ্য নষ্ট হইয়া গেলে খাজুরীর বন্দর ও টেলিগ্রাফ অফিসটি উঠিয়া যায়। খাজুরীর চারিদিক এক্ষণে বন জঙ্গলে পূর্ণ; হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি।

খাজুরীর প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় দিতে এক্ষণে দুইটি মাত্র অট্টালিকা ও একটি সমাধি-ক্ষেত্র বিদ্যমান। অট্টালিকা দুইটির মধ্যে একটি এক্ষণে পূর্ত্ত বিভাগের ডাক বাংলো এবং অন্যটি খাজুরীর পোষ্ট-আফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই পোষ্ট আফিসটীই পূর্ব্বে পোর্ট আফিস ছিল এবং উহার দ্বিতলে যে সুউচ্চ ক্ষুদ্র গৃহটি রহিয়াছে উহাতেই টেলিগ্রাফের যন্ত্রটী স্থাপিত ছিল। ঐ গৃহে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রও থাকিত; পোর্ট অফিসার উহার সাহায্যে জাহাজাদির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আবশ্যকীয় সঙ্কেতাদি করিতেন। গৃহটীর সম্মুখে একটি সাঙ্কেতিক (Signal Mast) দণ্ড ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি রহিয়াছে এবং তথায় কয়েকটী কামান এখনও পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে সুবৃহৎ কামানটীর গাত্রে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে।

খাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্র।

খাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রটী পোষ্ট আফিসটির পশ্চাদ্ভাগে এবং ডাকবাংলোটির সম্মুখে পাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। উহার মধ্যে সাহেবদিগের তেত্রিশটী সমাধি আছে। তন্মধ্যে বাইশটীতে খোদিত লিপি আছে, এগার-টীতে কিছু লেখা নাই। শেষোক্ত সমাধিগুলির অবস্থা দেখিলে ঐ গুলিকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। খাজুরীর সেই শ্রীসৌভাগ্যের দিনে যে সকল ইংরাজ কোম্পানীর কার্য্যে বা ব্যবসায়কল্পে অথবা বায়ু পরিবর্ত্তনাদি উপলক্ষে এই দূরদেশে স্বজন বিরহ অবস্থায় বাস করিতেন তাঁহাদের কয়েকজন এই স্থানে দেহত্যাগ করিয়া যান। সে সময় দু-একজন সুহৃদ্ ব্যতীত কেহ তাঁহাদের পার্শ্বে থাকেন নাই। স্বদেশে তাঁহাদের স্বজনগণ বহুদিন পরে তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ পাইতেন।

খাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রে লিপিফলকযুক্ত যে সমাধিগুলি আছে তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উহার তারিখ ১৮০০ খৃষ্টাব্দ এবং শেষ সমাধিটির তারিখ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ইহার পরে আর কোন দেহ তথায় সমাহিত করা হয় নাই। এই সমাধি-ক্ষেত্রে ভাগলপুরের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট চামার সাহেবের, সিভিলিয়ান বার্লো সাহেবের এবং ডাক্তার জর্জ ফরবেস্ সাহেবের সমাধি আছে। একটি সমাধিতে খাজুরীর তৎকালীন পোর্ট ও পোষ্ট মাষ্টার এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট জে, বটেল্‌হো সাহেব, তাঁহার পত্নী মেরী এবং একমাত্র পুত্র এগ্লিন একত্রে সমাহিত হইয়া-ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনে তাঁহারা তিনজনেই একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঐ স্থানে সারলটী অ্যানি নামক একটি বালিকার সমাধি আছে। বালিকাটী মিড্‌লসেক্সের রেভারেণ্ড টমাস ব্র্যাকেনের একমাত্র কন্যা।

তাহার দুই সহোদর ভারতবর্ষে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন। ভগিনী তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেছিলেন। দুই ভ্রাতাই তাঁহাদের একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনীকে সাদরে লইয়া যাইবার জন্য খাজুরী বন্দরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য—তাঁহাদিগকে আর সেই চির প্রফুল্লতাময়ী প্রাণাধিকা ভগিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাদের কোলে সেই বালিকাটীর প্রাণহীন দেহ তুলিয়া দিয়াছিলেন। পথেই সারলটীর মৃত্যু হইয়াছিল। ভ্রাতাদ্বয় ভগিনীর স্মৃতি-স্তম্ভে সেই কথা করুণ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

আর একটি পতিহীনা নারী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য খাজুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর বড় আশা ছিল, রুগ্ন পুত্র নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া সুস্থ শরীরে মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিয়াছিলেন! ঐ সমাধি-স্তম্ভের স্মৃতিলিপিটী পাঠ করিলে মনে হয়, জননী বুকের রক্ত দিয়া সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দীনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এড্ওয়ার্ড ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাঁহার পত্নীর সমাধি গাত্রে যে কবিতাটী লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহার ভাষাও মর্ম্মস্পর্শী।

প্রকৃতি দেবীর স্নেহময় কোলে খাজুরীর নীরব সমাধি ক্ষেত্রটী হৃদয়ে শান্তির ভাব আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জ্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। জন কোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃতব্যক্তিদিগের শান্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেজন্য জড় প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত। সমাধি লিপি-গুলির এক একটির ভাষা বড়ই করুণ। উহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মন প্রাণ আকুল করে। পিতা মাতা—পুত্র কন্যার, পুত্র কন্যা—পিতা মাতার, পতি—পত্নীর, পত্নী—পতির, ভ্রাতা—ভগিনীর, ভগিনী—

ভ্রাতার, বন্ধু—বন্ধুর শেষ কার্য্য সমাধা করিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সমাধি গাত্রে যে দু'চারিটী কথা লিখিয়া রাখিয়া যান, তাহা পাঠ করিলে চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠে। স্মারক-লিপিতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণের কত না গভীর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পাইয়া থাকে! জীবিত থাকিতে যাহারা কত প্রিয় ছিল, কত আপনার ছিল, মৃত্যুর পরে তাহাদের স্মৃতি কি রমণীয় নহে? কোন্ দুঃখিনী মাতা মৃত পুত্রের মধুর স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন! কোন্ বিয়োগ বিধুরা পত্নী তদীয় প্রিয়তমের মধুর কাহিনী ভুলিতে চাহেন! কোন প্রেমিক বিপত্নীক জীবন সঙ্গিনীর প্রেমের গাথা বিস্মৃত হইতে পারেন!

থাজুরীর চার পাঁচ মাইল দক্ষিণে কাউখালি নামে একটি গ্রাম আছে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানের আলোক স্তম্ভটী (Light House) নির্ম্মিত হয়। হুগলী নদীর উপর উহাই প্রথম আলোক-স্তম্ভ। উহার উচ্চতা প্রায় আশী ফিট। কয়েকটী প্রবল ঝড় ও বন্যা সহ্য করিয়াও উহা এখনও অটল অচলরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে যে প্রস্তরফলকটী রহিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝড়ের সময় সমুদ্রের জল ঐ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। ভূমি হইতে ঐ স্থানের উচ্চতা প্রায় তের ফিট। প্রতি রজনীতে নিয়মিতরূপে এই বাতিঘরটীতে আলোক দেওয়া হইয়া থাকে।

কাউখালির আলোক-স্তম্ভ।

কাউখালির প্রায় বার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কশবা হিজলী গ্রাম। এই কশবা হিজলী গ্রামেই হিজলীর নবাববংশের রাজধানী ছিল, সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন নবাববংশের কীর্ত্তিরাশির সামান্য দু'একখানি দগ্ধ অস্থি-

হিজলীর মসজিদ।

ভস্ম বুকে করিয়া হিজলী এখনও স্বদেশ-বিদেশের পরিব্রাজকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হিজলীর এখন আর সে কালের শ্রী সৌভাগ্যের কিছুই নাই! উহার পার্শ্বে মেহদীনগর নামক যে গ্রাম-খানি আছে এক সময়ে উহা বহু জনাকীর্ণ শত অট্টালিকা শোভিত এক সুরম্য নগর ছিল। এক্ষণে উহা বন জঙ্গলে পূর্ণ নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের জল-প্লাবনে হিজলী ও মেহদীনগরের অধিকাংশই সাগর গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। নবাববংশের প্রায় সকল কীর্ত্তিই বঙ্গোপসাগর গ্রাস করিয়াছেন। এখন কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ আর একটি জীর্ণ মসজিদ পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে।

রশুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার নিকটেই এই মসজিদটী অবস্থিত। উহার দৈর্ঘ্য প্রস্ত প্রায় ৫০×২৫ ফিট। উপরে তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদটী সুউচ্চ। বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতা যাতায়াতের পথে বহুদূর হইতে এই মসজিদটী দেখা যায়। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জল প্লাবনে যে সময় এ প্রদেশের সমস্ত ভূমিই প্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল তখনও ইহা নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া অনেক লোককে আশ্রয় দান করিয়াছিল। এই মসজিদটীর সম্মুখে ও পার্শ্বে তাজ খাঁ মসনদ্ আলীর ও তাঁহার ভ্রাতা সিকান্দরের এবং তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি ঐ বংশীয় কয়েক জনের সমাধি আছে। মসজিদটীর প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। লবণ সমুদ্রের পার্শ্বে থাকিলেও উহার জল অতিশয় সুস্বাদু ও নির্ম্মল। পুষ্করিণীতে নামিবার সোপান ও তল পর্য্যন্ত চারিদিকই প্রস্তর দিয়া বাঁধান ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহার গাত্রে ও চতুষ্পার্শ্বে বড় বড় গাছ জন্মাইয়া উহাকে ধ্বংসের পথে আনিয়াছে।

মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে হিজলীর প্রাচীন দুর্গের ও কুতুব সাহ ও সিম্‌লী সাহ নামক দুইজন মুসলমানের নির্ম্মিত দুইটি মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় দু'একজন বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছিলাম, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক সাহেব এইস্থানে আসিয়াছিলেন; তিনি সিম্‌লী সাহর মস্‌জিদটীর ভগ্নস্তুপের মধ্য হইতে একখানি খোদিত প্রস্তর-ফলক লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা উহার কোন সন্ধান পাই নাই। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে উপকৃত হইব। মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে ভীমেশ্বর নামক মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। জনশ্রুতি, হিজলীর দেওয়ান পূর্ব্বোক্ত ভীমসেন মহাপাত্র উহার প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্ভিন্ন এক্ষণে তথায় দর্শনীয় বস্তু আর কিছুই নাই।

মেহদী নগর।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃহত্তর সমুদ্রপোতাদি বালেশ্বরের নিকট প্রধানতঃ মাল বোঝাই নামাই করিলেও প্রথম ইংরাজপোত 'ফরুণ' ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে হিজলীর ধার অবধি আসিয়াছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হিজলীতে একটি জাহাজ ঘাট নির্ম্মিত হয়। বহু দিবসাবধি উহার অস্তিত্ব ছিল। কুড়ি পঁচিশ বৎসর হইল উহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

হিজলীর জাহাজ ঘাট।

রশুলপুর নদীর এক পার্শ্বে এই কশবা হিজলী গ্রাম এবং অন্য পার্শ্বে কাঁথি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুইখানি গ্রাম আছে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী স্পর্শে এই দুইটি গ্রাম ও রশুলপুর নদী চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। একদিকে ধবল শিখর মালা শোভিত বালাম্বুর্কর বর্ণরাগ রঞ্জিত মধ্যাহ্ন

কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র।

সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব প্রভা বিশিষ্ট বহুযোজন পথ ব্যাপিত সুউচ্চ বালুকা-স্তূপ শ্রেণী, অন্যদিকে—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যান, তাঁহার কবি হৃদয় নাচিয়া উঠে। তিনি নবকুমারের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব না।" কিন্তু পরক্ষণেই আবার "——সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে, ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি।" তিনি ধবল শিখরমালা শোভিত যে বালুকাস্তূপশ্রেণীর মনোরম দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, সেই বালুকাস্তূপের নিম্নে চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য; ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। তথায় আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই। সেই সুদর্শন অম্বুনিধিও তখন এক ভীষণ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকটিত হইলেন। তাঁহার রোমাঞ্চ হইল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। প্রকৃতির তখন সেই ভীষণ দর্শন রূপ দেখিয়া তাহার সেই কমনীয় মূর্ত্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময়, সেই গম্ভীরনাদি বারিধিতীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে সৈকতভূমে দাঁড়াইয়া নবকুমারের ন্যায় তিনিও শুনিলেন, কে যেন তাঁহার মানসপটে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া গেল "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? আইস।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে চিনিলেন। তিনি তাঁহারই হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী—কল্পনা সুন্দরী। তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল—তিনি প্রকৃতির সেই কোমল ও কঠোর মূর্ত্তির মধ্য হইতে দুইখানি ছবি তাঁহার মানসপটে আঁকিয়া লইলেন। একখানি তাঁহার কাব্যের চরমসৃষ্টি নিছক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি

সৌন্দর্য্য সুষমা মণ্ডিতা প্রকৃতি পালিতা সরলতাময়ী বালিকা মৃন্ময়ীর আগুল্‌ফলম্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্যদেবী মূর্ত্তি, অন্যখানি সেই বুভুক্ষ অজগর সর্পের ন্যায় ভীষণ দর্শন কাপালিকের নর-রাক্ষস মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা এই দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের প্রকৃতি অধ্যায়নের ফল।

১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁথির (নেগুঁয়া) সব্‌ডিভিজন্যাল অফিসার হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় উপর্য্যুপরি তিন রাত্রে তিনি একজন কাপালিককে কাঁথিতে দেখিয়াছিলেন।* ইহার কিছুকাল পরেই একটি ডাকাতী মোকদ্দমার তদন্ত উপলক্ষে তাঁহাকে দৌলতপুরের ডাক বাংলোতে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সূচনা হয়। কপালকুণ্ডলা কাল্পনিক উপন্যাস। দৌলতপুর ও দরিয়াপুর তাঁহার সেই কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার লীলাভূমি; কোমল কঠোরের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র। বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট ভাবের ও আদর্শের পীঠস্থান। সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন দলে দলে বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকগণ সেই পীঠস্থান দর্শন করিবার আশায় যথাযোগ্য ভক্তির সহিত তীর্থযাত্রা করিয়া জীবন ধন্য করিবেন। বিগত বর্ষে কাঁথি সারস্বত সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এই দৌলতপুর গ্রামে কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে একটি স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দৌলতপুর গ্রামে যে প্রাচীন শিব মন্দিরটী আছে উহার প্রাঙ্গনেই স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

* শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত 'বঙ্কিম জীবনী'তে উহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দৌলতপুর গ্রামের পূর্ব্বোক্ত শিব মন্দিরটীর অনতিদূরে একটি বটবৃক্ষমূলে বৌদ্ধযুগের একটিপুরুষ মূর্ত্তি ও তান্ত্রিক যুগের একটি দেবীমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তি দুইটীই প্রস্তর নির্ম্মিত ও ভগ্ন। বটবৃক্ষটীর কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তিটীকে এরূপ ভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে যে, আর তিন চার বৎসর পরেই উহা লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়া যাইবে। তখন উহার চিহ্নমাত্র লোকে দেখিতে পাইবে না। এক্ষণে নিম্নভাগের সামান্য অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে বৃক্ষের কিয়দংশ ছেদন করিয়া আমরা প্রস্তর-মূর্ত্তিটী বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলাম। কিন্তু বৃক্ষ ছেদনের ফলে এবং মূর্ত্তিটী বাহির করিয়া আনিলে গ্রামবাসিগণের বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসিগণ মূর্ত্তিগাত্রে সিন্দুর লেপন করতঃ পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় কার্য্যটী আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, রশুলপুর নদীর বাঁধ প্রস্তুত করিবার সময় মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ঐ মূর্ত্তিটী পাওয়া গিয়াছিল। দৌলতপুর ও দরিয়াপুর গ্রামে পুষ্করিণ্যাদি খনন কালে পাঁচ সাত হস্ত মাটীর নীচে কূপ বাহির হইতে দেখা যায়।

দৌলতপুরের প্রস্তর মূর্ত্তি।

দৌলতপুর গ্রামের সাত আট মাইল পশ্চিমে কাঁথি সহর। কাঁথিতে নন্দকুমার পুষ্করিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে। খ্যাতনামা মহারাজা নন্দকুমার কর্ত্তৃক এই পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় কিছুদিন হিজলী প্রদেশের আমীন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে এই আমীনি পদ বিশেষ সম্মানজনক ছিল। নবাব মুর্শিদ-

কাঁথির নন্দকুমার পুষ্করিণী।

কুলীর আমলে রাজস্ব বাকীর জন্য যে সকল জমিদারী সরকারের খাসে আসিয়াছিল, সেই সকল জমিদারীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি কতকগুলি আমীনি-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রজা সাধারণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব সরকারে দাখিল দিতেন। হিজলী প্রদেশও ঐ সময় কিছুদিনের জন্য নবাব সরকারের খাসে আসিয়াছিল। কাঁথির নন্দকুমার পুষ্করিণীটি সেই স্মরণীয় মহাত্মার একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। পুষ্করিণীটি পঙ্কপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাঁথির ভূতপূর্ব্ব সব্‌ডিভিজন্যাল অফিসার স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় সরকারী ব্যয়ে উহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া এবং ঘাটটি বাঁধাইয়া দিয়া সাধারণের মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দকুমার নামক স্থানটীও মহারাজা নন্দকুমারের নামেই প্রতিষ্ঠিত।

কাঁথির সব্‌ডিভিজন্যাল আফিস।

কাঁথির যে সুরম্য ত্রিতল অট্টালিকাতে এক্ষণে ফৌজদারী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে উহা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিমকীর কুঠীর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশের লবণ কারবার উঠিয়া গেলে সরকার বাহাদুর সল্ট এজেন্টের নিকট হইতে উক্ত বাটী ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ বাগান দীর্ঘিকাদি সমেত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড গ্রহণ করিয়া উক্ত স্থানে মহকুমার কার্য্যালয়াদি স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্বে উহা এগরা নেগুঁয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অট্টালিকাটীর উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে যে চারিটি কামান স্থাপিত আছে, সেগুলিকে হিজলী হইতে আনিয়া ঐস্থানে রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ হিজলীর যুদ্ধে ঐ কামানগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সব্‌ডিভিজন্যাল অফিসের সম্মুখে যে বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তিটী আছে উহা

বাহিরীতে পাওয়া গিয়াছিল। বাহিরী হইতে আনয়ন করিয়া উহাকে ঐ স্থানে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মূর্ত্তিটীর দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ফিট। উহার দুই বাহু একবারেই নাই।

কাঁথির প্রস্তর-মূর্ত্তি।

নাসিকা, চিবুকের নিম্নাংশ ও উভয় পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের মুখগুলি ভগ্ন অবস্থায় আছে। এতদ্ভিন্ন মূর্ত্তিটীর অন্যান্য অংশ, বেদী ও বেদীর উপর চিত্রিত মূর্ত্তি দুইটি ও অন্যান্য চিত্রগুলি সুস্পষ্ট অবস্থায় আছে। কত শত বৎসর হইল মূর্ত্তিটী নির্ম্মিত হইয়াছে—অঙ্গে ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্ জ্বলিয়া গিয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি এখনও উহার শিল্প-নৈপুণ্য ও গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উড়িষ্যার খণ্ডগিরির উপরে এইরূপ মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি দৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ মূর্ত্তিগুলিকে লক্ষ করিয়াই তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে লিখিয়াছেন—"উহাদের দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত।" আমরাও এই গ্রন্থের উপসংহারে সেই মহাপুরুষের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—"হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়াল্ স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! আমরা কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি! আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।"

সমাপ্ত।

—∘—

পরিশিষ্ট ।

মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা । *

গণনার তারিখ ।	পুরুষ ।	স্ত্রী ।	মোট-সংখ্যা ।
১৮৭২	১২,৫৮,১৬৯	১২,৮৪,৭৫১	২৫,৪২,৯২০
১৮৮১	১২,৪৩,১৯৫	১২,৭২,৩৭০	২৫,১৫,৫৬৫
১৮৯১	১৩,০৮,০৭৪	১৩,২৩,৩৯২	২৬,৩১,৪৬৬
১৯০১	১৩,৯০,২৩৩	১৩,৯৮,৮৮১	২৭,৮৯,১১৪
১৯১১	১৪,১০,৭১৪	১৪,১০,৪৮৭	২৮,২১,২০১
১৯২১	—	—	২৬,৬১,১৯২

(গণনার তারিখ ১৯১১)

হিন্দু	১২,৪০,৬২০	১২,৩৬,৬৫২	২৪,৭৭,২৭২
মুসলমান	৯৬,২০৯	৯৭,৩৬০	১,৯৩,৫৬৯
খৃষ্টান	২,২২৯	১,৯৩৭	৪,১৬৬
ভূত প্রেত উপাসক	৭১,১৩১	৭৪,৩০৬	১,৪৫,৪৩৭
অন্যান্য	৫২৫	২৩২	৭৫৭

মাতৃভাষায় যাহারা চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে—

২,৫৪,৭৪৬	৯,৪৪২	২,৬৪,১৮৮

ইংরাজী ভাষায় যাহারা চিঠি পত্র লিখিতে ও পড়িতে পারে—

১৩,০১২	৬০৯	১৩,৬২১

---

* ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর ফাইন্যাল রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ায় উহার সংখ্যা দেওয়া হইল না। দ্বিতীয় ভাগে উহা দেওয়া হইবে। এস্থলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক গণনার কেবল মোট সংখ্যাটী প্রদত্ত হইল।